উলফত সাহিত্যাসর, দারুল উলূম দেওবন্দের মুখপত্র

উলফত

বিচিত্রের মাঝে ভালোবাসা জাগাবে

অভিভাবক
মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা.
অধ্যাপক, তাফসীর ও উসূলে ফিকহ,
দারুল উলূম দেওবন্দ

অতিথি সম্পাদক:
কাজী মনজুর আলম

উপদেষ্টামণ্ডলী
মু. আইনুল হক [পশ্চিমবঙ্গ]
আবুল কাসিম মু. খালিদ [আসাম]
মো. জুবাইর আহমদ [ত্রিপুরা]

সম্পাদক:
হুসাইন আলহুদা ফেনবি

ভাষা সম্পাদক
যায়েদ হুসাইন

নির্বাহী সম্পাদক
ইবনু লুৎফ বগুড়াবি

সহকারী সম্পাদক
ইফতিখারুল হক খাইর ফেনবি

বিভাগীয় সম্পাদক
আব্দুল্লাহ মু. ইউসুফ

অঙ্গসজ্জা ও অক্ষর বিন্যাস
ইবনুল হুদা

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপক
আল খাইর

সম্পাদকীয়

প্রথম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৪বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ৩ রা শাবান, ১৪৪১হি. সোমবার

‘পাক্ষিক উলফত’ ছাড়াও দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বাঙালি শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এ বছর আরও দুটি বার্ষিক স্মারক প্রকাশিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার ছাত্রদের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে, দারুল উলূম দেওবন্দের বাংলা মুখপত্র হিসেবে “আল কাসিম।” ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক আয়োজন নিয়ে ‘আল কাসিম’ বেশ চমৎকার সেজেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে “হেরার জ্যোতি।” এতে সাধারণ মুসলামদের জন্য ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোলে ধরে আয়োজন বিন্যাস করা হয়। আর পাক্ষিক উলফত সেজেছে কেবল শিক্ষার্থীদের সাহিত্যকর্ম দিয়ে। উলফত লিখিয়ে বন্ধুদের মুখপত্র। দেওবন্দে অবস্থানরত সকল বাঙালিকে নিয়ে উলফতের পথচলা শুরু হয়। উলফত বন্ধুদের যেকোনো লেখা উলফতে ছেপে আসবে; এই হলো উলফতের বৈশিষ্ট ও পদক্ষেপ। নবীন লিখিয়েদের উৎসাহ জুগিয়ে সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে দেওয়া, প্রবীণদের দিকনির্দেশনা তোলে ধরে নবীনদের পাথেয় জোগানো; এই হলো উলফতের একমাত্র কর্মধারা। তাই পাঠক, উলফতে কাঁচা-পাকা সব ধরণের লেখাই লক্ষ করবেন। উলফত পরিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে নবীনদের কাঁচা হাতের লেখাগুলো ছাপানোর উপযোগী করে তোলার জন্য। একই সাথে বলা যায়, উলফতের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তুও নেই। লিখিয়ে বন্ধুরা যে ধরণের লেখা পাঠাবেন, সেগুলো সামনে রেখেই প্রতি সংখ্যার আয়োজন বিন্যাস করা হয়। তবে এই সংখ্যাটি উলফতের ‘ভাষা সংখ্যা।’ এতে নবীনদের রচনার পাশাপাশি উলফত পরিবারের পক্ষ থেকেও কিছু বাড়তি আয়োজন সংযোজন করা হয়। ভাষার পরিচিতি, বানান সমীক্ষা, ভাষাচর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এতে নবীনদের জন্য চমৎকার কিছু পাথেয় থাকবে বলে আশাবাদী।

এই সংখ্যার আরেকটি বৈশিষ্ট হলো; এটি ‘উলফত বানানরীতি’ দ্বারা সম্পাদিত। পুরো পত্রিকায় বানানে সমতা বিধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর জন্য ‘উলফত পরিবার’ কর্তৃক রচিত হয় ‘উলফত বানানরীতি।’ দারুল উলূমে বাঙালিদের প্রকাশনীগুলোতে বানানে সমতা বিধান করার জন্য এই বানানরীতি প্রণিত হয়। ইনশাআল্লাহ, অতিসত্বর এর চূড়ান্ত সংস্করণ মুদ্রণের পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে হ্যাঁ, নতুন বানানরীতি প্রকাশ করে নুতুন করে বানান বিভ্রাটের পক্ষে আমরা নই। তাই এতে বোর্ডের নিয়মগুলোকে যথাসাধ্য মূল্যায়ন করে কেবল ধর্মীয় কিছু শব্দের বানান নিয়ে কিছু আবেদন করা হয়। যাতে উভয় অঙ্গনের বানানে সামঞ্জস্যতা এসে যায়। বাকি প্রবীণদের নির্দেশনা মেনেই পথ চলব আমরা, ইনশাআল্লাহ। ওয়াস্‌সালাম।

যোগাযোগ:
প্রকাশনা বিভাগ: *উলফত সাহিত্যাসর; দারুল উলূম দেওবন্দ (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা শিক্ষার্থীদের যৌথ সাহিত্য সংসদ)*
কেন্দ্রীয় অফিস [অস্থায়ী]: বাংলা ইসলামিক একাডেমি, কাসিমি গেস্ট হাউজ, নিচতলা, রুম নং-৬, দেওবন্দ - ২৪৭৫৫৪।
সাহারানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
+৯১ ৭৪৫৪৮৪৩৪৮২, +৯১ ৯০৬৮৩৩২৯৬২, +৯১ ৯৩৫৮৭৩০২২৫
সম্পাদক কতৃক উলফত প্রিন্ট কর্ণার, ,উলফত কেন্দ্রীয় অফিস থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

উলফত ভাষা সংখ্যা

আয়োজন ফিরিস্তি

বাংলা বানান: 'আমাদের' বলে কোনো 'স্বাতন্ত্র' থাকা উচিত কিনা?

-হুসাইন আলহুদা

"

তো যেসব জায়গায় ব্যাকরণগত বৈধতা থাকার পরও মতানৈক্য হতে পারে সেসব জায়গায় সুনির্দিষ্ট বানান নির্ণয় করে নেওয়া হলো বানানরীতি। তাই প্রথমে আমাদেরকে ব্যাকরণে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এরপর বানানে সমতা বিধান কায়েম করার জন্য যুক্তিযুক্ত কোনো বানানরীতি তৈরি করে বানানে সমতা বিধান করতে পারি। ধর্মীয় অঙ্গনের রচনাগুলো যথেষ্ট পরিমাণ মানসম্মত হওয়ার পরও কেবল বানান বিভ্রাটের কারণে অপবাদের স্বীকার যে, একটি বইও নাকি ব্যাকরণগতভাবে উত্তীর্ণ হয় না। ব্যাপারটা এমন নয়, আমরা যখন বোর্ডগুলোর নিয়ম পুরোপুরি মানতে চাচ্ছি না, তো নিজেরা কেন নিজেদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানান দিচ্ছি না? প্রতিষ্ঠিত আলিম লেখকগণও দেখা যায় একেকজন একেক ধাঁচে লিখছেন। কেউ বোর্ডগুলোর সাথে একমত পোষণ করে বোর্ডের বানানে লিখেন, আর কেউ তো না এধার না ওধার, একই রচনায় একই শব্দ তিন বানানে লিখে যাচ্ছেন যে, নিজরও খবর নেই; তিনি অন্যদের হাস্যরসে পরিণত হচ্ছেন।

"

'বাংলাভাষা' তার সোনালি যুগ পার করছে বলা যায়। বাংলাভাষার সমৃদ্ধি ও আধুকায়নের চূড়ান্ত সময়ও এটি। বলা যায়, সেই বরীঠাকুর বা তারও আগ থেকে শুরু হওয়া 'ভাষা' বিন্যাসের চলমান উন্নতি আজ এসে চূড়ায় আরহণ করতে যাচ্ছে। 'বাংলা বানান' নিয়ে বিশৃঙ্খলা তুঙ্গে থাকলেও একটু সাহস করে দাবি করলে বলা যায় যে, বর্তমানে তা অনেকটা গুছিয়েও এসেছে। ফিলহাল বানানে সমতা বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনেক পদক্ষেপ ও উদ্যোগ সামনে আসছে। ব্যক্তিগতভাবেও সবাই যখন সচেতন হতে শুরু করবে, তখন কাজটি আরও তরঙ্গায়িত হবে।

মাদ্রাসায় বাংলাচর্চা:

মাদ্রাসা-অঙ্গনও মাতৃভাষার চর্চা ও বানান সচেতনতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা নানান বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ভাষাচর্চায় বিস্তৃত এক অধ্যায় স্থাপন করে নিয়েছে। যা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। মাদ্রাসা পড়ুয়ারা নিজস্ব পরিসরে মানসম্মত বই-পুস্তক, পত্রিকা, দেয়ালিকা, স্মারক, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ এবং জাতীয় অঙ্গনেও দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে। দুঃখ লাগে, যখন কাউকে বলতে শোনা যায় যে,

" যখন বাংলাচর্চার কথা আসে, তখন আমরা মাদ্রাসা পড়ুয়াদের এসব থেকে ভিন্ন মনে করি যে, তারা এতিমখানায় পড়ে থাকে, আল্লা-বিল্লা করবে...! তারা এসব বুঝবে না।"

ছি, তারা নিজেদের অনেক বড়ো গবেষক মনে করে, অথচ নিজের ঘরের দরজায় অবস্থিত মাদ্রাসাটি সম্পর্কে এতটুকু খবর রাখতে পারেনি যে, এখানে কী পড়ানো হয় ! কী চলে এগুলোর ভেতরে। একটু আত্মসমালোচনা করে বললে বলব যে, আমরাও নিজেদের প্রকাশ করতে পারিনি। মাতৃভাষাচর্চায় আমরা অনেক বিলম্ব করে ফেলেছি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শুধু যে নিজেকে প্রকাশ করব, বিষয়টা এমন নয়, বরং আমাদের সিলেবাসগত একটি অনুষঙ্গই হলো যে, নিজেদের চিন্তা-চেতনা, নিজেদের বোধ-বিশ্বাস জাতির সামনে তোলে ধরব। জাতিকে ওই আদলে গড়ে তোলার সমূহ প্রচেষ্টা আমরা করে যাব। এর জন্য আমরা একযুগ-দেড়যুগ মাদ্রাসার চৌহদ্দিতে বিশেষ প্রশিক্ষণে নিজেদের গড়ে তোলি। কিন্তু সব আয়োজন শেষ করার পর মূল সময়ে এসে আমরা থমকে দাঁড়াই যে, জাতির জন্য অনেক কিছু তো নিয়ে এসেছি, কিন্তু তাদের দেব কীভাবে! আমাদের যে প্রকাশের পুঁজি নেই...! যাক এসব কিছু দিন আগের কথা, এখন সবাই সচেতন হয়ে ওঠেছি। প্রয়োজন একটু বাড়তি উদ্যমতা, আর নিরলস প্রচেষ্টা, ইনশাআল্লাহ, সফলতা বেশি দূরে নয়। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আবশ্যক হলো, প্রতিটি পদে নিখুঁত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেহেতু বানান নিয়ে কথা চলছিল, এক্ষেত্রেও আমাদের কার্যকরি পথেই হাঁটা উচিত। এমন যেন না হয় যে, সামান্য একটি আপেক্ষিক বিষয় আমাদের সফলতায় আড় হয়ে দাঁড়াতে পারে। যতটুকু সম্ভব, এ প্রেক্ষাপটে এসে 'আমাদের' আর 'ওদের'-নামক বিভাজনটি কমিয়ে আনা দরকার। যে কেউ হোক, ভাষার ক্ষেত্রে এসে আদর্শকে টেনে আনা মনে হয় 'বোকামির' মতো কোনো বিষয় হতে পারে। যদি কোনো ধর্মের কথাও আসে, তাহলেও ভাষার ক্ষেত্রে সেটিকে ভাষার নিয়মমাফিক বিবেচনা করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, ওমুক ধর্মের শব্দ হলে, এই ছাড়, বাকিদের জন্য এই ছাড় নেই, আবার কারো ধর্মীয় গোঁড়ামিও যেন ভাষার ব্যাকরণে প্রকাশ না পায়, সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মনীষীদের সচেতন দৃষ্টি রাখা উচিত। ভাষার উৎকৃষ্টতা সবার কাম্য হতে হবে, সকল ভাষাভাষীকে পরস্পরের প্রতি আন্তরিক হতে হবে। তবেই গিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ কিছু হতে পারে। নিচে এই বিষয়ে কয়েকটি কথা তোলে ধরা হলো।

বাংলা বানান বিশৃঙ্খলা ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ:

বাংলাভাষার গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথা; বাংলা বানানে ঐক্য আনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে "বাংলা বানানের নিয়ম" প্রকাশ করে। ১৯৩৬-৩৭ সালের দিকে বিশ্বভারতী চলতি ভাষার নিয়ম প্রণয়ন করে, যার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাংলা বানানের নিয়ম"-এর পার্থক্য ছিল। এর পর থেকে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড ১৯৮৮ সালে, বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালে বানানরীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। এটি ১৯৯৮ সালে পরিমার্জিত হয়ে ২০০০ সালে পুনরায় সংশোধিত হয়।

তারপরও বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আসেনি।

বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পৃথক বানানরীতি রয়েছে। এর বাইরেও আমরা দেখতে পাই একেক পত্রিকা একেক নিয়মে ভাষা ব্যবহার করছে। কলকতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত দৈনিক, আনন্দবাজারের নিজস্ব বানানরীতি রয়েছে, বাংলাদেশের প্রথম আলোর নিজস্ব ভাষারীতি রয়েছে। অন্যদেরও আলাদা নিয়ম রয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, একই শব্দের বানান একেক পত্রিকা একেকভাবে লিখছে! সবার বানানবিধিতে সংস্কৃতজাত নয় এমন শব্দের (যেমন : আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে আগত) শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার (ী) ও দীর্ঘ উ-কার (ূ) তুলে দিয়েছে; কিন্তু সংস্কৃত উৎসজাত শব্দের ক্ষেত্রে তা বহাল রেখেছে। এর ফলে বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, ইংরেজি শব্দাবলির বানান ও উচ্চারণ মূল ভাষার বানান ও উচ্চারণের প্রতিফলন থেকে অনেক ক্ষেত্রেই দূরে সরে গেছে। অথচ নীতিগতভাবেই যেকোনও ভাষায় বহিরাগত শব্দের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব উৎসমূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য ধরে রাখা উচিত। গবেষক গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, শেকসপিয়ারের সমাধিলিপিতে লেখা ছিল "ভত্বহফ", পাথরটাকে তাঁরা (ইংরেজ পণ্ডিতরা) বদলাতে পারলেন না; কিন্তু তাঁরা তা সংশোধন করে বললেন, ওটা হবে "ভত্রবহফ"। কারণ পণ্ডিতরা ঝোঁক দিয়েছিলেন ব্যুৎপত্তির উপর। শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে তাঁরা বললেন, শব্দটা যখন লাতিন থেকে নেওয়া, সুতরাং বানানটাকে সেই মূল শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাক। আবার কোনও শব্দের মূল গ্রিক হলে সেই শব্দে গ্রিকের ছাপটা যেন সামান্য হলেও থাকে । যেমন : একসময় ইংরেজিতে "ডেট" (ঋণ) কথাটা লেখা হতো সোজা বানানে "ফবঃ"। কিন্তু রক্ষণশীল গ্রিক-লাতিনবাদীরা বললেন, মূল শব্দটা যখন "ফবনরঃস", তখন ওটার চরিত্র রক্ষার জন্য "ফবনঃ;ৎ-কে" লেখা হোক "ঃৎব"। কারণ ওর মূলে আছে "ঃত্রববি"।

-(দুখিনী বাংলা বানান,, গোলাম মুরশিদ, প্রথম আলো, ৫-১০-২০১২)

সংস্কৃতজাত নয় এমন শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার (ী) ও দীর্ঘ উ-কার (ূ) তুলে দেওয়ার সপক্ষে অনেককে যুক্তি উপস্থাপন করতে দেখা যায়। প্রথমত বলা হয়, বাংলাভাষায় দীর্ঘ ঈ-কার (ী) ও দীর্ঘ উ-কার (ূ)-এর উচ্চারণ নেই। তথ্য হিসেবে এ দাবি সঠিক। কিন্তু যুক্তি হিসেবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে সংস্কৃতজাত শব্দের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য হওয়া উচিত। তা ছাড়া বাংলা ভাষাবিদরা বলে থাকেন, বাংলা বানান শ্রুতিনির্ভর নয়, স্মৃতিনির্ভর।

(ড. মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম,, অষ্টম মুদ্রণ : মাঘ ১৪২০, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩২)

তাই উচ্চারণের যুক্তি এখানে গৌণ।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘ ঈ-কার ব্যবহার প্রসঙ্গে ড. মাহবুবুল হক লিখেছেন, সংস্কৃত ভাষায় ই এবং ঈ-এর উচ্চারণগত হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা রক্ষিত হয় বলে বানান উচ্চারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। আমরা মনে করি, একই যুক্তিতে বিদেশি শব্দ বিশেষত আরবিতে দীর্ঘ ঈ-কার ব্যবহার করা উচিত। কেননা হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা এ ভাষায় সবচেয়ে বেশি রক্ষিত হয়। তাহলে সেসব শব্দ যখন বাংলায় ব্যবহার করা হয়, তখন সে নিয়ম রক্ষা করা উচিত নয় কি?

তৃতীয়ত, তিনি লিখেছেন, বিদেশি বানানের ক্ষেত্রে যদিও ই-কার ও ঈ-কার দুই-ই সিদ্ধ, তবু ভুল এড়ানো এবং বানান সরল করার উদ্দেশ্যে অধুনা এ ক্ষেত্রে কেবল ই-কার ব্যবহারের বিধি মেনে নেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, ই-কার ব্যবহার করলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ভুল এড়ানো যাবে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নতুনভাবে ভুলের বিস্তার ঘটবে। যেমন শত শত বছর ধরে মানুষ ব্যবহার করে আসছে : ইসলামী, নবী, আলী, শহীদ, গাজী প্রভৃতি শব্দ। অথচ বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাষারীতি অনুসারে এগুলোর শুদ্ধ রূপ হলো: ইসলামি, নবি, আলি, শহিদ, গাজি। এতে কেবল নতুন করে ভুলের সৃষ্টিই হচ্ছে না, বরং এই শব্দগুলো তার মূল আবেদন ও প্রাণ হারাতে শুরু করেছে। তা ছাড়া ভাষা সরল করার উদ্দেশ্য হলে অন্য শব্দের বেলায়ও এ বিধি (দীর্ঘ ঈ-কারকে হ্রস্ব ই-কার করা) প্রয়োগ করা দরকার। অথচ আমরা দেখতে পাই:

ক. স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার হয়। যেমন : নারী, রমণী, সুন্দরী প্রভৃতি।

খ. স্ত্রীবাচক- ইনী প্রত্যয়ান্ত তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার হয়।

গ. সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হয়।

ঘ. ব্যক্তি বা পুরুষ বোঝাতে এবং বিশেষণবাচক তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ঈ-কার হয়!

বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) বানানরীতির ক্ষেত্রে আরেকটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় 'জ' ও 'য'-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ফাউন্ডেশন আরবী বর্ণ- যাল, দোয়াদ, যা- প্রভৃতির ক্ষেত্রে য- ব্যবহার করে থাকে।

এসব অক্ষরযুক্ত শব্দ বাংলা ভাষায় অনেক। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি ইসলাম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে য- ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। যেমন: আযান, ওযু, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান প্রভৃতি। কিন্তু আগ বাড়িয়ে আনন্দবাজার ও প্রথম আলো নিয়ম করেছে : বিদেশি শব্দ ও নামের বানানে য- না লিখে জ- লিখতে হবে।

বর্তমানে মিডিয়া ও সাধারণ শিক্ষিতদের লেখায় তাদের অনুকরণ চোখে পড়ার মতো। অথচ স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের ধর্মীয় লেখকরা ইসলামি ফাইন্ডেশনের বানানরীতি অনুসরণ করে থাকেন। কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী তো বলতেই শুরু করেছেন যে, শুদ্ধ বাংলায় লেখা কোনো ধর্মীয় বই নাকি পাওয়া যায় না। এর ফলে ধর্মীয় লেখকরা বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন।

বোর্ডগুলোর আরও বেশ কিছু নিয়মের কারণে মুসলমানদের শত শত বছর ধরে ব্যবহার করে আসা অনেক শব্দের কেবল অপপ্রয়োগই হয়নি, বিকৃতিও ঘটে। যেমন :

- 'দ্বীন' বহুল প্রচলিত একটি আরবি শব্দ। বোর্ডগুলোর প্রমিত বানান অনুযায়ী তা লিখতে হয়- দিন। আর বাংলা ভাষায় আগে থেকেই দিন শব্দ রয়েছে, যার অর্থ দিবস। আবার অনেকে এ অসুবিধা বিবেচনা করে লেখেন 'দীন'। কিন্তু 'দীন' শব্দও আগে থেকেই বাংলা ভাষায় আছে যার অর্থ হলো দরিদ্র, করুণ ও হীন। এ অবস্থায় এ আরবি শব্দের জন্য এ দুটি বানানের যেটিই ব্যবহার করা হোক না কেন, তা-ই হবে বিভ্রান্তিকর। যদি বলা হয়, দিনের কাজ করো, তাহলে কেউ মনে করতে পারে যে, তাকে রাতের কাজ (ইঙ্গিতবাচক অর্থে চুরি) করতে নিষেধ করা হচ্ছে। আর যদি বলা হয় দীনের খেদমত করো, তাহলে সে মনে করতে পারে, তাকে দরিদ্রদের সেবা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং ইসলাম ধর্ম অর্থে দ্বীন লেখাই শ্রেয়।
- বাংলায় 'রাসুল' শব্দটি কয়েকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: রাসূল, রাসুল, রসূল, রসুল। ঢাকার বাংলা একাডেমি এ ক্ষেত্রে রসুল কে প্রাধান্য দিয়েছে।
- কুরআন শব্দটিরও একাধিক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : কোরান (ঢাকার বাংলা একাডেমির মতে), কুর-আন, কুরআন, কোরআন ইত্যাদি।
- আবার হজ হজ্ব, হজ্জ, হজ্জ্ব 'সব রকম ব্যবহার দেখা যায়।
- আমাদের প্রিয় নবীর নামটিও এই বহু ব্যবহার-এর কবল থেকে রক্ষা পায়নি। যেমন : মুহম্মদ (বাংলা একাডেমি মতে), মুহাম্মদ, মুহাম্মাদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মাদ ইত্যাদি ব্যবহার দেখা যায়।
- শেখ শব্দের ক্ষেত্রে একাডেমি শয়খ-কে কেন প্রাধান্য দিয়েছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।
- ঈদ; যদি দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা যায়, তাহলে ঈমান (ইমান) লিখতে অসুবিধা কোথায়? মুসলমানদের জীবনে ঈদ আসে বছরে দুইবার। আর দিনের ২৪ ঘণ্টাই মুসলমানদের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।
- বাংলা ভাষায় আলী, শাফেয়ী ও ইমাম মেহদী শব্দ তিনটির চেয়েও শহীদ, নবী শব্দ দুটি বেশি ব্যবহৃত হয়। অথচ ঢাকা বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-এ শহিদ ও নবি, হ্রস্ব ই-কার করে আলী, শাফেয়ী ও ইমাম মেহদী দীর্ঘ ঈ-কার করা হয়েছে।
- আরোগ্য বোঝাতে শিফা বা শেফা শব্দটি বহুল পরিচিত। অথচ এর বানানে একাডেমি লিখেছে শাফা । গায়ের মুকাল্লিদ, লেখা সম্ভব হলে গায়র মহরম-এর প্রতি অবিচার কেন?
- ইনশা আল্লাহ আলাদা লেখা হলে এর অর্থ হয় আল্লাহকে সৃষ্টি করো । নাউজুবিল্লাহ! তাই শব্দটিকে একত্রে ইনশাআল্লাহ বা ইন শা আল্লাহ লিখতে হবে।

দ্বীন। বিদেশি শব্দের বানান অনুযায়ী হবে : দিন। কিন্তু ধর্মীয় পরিভাষা হিসেবে আগের বানান বহাল থাকবে।
ঈদ: বিদেশি শব্দের বানান অনুযায়ী হবে :ঈদ। কিন্তু ধর্মীয় পরিভাষা হিসেবে আগের বানান বহাল থাকবে।
তেমনি; নবী, আলী, শরীআত, মুফতী, ঈমান, শহীদ ইত্যাদি। তবে এরজন্য ধর্মীয় অঙ্গন থেকে তালিকা প্রকাশ করা দরকার যে, কোন কোন শব্দ ধর্মীয় ভাবমূর্তি মিশে যাওয়ার কারণে নিয়মবহির্ভূত রাখতে হবে, তহলে সে শব্দগুলো দিয়ে নতুন নিয়ম করা যেতে পারে।

আসুন না, একটু সমাধানের চেষ্টা করি

অভিযোগ শুনতে গেলে কারও পক্ষ থেকেই শেষ হবে না। আসুন, সবাই একটু আন্তরিক হয়ে কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করি।

প্রথম কথা: আমাদের ভাষা যখন এক, মৌলিক ভাষা নিয়ে তো কারও মতভেদ নেই যে, আমি এই বাংলায় বলব, ওই বাংলায় নয়! কারণ এর সুযোগই নেই। ভাষা তো একটিই।

দ্বিতীয় কথা: যেকোনো ভাষার উন্নতি মানেই ভাষার শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ একটি ব্যাকরণ থাকা। প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ তৈরি হোক, এতটুকুতেও কারও মতভেদ নেই।

তৃতীয় কথা হলো: এযাবত বোর্ডগুলো সেসব নীতি প্রণয়ন করেছে, সবগুলোতে যে আপত্তি আছে; এমন নয়, বরং অধিকাংশই গ্রহণ করার মতো, কেবল দুয়েকটি ধারা বা উপ-ধারা নিয়ে কারো কারো আপত্তি আছে, বা থাকতে পারে, ব্যাস। এখন কথা হলো, এই যে আপত্তি, তা একেবারে মিটে যাওয়া সম্ভব কিনা? -হতে পারে, সম্ভব নয়। কারণ মতভেদ সব যুগেই থাকবে; এবং ছিলও। প্রসঙ্গত আরবিভাষার কথা বলি। পৃথিবীর সর্বাধিক সমৃদ্ধ ভাষা এবং সেটির ব্যাকরণের ইতিহাসও হাজার বছরের। বাংলা ব্যাকরণের যেখানে ১০০ বছরও হয়নি। তো আরবি ব্যাকরণ এতটা সমৃদ্ধ ও হাজার বছরের ক্রমবিকাশের পরও এখনও তাতে কত যে মতভেদ রয়ে গেছে! গণনা করলে বিশাল ফিরিস্তি বের করা যাবে। তাই সকল আপত্তি যে মিটে যাবে, এমন নয়। তবে, এমন দূরত্বও কাম্য নয় যে, একই ভাষাভাষী হয়েও কেউ কাউকে পথ ছাড়তে রাজি নয়। একটি কথাই বলব যে, এক্ষেত্রে "আমাদের আর ওদের"এই বিভাজনটি দূরে ছুড়ুন। মৌলিক বিষয়ে এসে কথা বলুন। কারও সীমাবদ্ধতা থাকলে সেটা উল্লেখ করে অক্ষমতা প্রকাশ করতে অসুবিধে কোথায়? প্রথমে আমরাই এগিয়ে আসি, তারপর তারাও এগিয়ে আসতে পারে। উপকার সবারই হবে।

আমাদের বানানরীতি

একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যাকরণ আর বানানরীতি এক নয়। সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য অবশ্যই আছে। ব্যাকরণ সবার জন্য সমান। ধর্মীয় অঙ্গন থেকে যে আপত্তিগুলো তোলা হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু অধিকাংশ বানানরীতির উপর। সবগুলো ব্যাকরণের উপর নয় । ব্যাকরণগতভাবে দেখা যায় একটি শব্দ কয়েকটি রূপে লেখা যেতে পারে। কিন্তু আমি কোনটি লিখব; সেটি নির্ভর করবে আমার অনুসৃত বানানরীতির উপর। যথা, 'হযরত' এবং 'হজরত'; উভয়টি কিন্তু শুদ্ধ। কারণ প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে দোয়াদ-এর জন্য 'জ'-এর ব্যবহার কিন্তু কম নয়। এখন বাংলাদেশ ইসলামিক ফাইন্ডেশন বলছে, আমরা 'য' দিয়ে লিখব। কেননা দোয়াদ, যোয়া, যা, ইত্যাদি য দিয়ে লিখবে, আর জীম লিখবে জ দিয়ে। আর অন্যরা বলছে 'জ' দিয়ে লিখবে কেননা এগুলো ইংরেজি যেড (Z) এর মতো পুরোপুরি সাব্যস্ত হয়নি। তাই জ- দিয়েও লেখা যেতে পারে। [নিচে আলোচনা আসছে।]

তো যেসব জায়গায় ব্যাকরণগত বৈধতা থাকার পরও মতানৈক্য হতে পারে, সেসব জায়গায় সুনির্দিষ্ট বানান নির্ণয় করে নেওয়া হলো বানানরীতি। তাই প্রথমে আমাদেরকে ব্যাকরণে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এরপর বানানে সমতা বিধান কায়েম করার জন্য যুক্তিযুক্ত কোনো বানানরীতি তৈরি করে বানানে সমতা বিধান করতে পারি। ধর্মীয় অঙ্গনের রচনাগুলো যথেষ্ট পরিমাণ মানসম্মত হওয়ার পরও কেবল বানান বিভ্রাটের কারণে অপবাদের স্বীকার যে, একটি বইও নাকি ব্যাকরণগতভাবে উত্তীর্ণ হয় না। ব্যাপারটা এমন নয়, আমরা যখন বোর্ডগুলোর নিয়ম পুরোপুরি মানতে চাচ্ছি না, তো নিজেরা কেন নিজেদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানান দিচ্ছি না? প্রতিষ্ঠিত আলিম লেখকগণও দেখা যায় একেকজন একেক ধাঁচে লিখছেন। কেউ বোর্ডগুলোর সাথে একমত পোষণ করে বোর্ডের বানানে লিখেন, আর কেউ তো না এধার না ওধার, একই রচনায় একই শব্দ তিন বানানে লিখে যাচ্ছেন যে, নিজরও খবর নেই; তিনি অন্যদের হাস্যরসে পরিণত হচ্ছেন।

উফলত বানানরীতি:

সাহস করে আমরা ছোটোরাই শুরু করতে চাইলাম। দারুল উলূম দেওবন্দে চলতি [২০১৯,২০ ইং] শিক্ষাবর্ষে অবস্থানরত বাঙালি শিক্ষার্থীদের নিয়ে পথচলা শুরু করে "উলফত সাহিত্যাসর, দারুল উলূম দেওবন্দ"। এতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরাসহ আশপাশের বাঙালি শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যচর্চার যুগান্তকারী এক আয়োজন। তো উলফতের রুচিশীল সাহিত্যপ্রেমীদের সমন্বয় গঠিত পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধানে দারুল উলূম থেকে প্রকাশিত প্রকাশনীগুলোর বানানের সমতা বিধানের জন্য সংকলন করা হয় "উলফত বানানরীতি"। ইদানিং দারুল উলূম দেওবন্দের বাংলা মুখপত্র , ২৪ পরগণা জেলা ছাত্রসংগঠনের আয়োজনে প্রকাশিত বার্ষিক স্মারক "আল কাসিম", ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র সংগঠনের মুখপত্র "হেরার জ্যোতি", পাক্ষিক উলফত ও বিবিধ দেয়ালিকায় এই বানানরীতি অনুসরণ করা হয়।

এতে যথা সম্ভব বোর্ডগুলোর সাথে আকাঙ্খতা পোষণের চেষ্টা করা হয়। কেবল ধর্মীয় কিছু শব্দে পূর্ব-স্মকীয়তা বহাল রাখার জন্য আবেদন করা হয়। তবে সেগুলোও ভাষার স্বতসিদ্ধ নিয়মের আওতায় রেখেই বিধিবদ্ধ করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। যথা: বোর্ডগুলোর সাথে আমাদের মতভেদ কেবল বিদেশি শব্দের বানান নিয়ে। তবে লক্ষ্ণীয় হলো, বিদেশি শব্দগুলোর মাঝেও কেবল ওই সকল শব্দে আমাদের মতভেদ, যেগুলো ব্যবহার হতে হতে বাংলা শব্দে রূপ নিয়েছে। যথা: উকিল, হাকিম, বাকি ইত্যাদি। আবার এগুলোর মাঝে কিছু শব্দ আছে বস্তুবাদী শব্দ, আর কিছু আছে ধর্মীয় পরিভাষা। এখানে আমাদেরকে বস্তুবাদী শব্দগুলোকে ছাড় দিতে হবে। সেগুলো যখন বাংলা শব্দে পরিণত হয়ে গেছে, ভাষাবিদরা তাদের গবেষণা এবং ভাষার কল্যাণে পরামর্শভিত্তিক বোর্ডসদস্যদের ঐক্যমতে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে তা মেনে নেওয়া হলো ভাষার কল্যাণে হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

যথা: উকিল; এটি একটি বিদেশি শব্দ, বাংলা শব্দে রূপ নিয়েছে, সেই হিসেবে এতে দীর্ঘ-ঈ কার ব্যবহার হবে না। তাই এতে হ্রস্ব-ই কার দিয়ে নিয়মের আওতায় নিয়ে আসা হলে আমাদের সমস্য কোথায়? আমাদের আপত্তি থাকলে থাকতে পারে ধর্মীয় পরিভাষা নিয়ে যে, বিদেশি শব্দের সাধারণ আওতায় ফেলে এলোপাতাড়ি হ্রস্ব-ই কার দিয়ে দিলে, দীর্ঘদিন থেকে লেখে আসা ধর্মীয় শব্দগুলোর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে, আর এটি বাস্তবও বটে। কারণ ধর্মের সম্পর্ক বোধ-বিশ্বাস ও ভক্তির সাথে। আর ভাষা যেহেতু মানুষের জন্য, তাই ভাষার কোনো নিয়ম যদি মানুষের বোধে আঘাত করে, তহলে তা অবশ্যই বিবেচ্য। এর একটি নজীরও রয়েছে যে, ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বাংলা বানানরীতি প্রণয়ন করছিল, তখন রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণে দ্বিত্ব হবে না; এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলে এই দুটি শব্দ; অর্ঘ্য, (পূজার উপকরণ), অর্চ্য (পূজনীয়)-কে বাইরে রাখা হয়েছে। কেননা এগুলো দীর্ঘদিন ধরে এভাবে লেখে আসা হচ্ছে যে, ধর্মীয় ভাবমূর্তি মিশে গিয়েছে। এখন সাধারণ নিয়মের আওতায় ফেললে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করতে পারে; তাই এগুলোকে নিয়মের বহির্ভূত করে ভিন্ন নিয়ম করা হলো। ঠিক তেমনি যদি ধর্মীয় পরিভাষাগুলোতেও দীর্ঘদিনের বানান বহাল রাখার জন্য আবেদন করে সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাহলে আমাদের বানান ব্যাকরণের সাথে সাংঘর্ষিকও হবে না, তেমনি বানানেও শৃঙ্খলা এসে যাবে। উলফত বানানরীতিতে আমরা তাই করেছি যে, যথাসম্ভব বোর্ডগুলোর বানানরীতি বহাল রেখে ধর্মীয় পরিভাষাগুলোতে পূর্ব-বানান বাহাল রাখার আবেদন করেছি।

যথা:

দ্বীন। বিদেশি শব্দের বানান অনুযায়ী হবে : দিন। কিন্তু ধর্মীয় পরিভাষা হিসেবে আগের বানান বহাল থাকবে।

ঈদ: বিদেশি শব্দের বানান অনুযায়ী হবে ইদ। কিন্তু ধর্মীয় পরিভাষা হিসেবে আগের বানান বহাল থাকবে।

তেমনি; নবী, আলী, শরীআত, মুফতী, ঈমান, শহীদ ইত্যাদি

তবে এরজন্য ধর্মীয় অঙ্গন থেকে তালিকা প্রকাশ করা দরকার যে, কোন কোন শব্দ ধর্মীয় ভাবমূর্তি মিশে যাওয়ার কারণে নিয়মবহির্ভূত রাখতে হবে, তহলে সে শব্দগুলো দিয়ে নতুন নিয়ম করা যেতে পারে। এমন করতে পারলে বোর্ডগুলো কর্তৃক (উপরে উল্লেখিত) বানান বিকৃতিও হ্রাস পাবে, কারণ তারাও হয়তো দোলাচলে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ঢাকা বাংলা একাডেমি তো এক ধাপ এগিয়েও এসেছে যে, ধর্মীয় শব্দ বলে "আযান, ওযু, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান প্রভৃতি" শব্দগুলো য- দিয়েও লেখা যেতে পারে, যেখানে বোর্ডের নিয়ম হলো জ দিয়ে লেখা। তাই বলছি, আমাদের আপত্তি যদি বাস্তবমুখি হয়, তাহলে অবশ্যই গৃহিত হবে।

> "
> *যে সকল বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দে রূপ নেয়নি, হোক তা ধর্মীয় অঙ্গনে বহুল প্রচলিত; সেগুলোর বানান কেমন হবে? একটু আগে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেসব বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দে রূপ নিয়েছে, কেবল সেগুলোতেই বিদেশি শব্দের বানানবিধি [দীর্ঘ-ঈ কার ও দীর্ঘ-ঊ কার বর্জনীয়; নিয়মটি] গৃহিত হবে। আর যদি বাংলা শব্দে রূপ না নেয়, তাহলে সেটির হুবহু উচ্চারণ লেখা হবে। যথা "আলহামদুলিল্লাহিহি রব্বিল আলামীন"। এ বাক্যে আমি বিদেশি একটি বাক্যের উচ্চারণ লেখেছি। এবং "আলামীন"-এর ম-বর্ণে দীর্ঘ-ঈ কার দিয়েছি, কেন? আরবি উচ্চারণের দীর্ঘতা বোঝানোর জন্য।*
> "

বাকি থাকল; যে সকল বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দে পরিণত হয়নি, হোক তা ধর্মীয় অঙ্গনে বহুল প্রচলিত; সেগুলোর বানান কেমন হবে? একটু আগে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেসব বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দে রূপ নিয়েছে, কেবল সেগুলোতেই বিদেশি শব্দের বানানবিধি (দীর্ঘ-ঈ কার ও দীর্ঘ-ঊ কার বর্জনীয়, নিয়মটি) গৃহিত হবে। আর যদি বাংলা শব্দে রূপ না নেয়, তাহলে সেটির হুবহু উচ্চারণ লেখা হবে। যথা "আলহামদুলিল্লাহিহি রব্বিল আলামীন"। এ বাক্যে আমি বিদেশি একটি বাক্যের উচ্চারণ লেখেছি। এবং "আলামীন"-এর ম-বর্ণে দীর্ঘ-ঈ কার দিয়েছি, কেন? আরবি উচ্চারণের দীর্ঘতা বোঝানোর জন্য। তেমনি "দারুল উলূম দেওবন্দ"। এ বাক্যে আমি "উলূম" শব্দের ল-বর্ণের দীর্ঘ-ঈ কার দিয়েছি, উর্দু উচ্চারণের দীর্ঘতা বোঝানোর জন্য। কিন্তু "আরবি" এবং "উর্দু"এই দুই শব্দে হ্রস্ব-উ কার দিয়েছি, কেননা এগুলো বাংলা শব্দে রূপ নিয়েছে, আর ব্যাকরণের নিয়ম হলো, সকল নাম হ্রস্ব-ই কার দিয়ে লেখা হবে। যথা: ইংরেজি, হিন্দি, সুরয়ানি ইত্যাদি। আশা করি বিষয়টি গুছিয়ে এসেছে।

এখানে আরেটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাংলা যেসকল শব্দের শব্দমূল আরবি, উর্দু, ফারসি [তথা বাংলা রূপ নেওয়া বিদেশি শব্দগুলো] মূল ভাষা উচ্চারণ রীতিতে লেখা বাঞ্ছনীয়। তাই নিয়ামত, মুকাবিলা, মুশকিল, ইনকিলাব, প্রভৃতির ব্যবহার যথার্থ, যেমনটা বাংলা একাডেমি করেছে। সে হিসেবে মোমিন-এর চেয়েও মুমিন ব্যবহার করা উত্তম। কোরআন না লিখে কুরআন লেখা উত্তম। উলফতে আমরা এমনই লিখব। কাতেব সাহেব না লিখে কাতিব সাহেব লেখা উত্তম। কারণ মূল শব্দে সেগুলোর উচ্চারণ কাতিব, কুরআন, মুমিন, মুশকিল। বাংলায় এমন কোনো নিয়মও নেই যে, হ্রস্ব-ই কারের উচ্চারণ বাংলায় এসে এ-কার হয়ে যাবে! এটি কেবল আমাদের উচ্চারণ বিকৃতি; উচ্চারণে যা হোক লেখ্য-সমাজে কিন্তু বিকৃতি মানা যাবে না। কারণ যারা লিখতে পারে তারা তো শিক্ষিত হয়! ফের মুর্খের মতো লিখবে কেন? একদিকে আমরা আরবি-উর্দু শব্দের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত, অন্য দিকে নিজেরাই সেগুলোকে বিকৃতি করে চলেছি। তবে, দালিল নয় হবে দলিল। কেন? - মূল উচ্চারণে দাল-বর্ণে আ-কারের উচ্চারণ নেই। তেমনি রাসূল নয় রসূল। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম নয়; হবে রহমানির রহীম। এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামই ভালো বুঝবেন যে, আরবিতে এগুলোর কি উচ্চারণ হয়। এখানে আমি লিখলাম "ওলামায়ে কেরাম" কেউ লিখেন "উলামায়ে কিরাম" দুনোটি একিট রীতিতে হলো। কিন্তু যদি "ওলামায়ে কিরাম" লেখা হয়, তাহলে না এধার না ওধার? তেমনি দুয়া না দোয়া? আরবি-উর্দু উচ্চারণে দুয়া। তবে এটি অবহমানকাল থেকে দোয়া লিখতে লিখতে বাংলার সুপ্রসিদ্ধ শব্দে পরিণত হয়ে গেছে। এখানে দুয়া লিখলে উল্টো বিভ্রাট সৃষ্টি হতে পারে। তাই দোয়া লেখে যাওয়াই শ্রেয়। এই শব্দকে আমরা ধর্মীয় পরিভাষার প্রচলিত বানানে অন্তর্ভূক্ত করতে পারি। তেমনি ওলামায়ে কেরাম-শব্দটিকেও। বাকি যে শব্দগুলো ধর্মীয় পরিভাষা নয়, বরং বস্তুবাদী শব্দ; সেগুলোতে বানানে সমতা বিধান ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য একটু এগিয়ে আসলে ভালোই হবে। নতুবা আমরা নিজেরাই আমাদের রচনাগুলোতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে দেখি যে, বানানে বিশৃঙ্খলা পাকিয়ে কেমন যে বে-খবর হয়ে ঘুমুচ্ছি!

ধর্মীয় পরিভাষা বনাম উপাধি

ধর্মীয় পরিভাষা আর আমাদের উপাধি মনে হয় এক নয়, যথা: নবী, ওলী, আলী, পীর প্রভৃতি শব্দগুলো ধর্মীয় পরিভাষা এবং দীর্ঘকাল থেকে এভাবেই লিখে আসা হচ্ছে বিধায়, আমরা এগুলোর স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারি। কিন্তু কাসেমী, নদবী, আলীগড়ী-ইত্যাদি না ধর্মীয় পরিভাষা, না বাংলার কোনো আদি শব্দ! উপাধি তো দৈনিক বাড়তে থাকবে, উপাধির জন্য ব্যাকরণে বিশৃঙ্খলা পাকানোর প্রয়োজনটা কী? আমরা মনি করি, কাসিমি, নদভি, আলিগড়ি লিখলে; না কারো সম্মান কমে যাবে, না কারো ধর্মীয় ভক্তিতে আঘাত আসতে পারে। কারণ আপনি কাসিমি-উপাধি লাগালে যে ধর্মের বড়ো উপকার হয়ে যাবে, আবার না লাগালে যে, কোনো আহমরি ক্ষতি হয়ে যাবে; এমন নয়। সুতরাং বানানে শৃঙ্খলা আনার জন্য নিয়ম মতো নাম, উপাধি ইত্যাদিতে হ্রস্ব-ই কার ব্যবহার করা যেতে পারে। সেখানেও উচ্চারণটা শুদ্ধ করে লিখতে হবে, যথা: কাসিমি; কাসেমি নয়।

প্রতিবর্ণায়ণ:

প্রতিবর্ণায়ণ মানে বিদেশি বর্ণের বিপরীত বাংলা বর্ণ। এখানেও আমরা আগের ভূমিকাটি আনতে পারি যে, যেসকল শব্দগুলো বাংলা শব্দে রূপ নিয়েছে, সেগুলোতে বোর্ডগুলোর সিদ্ধান্ত হলো বানান বিভ্রাট দূর করার জন্য য-আর জ এর ব্যাপার এলে তাতে কেবল জ-লেখা হবে, আর যে শব্দগুলো বাংলা শব্দে রূপ নেয়নি, কেবল বিদেশি উচ্চারণ লেখার দরকার পড়ে, সেগুলোতে আরবি জীম (ج)-বর্ণের জন্য জ, আর ظ ز ض ذ প্রভৃতির জন্য য-লেখা হবে। তবে ধর্মীয় শব্দের জন্য বিশেষ ছাড় থাকতে পারে, অর্থাৎ বাংলা শব্দ রূপ নেওয়ার পর যদি জ-এর জায়গায় য-লেখার প্রয়োজন থাকে, তাহলে লেখা যেতে পারে, তবে সুনির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী। তাই আমাদের এলোপাতাড়ি বিরোধিতা করার কী দরকার? যেগুলো বস্তুবাদী শব্দ সেগুলোতে ছাড় দিয়ে ধর্মীয় শব্দের তালিকা বের করে বানানে সমতা আনা প্রয়োজন নয় কি? বাকি বিদেশি উচ্চারণ লেখার জন্য তো বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নিয়মই আছে যে, জীম-এর জন্য জ, বাকি চার বর্ণের জন্য 'য' । যেমন কোনো দোয়া বা কুরআন কারীমের আয়াত লেখার ক্ষেত্রে লেখা যেতে পারে।

বাকি থাকল: ث س ص –প্রভৃতি বর্ণের জন্য বাংলায় 'স'। ش - এর জন্য 'শ'। ফার্সি چ– এর জন্য 'চ' আর چھ –এর জন্য 'ছ' হবে।

و –আরবি বর্ণ হলে এর প্রতিবর্ণায়ন ব- হবে। আর উর্দু হলে এর প্রতিবর্ণায়ন ব/ভ দুটুই লেখা হচ্ছে, তবে উর্দুর بھ আর ইংরেজির V- এর জন্য বাংলা প্রতিবর্ণে ভ- ব্যবহৃত হয়ে। তাই ওয়াও- এর জন্য ভ –অতটা যুক্তিপূর্ণ নয়। এর জন্য বাংলা অন্তস্থ-ব –কে নির্দিষ্ট করা যায়, যেমনটি

হিন্দিতে উর্দুর ب এর জন্য 'ब', বাংলায় হলো ' ব'। তেমনি উর্দুর و এর জন্য হিন্দিতে 'व', বাংলায় যেটি অন্তস্থ-ব এর মান রাখে। আর উর্দুর بھ এর জন্য হিন্দিতে :'भ' যেটি বাংলার ভ- এর মতো। তাই বাংলায় আমরা ওয়াও-এর জন্য ব-কে নির্দিষ্ট করলে মনে হয় খারাপ হবে না। যথা: নদবি। নতুনা ভ-এখানে পুরিপুরি যুক্তিযুক্ত নয়। এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল ইংরেজি V- থেকে। V- এর জন্য উর্দুতে ওয়াও- ব্যবহার করা হয়, আর বাংলায় ব্যবহার করা হয়, ভ। যথা: ভিসা। তাই বাংলাতেও ওয়াওয়ের প্রতিবর্ণ ভ-মনে করা হচ্ছে। অথচ বাংলায় ভ- হলো উর্দুর بھ -এর প্রতিবর্ণ। আর ভ-এর মহাপ্রাণও ওয়াও-এর প্রতিবর্ণে প্রকাশ পায় না। তাই ব-ই যথেষ্ট। [এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উলফত বানানরীতিতে দ্রষ্টব্য।]

বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। আমরা ছোটোরা কেবল প্রস্তাব রাখছি। আশা করছি, বড়োরা কোনো কার্যকারি কোনো পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের পথ দেখবেন। বাংলাদেশে যেহেতু ধর্মীয় পরিবেশ প্রবল, তাই বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের একত্রে বসে অভিন্ন ভাষারীতি প্রণয়ন করা সময়ের দাবি। অন্তত ইসলাম ধর্মসংশ্লিষ্ট শব্দগুলোর ক্ষেত্রে অভিন্ন লিখন পদ্ধতি প্রণয়ন জরুরি। উভয়টি যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই তাদের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ার কারণ নেই। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু স্থানাভাবে আমাদের এখানেই থামতে হচ্ছে।

২২/৪/২০২০ ইং
বেলা: ১১.৩০ মি.
তাখাসসুস ফিল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ

ভাষা ও বাঙালি

-মু. যায়েদ হুসাইন

"মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলাভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা।"

মানুষ ভাষা সম্পদের অধিকারী। ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার উদ্ভব। পরস্পর ভাব বিনিময়ের জন্য প্রত্যেক সমাজের মানুষ গড়ে তুলেছে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি ব্যবস্থা। সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য ভাষা অন্যতম মাধ্যম। মানবসভ্যতার বিকাশে ভাষার বিরাট অবদান।

ভাষার আমি ভাষার তুমি
ভাষা দিয়ে যায় চেনা!

আমাদের ভাষা কোথা থেকে এসেছে?

মানুষের মত ভাষাও কি জন্ম নেয়? বা যেমন বীজ থেকে চারা জন্মে তেমনই কি জন্মে ভাষা ?

- না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্মে না। বাংলাভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্মেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, হাজার বছর পূর্বে তা ঠিক এমন ছিল না। হাজার বছর পরও এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলাভাষার আগেও এদেশে ভাষা ছিল। সে ভাষায় এদেশের মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করত, কবিতা লিখত, গান গাইত। মানুষের ভাষা উচ্চারণে পরিবর্তন হয়। শব্দের রূপ পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন হয় অর্থের। কিছুদিন অতিবাহিত হলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে ওঠেছে। তেমনি কোনো এক ভাষার পরিবর্তন ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলাভাষার।

আজ থেকে কিছু বছর পূর্বেও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলাভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। ধারণা ছিলো না এ ভাষার বয়স সম্পর্কেও। সংস্কৃত ভাষার প্রায় ৫৫ হাজার শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এই কারণে কিছু লোক মনে করেন, 'বাংলা' সংস্কৃতের মেয়ে। তবে, মায়ের বাধ্যগত মেয়ে না, দুষ্টু মেয়ে। তবে কিছু লোক এটাও মনে করেন যে, বাংলার সাথে সংস্কৃতির তেমন কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিশ্বাস যে, সংস্কৃত থেকে নয়, প্রকৃত ভাষা থেকেই বাংলাভাষার স্বতন্ত্র উদ্ভব ।

বাংলা বর্ণমালা

আমরা বইয়ের পাতা খুললেই যে চিহ্নগুলো দেখতে পাই, তারই নাম বর্ণ বা লিপি। এই বর্ণ বা লিপি আবিষ্কার হওয়ার আগে মানুষ মুখের ভাষায় কথা বলত। তখন লেখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সে অনেককাল আগের কথা। সেই প্রাচীনকালে মানুষ দেয়াল, পাথর, গাছ খোদাই করে ছবি এঁকে মনের ভাব ব্যক্ত করত। এভাবেই ছবি থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা লিপি পেয়েছি। লিপির কারণেই আমাদের ভাষা-সাহিত্য, গল্প-কবিতা, অঙ্কের সূত্র, ঔষধ তৈরির নিয়ম ইত্যাদি স্থায়ীভাবে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে। লিপির কারণেই কিন্তু প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দেওবন্দ থেকে বাংলা পত্রিকা উলফত, আল কাসিম, হেরার জ্যোতি প্রকাশিত হয়েছে।

কয়েকটি স্তর পার হয়ে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার আগমন । যথা:

প্রথম স্তর –

'গ্রন্থিলিপি'; যা মানুষের ছবি আঁকার আগ্রহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। হাজারো বছর পূর্বে মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তুর ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। এখনও মিসরীয় এবং সিন্ধু সভ্যতার পাথুরে খোদাই করা অনেক চিত্র পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় স্তর-

'ভাবলিপি /চিত্রলিপি'; এই স্তরে কোনো বস্তু বা অন্য কিছু বোঝাতে তার পূর্ণ ছবি না অর্ধ ছবি বা নির্দিষ্ট প্রতীকের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা হত।

পদ্ধতি ছিলো অনেকটা এমন: দিন বোঝাতে পূর্ণ বৃত্ত, অর্থাৎ সূর্য আঁকা হত, আর রাত বোঝাতে অর্ধ বৃত্তের সাথে তাঁরা আঁকা হত।

একটি ভাব বা ধারণাকে উপস্থাপন করে এমন প্রতীক চিত্র হলো- ভাবলিপি।

ভাবলিপি উচ্চারণের প্রতিনিধি নয়, তাই এই লিপি যে কোন ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে। পৃথিবীর বহুভাষার বর্ণমালা ভিত্তিক লিখন পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন প্রয়োজনে ভাবলিপি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে ট্র্যাফিক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত চিত্রগুলি এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

তৃতীয় স্তর –
'শব্দলিপি': ধ্বনি থেকে লিপির আবির্ভাবে এ স্তরটি অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ স্তরেই লিপি আসল ধ্বনির চিত্র হয়ে ওঠেছে। ভাবলিপিতে যে বস্তু বোঝাতে প্রতীকচিত্রটির ব্যবহার হতো, সেই বস্তুনির্দেশক ধ্বনি বোঝাতেই এই পর্বে সেই প্রতীকচিত্র ব্যবহৃত হতে লাগল।

চতুর্থস্তর –
'অক্ষরলিপি'; অক্ষরলিপি আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। এই পর্যায়ে চিত্র বা ছবি আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে এল এবং সেই চিত্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝিয়ে কেবল প্রথম অক্ষরটিকে বোঝাতে লাগল।

পঞ্চম স্তর-
'ধ্বনিলিপি'; চিত্র দিয়ে প্রথমে অক্ষর বোঝানো হতো অক্ষরলিপিতে। এই স্তরে সেই চিত্র প্রথম অক্ষরটিকেও সম্পূর্ণ না বুঝিয়ে প্রথম একক ধ্বনিচিহ্ন বা letter-কে বোঝাতে লাগল।

এই ধ্বনিলিপি থেকেই আধুনিক বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি।

বর্তমানে পৃথিবীর সব ভাষার লিপি নেই। ধ্বনিলিপিও সব ভাষায় ব্যবহৃত হয় না।

বাংলালিপির পরিচয়

বাংলাভাষা যে লিপিতে লেখা হয়, এর বয়স হাজার বছরের বেশি । এই লিপি এসেছে ব্রাহ্মীলিপি থেকে। ব্রাহ্মীলিপি ঠিক কোন লিপি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা সঠিকভাবে জানা যায় না। মৌর্য যুগেরও বেশ আগে ভারতের নানা স্থানে ব্রাহ্মীলিপির ব্যবহার ছিল। ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনের রূপটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই লিপিই বাংলালিপির রূপ নিয়েছে। ব্রাহ্মীলিপির পূর্বাঞ্চলীয় রূপটি সপ্তম শতক নাগাদ যে চেহারা বা আকৃতি নিয়েছিল, তা আসলে চতুর্থ-পঞ্চম শতকের গুপ্তলিপিরই বিবর্তিত রূপ। আর এই পূর্বাঞ্চলীয় রূপটিকে বলা হয় কুটিল-লিপি। কুটিল-লিপি থেকে উদ্ভব হয় নাগরী লিপির। প্রাচীন নাগরী লিপির পূর্ব শাখা থেকে ১০ম শতকের শেষভাগে এসে উৎপত্তি হয়েছে বাংলালিপির।

হে বঙ্গভাষা!
তুমি মম মর্মে নিবীড় প্রীতিময়।
তোমার অভূতপূর্ব নব উত্থান,
মহা-বিশ্বে বিস্ময়।
তুমি মম মাতৃভাষা,
তব ছিলে দুর্জয়।

মাতৃভাষা রক্ষায় বাঙালির রক্তমাখা ইতিহাস
(এই অবাদান কেবল বাঙালিদের)

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮বঙ্গাব্দ) বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। এতে তারা ভাষার জন্য আন্দোলন করে এরূপ জীবন উৎসর্গ করে বিশ্ব ইতিহাসে বিরল কৃতিত্ব স্থাপন করল। তাই ভাষা-আন্দোলন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষীদের গৌরবজ্জ্বল একটি দিন। বিগত এক দশক ধরে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও সুপরিচিত সারা বিশ্বে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করায় বাঙালিদের জন্য এই দিনটি বাড়তি এক গর্ব বয়ে এনেছে।

১৯৫২ সালের (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) এই দিন ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়। এতে আবুল বরকত, আবদুল জব্বার ও আবদুস সালামসহ কয়েকজন ছাত্রযুবা হতাহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় রাজপথে নেমে আসেন। তারা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ করে। ভাষাশহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে তোলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা তৎকালীন সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুড়িয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারির এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়। এরপর ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৯ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানেরর অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলা ভাষা...
তুমি বাংলা মায়ের মুখের মধুর হাঁসি,
তাইতো প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি।
তুমি একুশের বীর শহীদের রক্তে রাঙানো স্মৃতি,
গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে কবিতা করছি আবৃত্তি।

বিশ্বজয়ের গল্প

ক্যানাডার ভ্যানকুভার শহরে দুই বাঙালি প্রবাসী রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা দিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব 'কফি আনানের' কাছে ১৯৯৮ সালে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

ওরা দুর্মর, মৃত্যুঞ্জয়ী মহা-বীর,
এনেছে বঙ্গভাষার নব উত্থান।
যুগ-যুগান্তরে গাহিব মোরা,
তোমাদের কীর্তির

এতে তারা ভাষার জন্য আন্দোলন করে এরূপ জীবন উৎসর্গ করে বিশ্ব ইতিহাসে বিরল কৃতিত্ব স্থাপন করল। তাই ভাষা-আন্দোলন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষীদের গৌরবজ্জ্বল একটি দিন। বিগত এক দশক ধরে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও সুপরিচিত সারা বিশ্বে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করায় বাঙালিদের জন্য এই দিনটি বাড়তি এক গর্ব বয়ে এনেছে।

বাংলাচর্চার ইতিহাস

ইতিহাস বলে বাঙালিরা বাংলাভাষা লিখে আসছে প্রায় হাজার বছর ধরে। সংস্কৃত ব্যাকরণরীতি পাঠ করেই বাংলা লিখিত ভাষার চর্চা শুরু হয়েছিল। উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষার যে সর্বসম্মত ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তা মূলত সাধু ভাষার ব্যাকরণ। কিন্তু কথ্য বাংলাভাষার কোনো নির্দিষ্ট চেহারা নেই। হতেও পারে না। বাংলাভাষী মানুষের বিভিন্ন স্থানে কথার ধরন বৈচিত্র্যময়। তেমনি তার বিবিধ উচ্চারণরীতি। বাক্য গঠনের বিভিন্নতা ও শব্দে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের খুব বেশি প্রভাব দেখা যায় বাংলা সমাজে। এটা নতুন কিছু নয়। ভাষা এমন এক বিষয়, যা রাজনৈতিক মানচিত্রের সীমারেখা মেনে চলে না। ভাষায় আঞ্চলিক কথন-কাঠামোয় গড়ে উঠার প্রভাব প্রবহমান ধারায় বয়ে যাওয়া একটি আদি ঐতিহ্য। তাই আদিকাল থেকেই বাংলার সব অঞ্চলের ভাষার বিচিত্র-তারতম্য মিলেমিশে তৈরি করেছে বাংলা ভাষার অবয়ব। এভাবেই বাংলা ভাষার বহমানতা, সমৃদ্ধি, ব্যাপ্তি ও বিকাশ।

ভাষাকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে মূল নদীটিকে বাদ দিয়ে তার জলরাশি তার শাখা-প্রশাখা নানা নদীর সঙ্গে মিলেমিশে বইতে থাকে। এই হলো বাস্তবতা।

রক্তে সঞ্জীবিত ভাষা আজ মৃত্যু-পথে।

নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থেই সাবলীল ভাব প্রকাশ করা যায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে যত সহজ, সাবলীল ও সুন্দরভাবে ভাব প্রকাশ করা যায়, অন্য কোনো ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। এ জন্য মাতৃভাষা সবার কাছে প্রিয়। বাংলা ভাষার রয়েছে গৌরব উজ্জ্বল এক ইতিহাস এবং তা আন্তর্জাতিক ভাবেও স্বীকৃত। ১৯৫২ সালের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাঙালিজাতি এই ভাষাকে আরও আপন করে নিতে পেরেছিল। নতুনা রাষ্ট্রীয় চাপে উর্দুর প্রভাবে পূর্ব বাংলা হতে হয়তো বাংলাভাষা হারিয়ে যেত। বাকি থাকল ভারত-বাংলা। সেখানে আছে হিন্দির প্রভাব। কিন্তু আজকে আন্তর্জাতিক ভাবে মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় বিশ্বজুড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে UNESCO বাংলা ভাষাকে বিশ্বের এক নম্বর মধুর ভাষা হিসাবে স্বকৃীত দিয়েছে। যার ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের ফলে আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে বাংলাভাষা তাদের দাপ্তরিক অথবা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পৃথিবীতে ২৫০০ ভাষার মধ্যে বাংলাভাষার অবস্থান সপ্তম স্থানে।

এত স্বীকৃতি ও অর্জনের পরও বাংলাভাষা আজ অবহেলিত।

ইউনেস্কোর একটা তালিকা বেরিয়েছিল যে, কোন ভাষা কতটা বিপদের মধ্যে আছে, তাতে অনেক আদিবাসী ভাষাই রয়েছে। কিন্তু ইংবেজির কোনো বিপদ নেই। বাংলার একটু বিপদ আছে, কিন্তু এখনও তত বড়ো বিপদ নেই অবশ্য যে, তাধ্বংস হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। তবে এ জাতির শিক্ষিত সামাজ বাংলাকে বাংলিশ করা কিংবা তাদের হিন্দি-প্রেম যে হারে বাড়ছে, এভাবে চলতে থাকলে ধ্বংসটা কিন্তু বেশি দূরেও নয়। কিছু দিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রভাষক সতর্ক করে বলেছেন যে, এভাবে চলতে থাকলে হয়তো ২০৭০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষা পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

বাংলায় সাবলীল কথা বলা, এর চর্চা করা আমাদের কাছে বিরক্তিকর ও নিচু মানের ব্যাপার বলে মনে হয় যেন। ইংরেজিতে কথা বললে যেন নিজেকে ভদ্রলোক মনে হয়। বিচিত্র আমাদের ভাষাপ্রীতি। শিক্ষিত লোকদের বাংলা বলার ঢঙ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। তাতে ইংরেজির আভা লক্ষ যায়। বাংলা বলতে গিয়ে তারা ইংরেজি শব্দ অতিমাত্রায় প্রয়োগ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। টিভি উপস্থাপকেরা বাংলার সাথে ইংরেজি এবং ইংরেজির সাথে বাংলা মিশিয়ে খিচুড়ি উপস্থাপনা করেন, যা রীতিমতো পীড়াদায়ক। বলার কেউ নেই, দেখার কেউ নেই, চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতেও বধির পুরো জাতি। ভাষার তরে জীবন উৎসর্গকারীদের স্বপ্ন আজ অবহেলিত।

ভাষাচর্চা কীভাবে চলছে, কোন মানের ভাষা শিখছে শিক্ষার্থীরা দেখার কেউ নেই । যাদের এ ক্ষেত্রে করণীয় তারা অনেকে নিজেই উদাসীন।

কার্যকর ভূমিকা কেউ রাখছে না, কেউ কেউ টিভি-টোকশোতে দুয়েক বাক্যে আফেসোস ঝেড়েই শেষ। মনে হয় ভাষা যেন-তেন-ভাবে বললেই হলো।

বিশ্ব-বাস্তবতার আলোকে ইংরেজি জানা বা শেখার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, তাই বলে নিজের ভাষাকে তুচ্ছ করে নয় মোটেও। আগে মাতৃভাষার গাঁথুনি, পরে অন্য সব। বাংলাভাষার এই দুর্যোগ গতিশীলতাকে মাঝেমধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে দেখে সমাজে আশঙ্কার মেঘ জমে ওঠে।

এ কথা তো সত্য যে, প্রচলিত মূলধারার বাংলাভাষায় ইংরেজি ছাঁচ অনেক দিনের আমদানি। সেই সঙ্গে ভাষার অস্তিত্বসংকটের প্রসঙ্গটিও উঠে এসেছে মুটামুটি অনেক আগ থেকেই। এ নিয়ে ইদানিং "গেল গেল" রব ওঠেছে। তার কিছু নমুনা এখানে দিতে চাই। আমেরিকায় বা লন্ডনে জন্ম নেওয়া বা বেড়ে উঠা ছেলেমেয়েদের বাংলা শুনলে মনে হবে তারা বাংলাভাষা দিয়ে ইংরেজিকেই সমৃদ্ধ করছে।যেমন:

-তুমি কি গোসল করেছ?

-আমি গোসলড ইয়েসটারডে।

-তুমি কি স্কুলের হোমওয়ার্ক শেষ করেছ?

-আমি করিইং তো।

-তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো

-আই উইল শেষ ইট

-চলো আজ মসজিদে ইফতার করব।

-মা, আমরা আল্লাহ পার্টি যাব?

যাগগে, প্রবাসীদের ক্ষেত্রে এমন হওয়াটা কোনো রকম মানা যায়। কিন্তু নিজ দেশে নিজ মাতৃভাষার অবহেলা, তা কী করে মানা যায়।

ইতিহাস বলে বাঙালিরা বাংলা ভাষা লিখে আসছে প্রায় হাজার বছর ধরে। সংস্কৃত ব্যাকরণরীতি পাঠ করেই বাংলা লিখিত ভাষার চর্চা শুরু হয়েছিল। উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষার যে সর্বসম্মত ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তা মূলত সাধু ভাষার ব্যাকরণ। কিন্তু কথ্য বাংলা ভাষার কোনো নির্দিষ্ট চেহারা নেই। হতেও পারে না। বাংলাভাষী মানুষের বিভিন্ন স্থানে কথার ধরন বৈচিত্র্যময়। তেমনি তার বিবিধ উচ্চারণ রীতি। বাক্য গঠনের বিভিন্নতা ও শব্দে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের খুব বেশি প্রভাব দেখা যায় বাংলা সমাজে। এটা নতুন কিছু নয়। ভাষা এমন এক বিষয়, যা রাজনৈতিক মানচিত্রের সীমারেখা মেনে চলে না।

উদাহরণস্বরূপ
আমাদের তো লাভ ম্যারেজ করে বিয়ে।
মেয়েটাকে একদম ডল পুতুলের মত দেখতে!!
কাল সকালে আমি মর্নিং ওয়ার্কে যাবো....
আজ রাতে আবার নাইট ডিউটি আছে।
দুপুরে তো লাঞ্চ খেলেন না, রাতে ডিনারটা অবশ্যই খেয়ে নেবেন।
সত্যি ছেলেটার গলার ভয়েস খুব ভালো।

বেশ কিছু শব্দ অধিক ব্যবহারের কারণে তা কোন ভাষার, সেটা নির্ণয় করাটাও কঠিন হয়ে পড়ে।

সাম্প্রতিক কিছু নিত্য ব্যবহার্য বিদেশি শব্দ বাংলা জায়গায় সবার মুখে মুখে, যেমন: স্ট্যাটাস, ট্যাগানো, আপলোড, ছবি পোস্ট করা, ডিলিট, রিমুভ, কল মি, সরি, লাভ ইউ, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি, শিট হোলি শিট, দোস্ত জিনিসটা সেরাম জোশ, চুপ যা না ইয়ার-এ রকমই অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, এগুলোর বৈধতা দিতে গেলে বলতে হবে, হিন্দি-ইংরেজির ঐক্যজোটে বাংলিশ নামের ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় অনুপ্রবেশ করা শব্দ।

টেবিল-চেয়ারের মতোই, নিজ ভাষার অবহেলার করণে অন্য ভাষার অনেক শব্দ অনায়েসে বাংলা শব্দভান্ডারে ঢুকে পড়ছে। তাতে অবশ্য ভাষা সমৃদ্ধি হয়ে থাকে, কিন্তু ভাষার যে স্বকীয়তা হারাতে হচ্ছে; তার ভার কে নেবে?

গত দুদশকে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে নতুন প্রজন্মের বড়ো অংশের কথ্য বাংলায়।তাদের জগাখিচুড়ি ভাষা শুনলে বুঝে উঠা দায় যে, আসলে কোন ভাষায় কথোপকথন চলছে।

একটা ভাষা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানে পুরো মানব সভ্যতার ক্ষতি! সাথে একটা সংস্কৃতি; তার ইতিহাস, তার জ্ঞানভাণ্ডার সমস্ত কিছুই লুপ্ত হয়ে যায়। এ জন্যে গাছপালা উজাড় হয়ে গেলে যেমন সভ্যতার ক্ষতি, তেমনই ভাষা বিলুপ্ত হলেও একটা ক্ষত তৈরি হয়। ‘ ভাষা গেল গেল রব’ আছে ঠিকই, তার জন্য যথেষ্ট দরদ আছে এমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তনের ছাপ ভাষাই ধারণ করবে, সেটিই স্বাভাবিক। তাই কবির ভাষায় বলতেই হয়,

“তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।”

যখন বাংলাভাষী মানুষ অথবা বাংলাভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কেউ কথা বলে তখন অনেক খারাপ লাগে। আমরা ৫২তে ভাষার জন্য সংগ্রাম করতে পারিনি তো কি হয়েছে, এখনও অনেক সুযোগ আছে আমাদের প্রাণের বাংলাভাষাকে বিশ্ব দরবারে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার। প্রয়োজন শুধু সকলে সকলের স্ব স্ব অবস্থান থেকে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার। আনন্দিত হই যখন দেখি ভিনভাষী ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে বাংলায় তার মনের ভাব প্রকাশ করতে করতে তার মুখখানি লাল টুকটুকে হয়ে যাচ্ছে। বিদেশীদের বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা দেখে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমাদের নিজের ভাষার জন্য আমি কি করেছি, কতটুকু করেছি?

মাদ্রাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; একটি আত্মদর্শন

একজন যোগ্যতাপূর্ণ আলিম ভিনরাজ্যের অথবা দূরবর্তী কোনও জেলার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। মাসে ২ দিনের জন্য অথবা ৬ মাস অন্তর কয়েকদিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। এটাই তাঁর জীবন? এর বাইরে কি তাঁর আর কোনও ভাবনা নেই? দায় নেই? দায়িত্ব নেই? তাঁর গ্রামের মক্তবটা ঠিকঠাক চলছে না। সেখানকার পরিকাঠামো ঠিক নেই। সেখানে একটি ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন। এলাকার শিশুদেরকে প্রাথমিক মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার কোনও আগ্রহ তাদের অভিভাবকদের নেই। তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির প্রয়োজন। এগুলি কি একজন আলিমের কাজ নয়?

-কাজী মনজুর আলম

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু থাকে। অনুরূপ মাদ্রাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন; বিশেষত কুরআন হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় উম্মাহর মাঝে তুলে ধরা ও এই মিশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তি তৈরি করা। পশ্চিমবাংলার সমাজ, ভাষা ও সমাজের প্রেক্ষিতে উক্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ সার্থকতা তখনই পাওয়া যাবে যখন স্থানীয় সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করে সেখানকার মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যক্রমে সামান্য কিছু হেরফের করা হবে। যেটা বাংলাদেশ ১৫/২০ বছর আগে করেছে এবং আশাতীত ভাবে সফল হয়েছে। সেখানকার মাদ্রাসাগুলিতে মাতৃভাষাতেই পড়ানো হয়। আরবি-বাংলা ও বাংলা-আরবির কম্বিনেশন। ফলস্বরূপ সেখানকার ছাত্ররা দুটি ভাষাতেই বেশ দক্ষ হয়ে ওঠে। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আরবি, উর্দু, বাংলা, একসাথে তিনটে ভাষাকে মিলিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে ছাত্রদের পক্ষে কোনও একটি ভাষাও আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না।

উর্দুর প্রয়োজন অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। আরবির পরে এই মুহূর্তে ইসলামী স্কলার, গবেষক ও বিদগ্ধ লেখকদের মূল্যবান বইপত্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্ভার উর্দুতে। তাই উর্দু না জানা মানে সেগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া। তবে কী, উর্দু ভাষাটা এতই সহজ ও আরবির সাথে এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একজন আরবি পড়ুয়া ছাত্র মাত্র কয়েকদিনের চেষ্টায় তা আয়ত্ত করে নেবে। সাথে সাথে উর্দুকে একটা স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে শেখানোও যেতে পারে। মোটকথা আরবি ও মাতৃভাষা এই দুটি-র উপর আমাদের মাদ্রাসা-ছাত্রদের অনেকটাই দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতার কারণেই তারা ইসলামি শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্র, দু' জায়গাতেই পিছিয়ে পড়ছে। সেটাকে কাটাতে গেলে আমাদের বাংলাদেশের দেখানো ফর্মুলা প্রয়োগ করতে হবে। তারা সফল হয়েছে, আমরাও সফল হব ইন শা-আল্লাহ্। কেননা শিক্ষাকে সমাজোপযোগী না করে তুলতে পারলে সেই শিক্ষা থেকে সমাজ কি ভাবে উপকৃত হবে? বিশেষত যখন এটা ইসলামি শিক্ষা। যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, তার সমস্ত বিধিবিধানকে জেনে নিজে তা মান্য করা এবং অপরের কাছে সঠিক জিনিসটা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

কুরআন এবং হাদীসের আলোকে একজন আলিমের জন্য এই দু'টি জিনিস একেবারে অপরিহার্য। কুরআনের ভাষ্যমতে :

اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب

অর্থ : তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো! দ্বিতীয় বিষয়টি প্রিয় নবী (সঃ) -এঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে

-بلغوا عني ولو آية

রূপে।

অর্থাৎ : আমার পক্ষ হতে প্রাপ্ত সবকিছুই অপরের কাছে পৌঁছে দাও, যদিও তা কিঞ্চিৎ পরিমাণ হয়।

একজন আলিম যদি মাদ্রাসায় জীবনের প্রথম ২০ বছর ছাত্র রূপে আর পরের ৪০ বছর শিক্ষক রূপে কাটিয়ে অনেক যোগ্য ছাত্র তৈরি করে তবে নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড়ো সওয়াবে জারির কাজ। সেই সমস্ত ছাত্রদের একটা বড়ো অংশও পরবর্তীতে এই মিশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আবার একাংশ সমাজের দ্বীনি চাহিদা পূরণ করবে। কিন্তু দিন শেষে ইসলামটাকে শুধু মাদ্রাসার চার দেওয়ালের মাঝেই আবদ্ধ করে রাখা হলো না তো! প্রত্যক্ষ ভাবে একজন আলিমের কাছে সমাজের কি কোনও দাবি নেই? মাদ্রাসার একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন বা লক্ষ্য হলো, কুরআন-হাদীস তথা পরিপূর্ণ দ্বীনকে সংরক্ষিত রাখা ও যে কোনও প্রকার বিকৃতি থেকে সেগুলিকে বাঁচানো। সে দিকে দেখলে শিক্ষকদের একটা অংশকে শুধুমাত্র পড়া, পড়ানো, লেখালেখি ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে আত্মনিয়োগ করা উচিত। উপরোক্ত শ্রেণি ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়া উচিত। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের পাবন্দির বিষয়কে মাথায় রেখেও বলা যায় যে, ইচ্ছা থাকলেই তাঁরা গ্রামে বা এলাকায় দ্বীনি চেতনা জাগাতে ও দ্বীনি চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন। জলসার দাওয়াতে তাঁরা যেমন 'ইচ্ছা' নিয়ে অংশগ্রহণ করেন ও সারারাত না ঘুমিয়েও পরদিন ক্লাস জয়েন করেন, আশা করা যায় তার সিকিভাগ 'ইচ্ছা'-ও এলাকায় দ্বীনি কাজ করার সুযোগ এনে দেবে।

একজন যোগ্যতাপূর্ণ আলিম ভিনরাজ্যের অথবা দূরবর্তী কোনও জেলার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। মাসে ২ দিনের জন্য অথবা ৬ মাস অন্তর কয়েকদিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। এটাই তাঁর জীবন? এর বাইরে কি তাঁর আর কোনও ভাবনা নেই? দায় নেই? দায়িত্ব নেই? তাঁর গ্রামের মক্তবটা ঠিকঠাক চলছে না। সেখানকার পরিকাঠামো ঠিক নেই। সেখানে একটি ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন। এলাকার শিশুদেরকে প্রাথমিক মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার কোনও আগ্রহ তাদের অভিভাবকদের নেই। তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির প্রয়োজন। এগুলি কি একজন আলিমের কাজ নয়? উপযুক্ত কোনও কারণ ছাড়াই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলেন। তাদের নিকটবর্তী হয়ে দ্বীনকে বোঝানোর কোনও গরজ কি তাঁর নেই? বয়স্করা কুরআন শিখতে আগ্রহী, কিন্তু কোনও পরিকাঠামো, কোনও সুযোগ কিছুই নেই। সেগুলো তৈরির দায়ও কি তিনি পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেন? তবে এর অর্থ এই নয় যে, মাদ্রাসার শিক্ষক একজন আলিমকে হাদীস-কুরআনের দরস দেওয়া ছেড়ে এসব সামাজিক খিদমতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিই, দ্বীনের সহীহ ভাবমূর্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে মাদ্রাসার কোনও বিকল্প নেই। তাই এর প্রতি প্রত্যেক আলিমের ভালবাসাটাও অসীম। সেখানে শিক্ষকতা করতে পারাটাও সৌভাগ্য ও গর্বের সোপান। কিন্তু এর জন্য একজন আলিম তাঁর পাড়া, তাঁর গ্রাম, তাঁর এলাকা ও সর্বোপরি সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যেতে পারেন না।

সারকথা হলো, সমাজের খিদমত ও তাদের মধ্যে দ্বীনি অনুভূতি জাগ্রত করার দায়িত্ব একজন আলিমের জন্য অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। যে সমস্ত আলিম স্বাধীন হয়েও এই কাজগুলো করেন না, সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখেন না, তাঁদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, তাঁরা এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করুন। আর এই পরিবর্তনটা নিজের থেকেই শুরু করুন। মনে রাখবেন, আল্লাহ্ আপনাকে অনেক বড়ো নিয়ামত প্রদান করেছেন, যার কিঞ্চিৎ পরিমাণ শুকরিয়া আপনি এভাবেই আদায় করতে পারেন।

পশ্চিমবাংলার সমাজ, ভাষা ও সমাজের প্রেক্ষিতে উক্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ সার্থকতা তখনই পাওয়া যাবে যখন স্থানীয় সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করে সেখানকার মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যক্রমে সামান্য কিছু হেরফের করা হবে। যেটা বাংলাদেশ ১৫/২০ বছর আগে করেছে এবং আশাতীত ভাবে সফল হয়েছে। সেখানকার মাদ্রাসাগুলিতে মাতৃভাষাতেই পড়ানো হয়। আরবি-বাংলা ও বাংলা-আরবির কম্বিনেশন। ফলস্বরূপ সেখানকার ছাত্ররা দুটি ভাষাতেই বেশ দক্ষ হয়ে ওঠে।

দেশের পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য আগে নিজে তৈরি হতে হবে। এই মুহূর্তে যাদের কর্তব্য তারা কাজ করছেন। শিক্ষার্থীদের এখন কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা।

মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা.

মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা.। দারুল উলূম দেওবন্দের অ্যাকাডেমিক প্রথম বাঙালি অধ্যাপক। বর্তমানে দারুল উলূমে তিনজন বাঙালি অধ্যাপক রয়েছেন। এঁদের মাঝে মুফতী উসমান গনী সাহেব প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এর আগে আরও অসংখ্য বাঙালি দারুল উলূমের সহকারী উস্তাদ বা সহকারী মুফতী হিসেবে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে গেছেন। তবে অ্যাকাডেমিক অধ্যাপক হিসেবে এ যাবত এঁরা তিনজনই নিয়োগ পেয়েছেন।

মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা. যেমন বাঙালি হিসেবে মাতৃভাষা বাংলাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসেন, বাঙালি ওলামাদের ভাষাচর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করেন, তেমনি উর্দুতেও তাঁর দরস দারুল উলূমে বিখ্যাত এবং বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত। তাঁর দরস যেমন গোছালো, তেমনি সাহিত্যপূর্ণ এবং সাবলীল। প্রতিজন শিক্ষার্থী অনায়েসে দরস বুঝে নিতে পারে। দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যাপনার সাথে সাথে তিনি নানাবিধ সামাজিক দ্বীনী কর্মকাণ্ডেও সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং সময় দেন। বিশেষ করে সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে দ্বীন পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের মাঝে দ্বীনি চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নবীন আলিম এবং শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বভাবত এর জন্য প্রত্যেক আলিমকে মাতৃভাষায় দক্ষ হতে হবে। তাই তিনি বাঙালিদের যে কোনো মজলিসে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।" উলফত সাহিত্যাসর"- প্রতিষ্ঠা পর-পরই হজরতের অভিভাকত্বের ছায়া অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করে নেয়। সম্প্রতি উলফতের ভাষা সংখ্যার জন্য হজরতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার নিতে উলফত পরিবার হজরতের বসভবনে গিয়ে উপস্থিত হয়। সাতজনের সাক্ষাতকার দলে ছিলেন হুসাইন আলহুদা; সম্পাদক উলফত, জুবাইর আহমদ; ত্রিপুরা, আব্দুল্লাহ মু. ইউসুফ; সহকারী সম্পাদক- উলফত, মনিরুল হক; করিমগঞ্জ, মাহমুদুল হাসান; হুগলি, যায়েদ হুসাইন; ভাষা সম্পাদক উলফত, মাসনূনুল হক; করিমগঞ্জ প্রমূখ। সাতজনের সাত প্রশ্নের এই সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, দিকনির্দেশনা, পাথেয়সহ অনেক কিছু। বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস এবং শিক্ষার্থীদের জিম্মাদরি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। পাঠকের জন্য সাক্ষাৎকারের চম্বুকাংশ তোলে ধরা হলো। রেকর্ডার থেকে সাক্ষাৎকারটি পত্রস্থ করেছেন যায়েদ হুসাইন। হুসাইন আলহুদার বিন্যাসে পাঠক সমীপে...।

প্রথম প্রশ্ন (হুসাইন আলহুদা) :
নিজেদের আত্মসমালোচনা দিয়ে শুরু করি। আমাদের পড়ালেখায় গতানুগতিকতা এসে গেছে। সমাজে অবদান রাখার মনসিকতা একেবারে লোপ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের অনেকে এ ধরণের মানসিকাতাকে (সামাজভাবনাকে) আপেক্ষিক বা অনর্থক মনে করে। তো আমাদের করণীয় বা জিম্মাদারি সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা কামনা করছি।

মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা.:
এটাতো আমাদের নিজেদেরই খোঁজে বের করা দরকার। যেহেতু এটা (ইলমে দ্বীন অর্জন) একটা তেজারত বা ব্যবসা। ঈমান-আমলের সাথে সাথে আল্লাহর কথাকে (দ্বীনকে) উঁচু করার জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয়; তাকে কুরআন কারীমে ব্যবসা বলে আখ্যায়িত করেছে। চাই সেটা (দ্বীন বিজয়ের প্রচেষ্টা) যেভাবে করা হোক; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সেই সূত্রে আমাদের লেখাপড়াটাও বড়ো জিহাদ। আল্লাহ তাআলাই একে তিজারত বা ব্যবসা বলেছেন। এখন কেউ যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকে; আমাদের বাংলার ব্যবসায়ীদের দিয়ে একটি উপমা দিই। আমাদের যে এলাকা; অর্থাৎ হাওড়া জেলা। হাওড়া কলকাতার নিকটবর্তী এলাকা। এখানে বাড়িতে-বাড়িতে (প্রতি বাড়িতে) মাল তৈরি হয়, রেডিমেট কাপড় তৈরি হয়, যারা কাপড় তৈরি করে, সাধারণত তাদের বাড়িতে বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরি বানানো থাকে। উপরের তলায় মানুষ থাকে আর নিচের তিন চার তলাতে ফ্যাক্টরি। এরপর তারা বিভিন্ন সেক্টরে কাপড় সাপ্লাই করে। তাদের দোকান আছে মেট্রো হাওড়া হাটের বিভিন্ন জায়গায়। তো যিনি ব্যবসায়ী, তিনি শুধু মাল সাপ্লাই করেন কেবল তা নয়; বরং যাদের কাছে সাপ্লাই করে এবং সারা বছর যাদের কাছে মাল পাঠিয়েছে; বছর শেষে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যান;- যদিও তাদের যাওয়ার ব্যাপারে লোকেরা এটাই মনে করে যে, সারা বছরের পাওনাগুলো উসুল করার জন্য যাচ্ছে- কিন্তু যারা অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী; তারা খদ্দেরের কাছে গিয়ে ওই ধার-পাওনার কথাই তুলে না । তারা জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি তো আমাদের মাল নিয়েছেন; রেডিমেট কাপড় আমদানি করেছেন। এর মধ্যে আপনার সুবিধা-অসুবিধা কেমন হলো। কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়েছে কিনা? আমাদের লোকেরা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছে? আমাদের ফ্যাক্টরির তৈরি কাপড়গুলো কেমন পেলেন?
তার মানে কি, আমি যে ব্যবসা করছি সেটা যুগোপযোগী কিনা? কাস্টমারদের চাহিদা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা? এর খোঁজ-খবর রাখা নিজেরই কর্তব্য। অন্য কেউ এসে ব্যবসায়ীকে বলবে না যে, আপনার মালটা এ রকম হচ্ছে, এ রকম হওয়া দরকার, ইত্যাদি। কারণ সবাই জানে যে, মাল খারাপ হলে তারই ব্যবসা বরবাদ হবে। সুতরাং আমি গিয়ে কেন বলব যে, তোমার মালগুলো ভালো হচ্ছে না.....। বরং যে ব্যবসা করবে তাকেই নিজের চিন্তা নিজে করা দরকার। আমি ইলম শিখছি, দ্বীনী পড়া পড়ছি। কি উদ্দেশ্যে পড়ছি? –নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার সাথে সাথে মানুষের সেবাও একটি বড়ো মাকসাদ থাকে আমাদের। তো আমাকে মানুষের অবস্থা জানতে হবে। জিজ্ঞাসা করতে হবে, তাদের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে ভাই, আপনারা যে উদ্দেশ্যে মাদ্রাসায় চাঁদা-পত্র দিচ্ছেন, সে উদ্দেশ্য আপনাদের অর্জন হচ্ছে কিনা? আপনাদের চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারছি কিনা?

তারা যা বলবে, সে অনুযায়ী আমরা শুধরে নেব। এটি আমাদের কর্তব্য। আমাদের করতেই হবে। অর্থাৎ মানুষের মাঝে গিয়ে ইলম-দ্বীনের প্রচার প্রসার করতে হবে। ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে, ইন্ডিয়াতে যত মাদ্রাসা আছে, সবগুলোর সামষ্টিক ছাত্র সংখ্যা অনুপাত করলে, ভারতের মুসলমানদের সংখ্যা হিসেবে শতকরা একজনও নয়। অর্থাৎ শতের মাঝে একজনও মাদ্রাসায় আসছে না। নিজের এলাকার হিসেব নিয়ে দেখি:
(পাশে বসা মাহসুদুল হাসান, হুগলিকে) তোমাদের গ্রামে কতজন মানুষ থাকে?
(মাহমুদুল হাসান) কমসেকম দুই থেকে তিন হাজার।
-দুহাজার ধরে নেওয়া যাক। এর মধ্যে তোমরা কতজন মাদ্রাসায় পড়ছ?
-দুই থেকে তিনজন।
-তাহলে শতকরা একজন বলাটা বেশি হয়ে গেল। হাজারে একজন বলতে হবে। হাজারে একজন ধরুন। কোনো জায়গায় হয়তো বেশি ছেলেও পড়ছে। তো বাকি শতকরা ৯৯ জন বা ৯৯৯ জন, তারা কি মুসলমান নয়।
এতটা নাই হোক; নাহব, সারফ, বালাগাত; তাদেরকে এতকিছু পড়াবার দরকার তো নেই, ন্যূনতম একজন মানুষ ইসলামের গণ্ডিতে থেকে জীবন-যাপন করতে পারে, তথা হালাল-হারামের মাঝে তমিজ করতে পারে, এই পরিমাণ ইলম আমাদের পক্ষ থেকে তাদের কাছে পৌঁছানো উলামা-তলাবা সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এখন সেটা কিভাবে পৌঁছাব?
তা তাদের কাছে গেলেই তবে বুঝা যাবে যে তারা কি চায়? তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো সামনে রেখে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তখনই বুঝা যাবে যে, আমাদের এই পড়াটা কতটা যুগোপযোগী হচ্ছে; জীবনমুখী ও গণমুখী হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন (আব্দুল্লাহ মু. ইউসুফ):
দারুল উলূমের মাকসাদে তাসীস বা প্রতিষ্ঠার মূল চেতনা কী? পড়ালেখা না বিপ্লব? দুই ধরণের কথাই শক্তিশালী সূত্রে প্রসিদ্ধ। এ নিয়েও আমাদের মাঝে আছে ব্যাপক মতভেদ, মতানৈক্য। পড়ালেখা ও বিদ্যমান আকাবিরদের নিয়েও এদিক-সেদিকের মন্তব্য করা হচ্ছে। বা বলা যায় হওয়ার প্রেক্ষাপটও থাকতে পারে। হুজুরের দিকনির্দেশনা কী?

মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা.:
বিপ্লব আর পড়াশোনা নিয়েই যতো প্রশ্ন। (আমি শিক্ষার্থীদের বলব:) বিপ্লব মানে আন্দোলন-সংঘর্ষ-জিহাদ এটাই তো? এর মধ্য থেকে কোনটা নেই পড়াশোনায়? বলতে পারো পড়াশোনাই বিপ্লব। কিংবা বলতে পারো বিপ্লব পড়াশোনারই একটা অংশ। পড়াশোনা মানুষের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে পরিবর্তন আনে। দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষ কীভাবে সফল হতে পারে তার পথ দেখায়। রাস্তা দেখায়। এটাকেই তো সঠিক অর্থে বিপ্লব বলে। এটাই আন্দোলন। তা পড়াশোনাতেই আছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যও তাই। কুরআন কারীম থেকে এর ব্যাখ্যা দিন। ওই যে আয়াতটি:

فلو لا نفر من كل.........

এ আয়াতে দুটি কথা বলা হয়েছে: তাফাক্কুহ ফিদ্দিন (দ্বীনের প্রজ্ঞার্জন করা) আর ইনজারে কওম (জাতিকে দ্বীনের কথা স্মরণ করে দেওয়া)। যখন আমি পড়াশোনা করব, তার সাথে আমি মানুষের কাছে গিয়ে দেখব যে, আমি তাদের চাহিদা মতো হতে পারছি কিনা? তাহলে ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসার উদ্দেশ্য সফল হবে। আলী মিঁয়া নদবি রহ. বলতেন যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে মাদ্রাসার উদ্দেশ্য কী, তাহলে আমি এই আয়াতটা পড়ে শোনাবো

فلو لانفر من كل
.........এটাই শিক্ষার্থীদের বিপ্লব।

এখন কেউ যদি বলে পড়াশোনার সাথে সাথেই আমি বাহিরের আন্দোলনটাও করব। তো এ ক্ষেত্রে আমাদের আকাবিরদের নির্দেশনা অনুযায়ীই চলতে হবে। বাইরে যে আন্দোলন চলছে, বিভিন্ন আইন-কানুনের প্রেক্ষাপটে। এতে অংশগ্রহণ করতে গেলে যে মূল কাজ; পড়াশোনা বা মাদ্রাসা শিক্ষার মূল মাকসাদ; তাফাক্কুহ ফিদ্দীন-অর্জনে ব্যাঘাত ঘটবে। বলা যায় ভিত্তিমূল নষ্ট হয়ে যাবে। (তাহলে বিপ্লব করতে গিয়ে পথভ্রষ্টতার শিকার হতে হবে) তাই আকাবিররা বলেন যে, এটা তোমরা করতে পারো, তবে পড়াশোনার পরে- এখান থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে।

-(হুসাইন আলহুদা): দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে আরেকটু ব্যাখ্যা কামনা করছি, যে, দারুল উলূম কি আজাদি আন্দলনের সৈনিক তৈরি করার জন্য প্রতিষ্ঠা করাহয়েছে? নাকি তালিম-তারবিয়্যাতের জন্য। মূল বিষয়টি কী? যথা আজকাল দারুল উলূমের বর্তমান পরিচালকদের উপর এই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে যে., এরা দারুল উলূমের মূল মাকসাদ ভুলে গেছে?

মুফতী উসমান গনী সাহেব: না, মূল মাকসাদ ছিল, দ্বিনের তারবিয়াত দেওয়া। এতে তালীম -ই (দ্বীনি শিক্ষাই) মুখ্য বিষয়। কারণ মাওলানা কাসিম নানোতবি রহ. যখন দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার আগে শামিলির জিহাদ হয়েছিল। তাতে যখন পরাজয় হলো, তখনই তার মাথায় এল যে, ভাই তরবারী-তলোয়ারের যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, করতে গেলে আমরা হেরে যাব। এর থেকে উত্তম পদ্ধতি হলো, মানুষকে ইসলামের তারবিয়াত (দীক্ষা ও প্রজ্ঞা) দিয়ে দেওয়া। তারবিয়াত যদি থাকে, তাহলে যত বড়ো শক্তি আসুক না কেন, দুশমন যেমনই হামলা করুক কেন, মানুষের ঈমানে পরিবর্তন আনতে পারবে না। আসল জিনিস তো হলো তারবিয়াত। রাজনৈতিক পর্যায়ে যে আন্দোলন বা সংগ্রামগুলো হচ্ছে, যদি তারবিয়াত না থাকে, এমন হবে যে, ফজরের নামাজ পড়ছে না, এদিকে (দিল্লির) শাহিনবাগে গিয়ে শুয়ে-পড়ে থাকবে! (মাদ্রাসার ছেলেদের উদ্দেশ্য করে) এখানে ফজরের নামাজের জন্য জাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু উঠতে চায় না, ওদিকে শাহিনবাগ গিয়ে আন্দলন করে লাভ কী? (অর্থাৎ যখন বিশুদ্ধ তারবিয়াত দিয়ে দেওয়া হবে, তখন যে কোনো অঙ্গনে গিয়ে সঠিক কাজ করতে পারবে। এই হলো দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠার মূল মাকসাদ। এর জন্য আগে ভালো করে পড়া-শোনা করতে হবে। তারপর দ্বীন-শরীআত বুঝে ফারিগ হওয়ার পর যে কোনো অঙ্গনে কাজ করো; নিজের ফায়দার জন্য, জাতির ফায়দার জন্য, এটাই কাম্য।)

তৃতীয় প্রশ্ন (জুবাইর আহমদ, ত্রিপুরা):
পরিস্থিতি খারাপ হলে শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈরাশ্যতা ছড়িয়ে পেড়ে। এমনটা হওয়াও স্বাভাবিক। তো পরিস্থিতি কখনো খারাপ হবে, কখনো ভালো থাকবে। আমাদের (শিক্ষার্থীদের) মনোভাব কেমন হওয়া দরকার?

মুফতী উসমান গনী সাহেব:
মাদ্রাসা খোলা থাকলে পড়াশোনা করেন, ছুটিতে দিল্লি/আগ্রা ঘুরে আসেন, তাহলে পড়াশোনা ভালো লাগবে। উদ্যামতা আসবে। দেশের পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য আগে নিজে তৈরি হতে হবে। এই মুহূর্তে যাদের কর্তব্য তারা কাজ করছেন। শিক্ষার্থীদের এখন কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা।

-জুবাইর: মাঝে মাঝে এমন চিন্তা আসে যে, পড়ে কি করব? পরিস্থিত দিন দিন খারাপই হচ্ছে?

মুফতী উসমান গনী সাহেব:
পড়াশোনা যখনই শেষ হোক, আমাদের সেটাই করতে হবে যেটা বলা হলো। কীভাবে সমস্ত মুসলমান বা সমস্ত মানুষকে সঠিক রাস্তায় আনা যায়; এই চেষ্টাই করতে হবে। রাজনৈতিক অবস্থা কোনো বড় বাধা নয়, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমন প্রাক্কালে রোম, ফারস্যের রাজত্ব ছিল; তারও আগে যে সমস্ত রাজা-বাদশারা রাজত্ব করেছে, তারা রাজ্যের প্রতিটি বিষয় নিজেদের আয়ত্বে রাখত। রাজনৈতিক অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো ব্যবসা করতে পারত না, কোনো বড়ো সংস্থাও করতে পারত না, রাজনৈতিক অনুমতি ছাড়া কোনো বড়ো কাজ করা যেত না, কিন্তু এখন সেটা নেই এখন পুরো পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন । ইসলামের সোলানি যুগে তো অবশ্য ছিল, বর্তমানেও মানুষের ব্যক্তি স্বাধিনতা রয়েছে। হ্যাঁ, রাজনীতি আমাদের জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর মানে এই নয় যে, যদি রাজনৈতিক অবস্থা ঠিক না থাকে, তাহলে লেখাপড়া করতে পারব না। বা মানুষকে ইসলামের দিকে আনতে পারব না। কোনো বড় বৈজ্ঞানিক হতে পারব না, বা কোনো ফ্যাক্টরি খুলতে পারব না, এমনটা তো নয়। সুতরাং নৈরাশ হওয়ার কিছু নেই।

পড়াশোনা যখনই শেষ হোক, আমাদের সেটাই করতে হবে যেটা বলা হলো। কীভাবে সমস্ত মুসলমান বা সমস্ত মানুষকে সঠিক রাস্তায় আনা যায়; এই চেষ্টাই করতে হবে। রাজনৈতিক অবস্থা কোনো বড় বাধা নয়, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমন প্রাক্কালে রোম, ফারস্যের রাজত্ব ছিল; তারও আগে যে সমস্ত রাজা-বাদশারা রাজত্ব করেছে, তারা রাজ্যের প্রতিটি বিষয় নিজেদের আয়ত্বে রাখত। রাজনৈতিক অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো ব্যবসা করতে পারত না, কোনো বড়ো সংস্থাও করতে পারত না, রাজনৈতিক অনুমতি ছাড়া কোনো বড়ো কাজ করা যেত না, কিন্তু এখন সেটা নেই এখন পুরো পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন । ইসলামের সোলানি যুগে তো অবশ্য ছিল, বর্তমানেও মানুষের ব্যক্তি স্বাধিনতা রয়েছে। হ্যাঁ, রাজনীতি আমাদের জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর মানে এই নয় যে, যদি রাজনৈতিক অবস্থা ঠিক না থাকে, তাহলে লেখাপড়া করতে পারব না। বা মানুষকে ইসলামের দিকে আনতে পারব না। কোনো বড় বৈজ্ঞানিক হতে পারব না, বা কোনো ফ্যাক্টরি খুলতে পারব না, এমনটা তো নয়। সুতরাং নৈরাশ হওয়ার কিছু নেই।

চতুর্থ প্রশ্ন (মাহদুল হাসান, হুগলি):
মাতৃভাষার দুর্বলতার কারণে সুদূর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকলেও অনেকে হীনমান্যতায় ভুগি যে, কাজ কীভাবে শুরু করব।তো এর জন্য স্থায়ী সমাধান কী হওয়া দরকার, ব্যবস্থা কী হতে পারে? সিলেবাসের কাঠামো কী হতে পারে?

মুফতী উসমান গনী সাহেব:
এ ক্ষেত্রে আমাদের বিদ্যমান মুরুব্বিদের বোঝানো যাবে না। বিশেষ করে আমাদের আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার পুরাতন আলেমদের কথা বলছি । তাদেরকে বোঝানো খুব মুশকিল। তাদের কথা বাদ দিয়ে যারা এখন ফারেগ হচ্ছেন বা পড়াশোনা করছেন, কমসেকম তারা যেন মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতন হোন। মাতৃভাষাটা হচ্ছে মানুষের প্রথম মাধ্যম। সেটা বাদ দিয়ে অন্য ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলে মাধ্যমটাও বুঝে আসবে না; যেটি অর্জন করতে চাচ্ছে, সেটাও বুঝে আসবে না। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, পশ্চিমবাংলার সবচে বড়ো মুহতামিম; আধুনিক বিজ্ঞানী গোলাম মোর্তজা সাহেব, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দাওরা হাদীস মাদ্রাসা তিনিই শুরু করেছিলেন। তার খেদমত অনেক বিস্তৃত। পুরো পশ্চিমবাংলায় যত আলেম-ওলামা আছেন; আমার তো মনে হয় বিদআতকে খতম করার দিক দিয়ে বলেন, দ্বীনি শিক্ষার দিক দিয়ে বলেন, দুনিয়াবি শিক্ষার দিক দিয়েও তার যেমন দক্ষতা আছে, তেমনি বিরাট অবদানও আছে। তার মাধ্যমে মেহনত শুরু করার চেষ্টা করেছিলাম, আমরা ৪-৫জন তার কাছে গিয়েছিলাম ৬ বছর আগে। যেহেতু আমরা জানি যে, উনার ব্রেন খুব উন্মুক্ত, খুব ভালো সাইন্টিফিক, তিনি নিজেও বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে বলেন: ভাই মুফতি হতে গেলে তাকে বৈজ্ঞানিক হতে হবে। এ ছাড়া বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান ছাড়া মুফতী হলে চলবে না, এমন কথা আমাদের এখানে দারুল ইফতা (দারুল উলূম দেওবন্দ) গ্রহণ করবে না। যাইহোক, (মাতৃভাষার বিষয়টি নিয়ে, তার কাছে যাওয়া হয়েছিল যে, হজরত, কমসেকম আপনার মাদ্রাসায় এটা শুরু করেন। আরবি আউয়াল থেকে আরবি সুয়াম; এই তিনটি বছরের সমস্ত কিতাব না হলেও, শুধু আরবি নাহু-সরফের কিতাবগুলো বাংলায় পড়ানোর ব্যবস্থা করুন। কারণ সাধারণত এগুলোই পুরো সিলেবাসের ভিত্তি হয়ে থাকে। বাকি কিতাবগুলো যেভাবে উর্দুতে পড়াচ্ছেন, পড়ান, সমস্যা নাই। শুধু এই তিনটি ঘন্টা বাংলা মিডিয়ামে করে দেন। প্রায় এক ঘন্টা ধরে আলোচনা হলো। তাঁর বুঝে এলো। তারপর তিনি বললেন যে, "বাবু আমি তো পড়াই না। আমি তো মুহতামিম। পড়াবে তো শিক্ষকরা। শিক্ষকদের ডেকে আনা হোক। তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিন। এ বলে তিনি শিক্ষকদের ডাকলেন।

মাদরাসার বর্তমান যিনি প্রধান শিক্ষক-নাজেমে তা'লীমাত ও শাইখুল হাদীস-বুখারী পড়ান; তিনি আমার ছাত্র। দারুল উলূম থেকে পড়ে গেছে। তো শিক্ষকদের মধ্যে তিনজন শিক্ষক ছিলেন, তারা সরাসরি বলে দিলেন যে, না, বাংলায় পড়ানো সম্ভব নয়। কেন?

-আমাদের ছাত্ররা আকাবিরদেরকে বুঝতে পারবে না। আর বাংলায় পড়ানো হলে ছেলেরা তো বেকার হয়ে যাবে। কেউ দেওবন্দে ভর্তি হতে পারবে না।

আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরে অনেক বুঝানো হলো যে, উর্দু যদি আকাবিরদের ভাষা হয়; বরকতি ভাষা হয়, এবং আপনারাও উর্দুকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছেন, তো ওটাকে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবেই গ্রহণ করুন; যদি আপনাদের এতই প্রিয় লাগে।

আমাদের শিক্ষকরা যে উর্দুভাষায় হাদীস পড়ান, সে উর্দু ভাষা থেকে কোন্ উর্দুভাষা শিখবে ছেলেরা? শিক্ষকদের উর্দু শোনলে মানুষ হাসবে। যদি আপনার উর্দু এতই প্রিয় হয় তাহলে তার জন্য আলাদা ঘণ্টা রাখেন, তাদের উর্দু সাহিত্য পড়ান, ভালো উর্দু শেখান, হাতের লেখা আর শুধু কায়দা শেখার মাধ্যমে সমস্ত কিতাব পড়িয়ে দিলে কি উর্দু শেখা হয়ে যাবে?

অনেক কথা হওয়ার পর তারা বলল যে, আপনার কথা তো বুঝে এসেছে। কিন্তু এখানে বাংলাতে কেউ পড়াবে না। হয়তো সমস্ত উস্তাদদের বাদ দিতে হবে এবং নতুন উস্তাদ আনতে দিতে হবে...।

তখন গোলাম মোর্তজা সাহেব সেখানেই আমাদের হাত ধরে ফেললেন যে, ভাই আমি তো পড়াতে পারব না। এরাই পড়াবে। আর এরা তৈরি না হলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়। এভাবে আরও কয়েকটা মাদ্রাসায় যাওয়া হলো, তো সব জায়গাতেই একই অবস্থা। একই তাজরবা দেখিয়ে কেউ কবুল করেনি। এই ছুটিতে দুমাস আগেই পড়াতে গিয়েছিলাম কনকপুর-এ । আমাদের পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড়ো মাদ্রাসা। যেখানে আমিও পড়িয়েছি ৫ বছর। আমি যে সিলেবাস তৈরি করেছি ওইটা পেশ করলাম। "বাংলা মিডিয়াম"-কথাটা শুনতেই সাথে সাথে নাচক করে দেন।

আখের কথা হলো, কেউ যদি নিজে হিম্মত করতে পারেন, যেমন (মুনীরুল হককে উদ্দেশ্য করে) আপনাদের বেলাল সাহেব (করিমগঞ্জ, আসাম) তৈরি করেছেন,এমন যদি কেউ তৈরি করতে পারে, তাহলেই কিছু হতে পারে। আপনারা এখন থেকেই মানসিকতা তৈরি করুন।

-(মাহমুদ): এই জায়গায় পথের কাঁটা হয়ে যেটা দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে দারুল উলূমের দাখিলা। বলা হয় যে, সিলেবাস বাংলা হলে দেওবন্দে দাখিলা হবে না।

(মুফতী উসমান গনী সাহেব:)

এই কথাগুলোর উপরে আলোচনা হয়েছে আমাদের শালুকপাড়া মাদ্রাসায়, আমাদের হাওড়া জেলাতেই। মাকতাবাতুল মাআরিফ- সেখানেও গিয়েছিলাম একদিনের জন্য এই আলোচনা নিয়েই। সেখানের উস্তাদরা একই কথা বললেন যে, ভাই এই নেসাব পড়ালে (বাংলা মিডিয়ামে) বা এই ধরণের কিতাব পড়ালে অর্থাৎ আমি চেয়েছিলাম যে দাওরা হাদিসে সব কিতাব পড়াবার কি দরকার, দেখা যাচ্ছে, হাদীসের দশটা কিতাব পড়ছে, অথচ একটাও পড়া হচ্ছে না। প্রত্যেকের কাছে আপনি যাবেন, দরসে হোক কিংবা ক্লাসে, বুখারী শরীফের ৫ টা শরাহ আর দুটো নোট; সব পাবেন কিন্তু বুখারী শরীফ খুঁজে পাবেন না। তিরমিজি শরীফের পাঁচটা নোট, পাঁচটা শরাহ; সব পাবেন, কিন্তু তিরমিজি শরিফ খুঁজে পাবেন না। ক্লাসেই হাজির হচ্ছে না। তো এরকম দশটা কিতাব পড়ার দরকার কি? রবং হাদীস হিসেবে কিতাব পড়ান । যে কিতাবের যে অধ্যায় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সে কিতাবের সে অধ্যায় পড়ান, বাকি কিতাবগুলোতে তা পড়াবার প্রয়োজন নেই। এতে ছেলেদের নাশাত বা উদ্যমতাও আসবে, পড়ার আগ্রহ পাওয়া যাবে। তারা এটাই বললয়ে, এই নেসাব পড়ে ছাত্ররা দারুল উলূমে ভর্তি হতে পারবে না। তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই বছর আপনাদের কয়টি ছেলে দারুল উলূম গিয়েছে ?

সবাই একে অপরের দিকে মুখ দেখাদেখি করে বললেন, একজনও যায়নি।

- গতবছর কয়জন গেছে? একজনও যায়নি। মাদ্রাসার ইতিহাস কয়জন গেছে?

তারা বললেন মাদরাসার ৪০ বছরের ইতিহাসে একজনও যায়নি।

কিন্তু তাদের সামনে নতুন কিছু রাখলে, তারা ওই কথাটাই বলবে যে, আমরা দারুল উলূমে ভর্তি হতে পারব না; তাই নেসাব পরিবর্তন করা যাবে না।

নবগ্রাম একটি মাদ্রাসা আছে। যেখানে শান্তিনিকেতন আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সেখানের বিশ্বভারতী-এর পাশেই অনেক পুরাতন একটা বড়ো মাদ্রাসা আছে; নবগ্রাম। সেখানে এক সময়ে বড়ো বড়ো আলেম তৈরি হয়েছে। আজমগড়ের মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব, আমার ভাইয়েরা, চাচারা- সবাই এখানে পড়েছে। সেখানে গেলাম। দাওরা হাদীস পর্যন্ত আছে। দাওরা হাদীসে ১৮ জন ছাত্র; তাদেরকে সামনে ডেকে বসালাম। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এমন করে থাকে যে, দারুল উলূম- এর কোনো উস্তাদ গেলে তাঁকে বলা হয় যে, একটু নসীহত করুন। তো আমাকেও বলল। আমিও বললাম, চলুন, নসীহত করব । বৈঠকে সামনে তিনটি টেবিল রেখেছিল। আমি বললাম, এগুলোর পেছনে আরও তিনটি রাখুন। এরপর বললাম, ভাই যারা দাওরা পড়েন তারা দাঁড়িয়ে যান। ১৮ জন ছেলে দাওরা পড়ে, তারা দাঁড়াল। তাদেরকে সামনে বসালাম। একটা কুরআন শরিফ তাদের সামনে রাখলাম। প্রত্যেককে একটু একটু করে কুরআন পড়তে বললাম। ১৮ জনের মধ্যে মাত্র তিনজনের পড়া শুদ্ধ আছে। ওদেরকেও জিজ্ঞেসা করো, বলবে আমরা উর্দু মিডিয়ামে পড়ব; কিছু বুঝি আর না বুঝি।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? ফারেগ হয়ে কি করবে?

বলল, মাদ্রাসায় পড়াব। ঠিক আছে তোমরা মাওলানা সাহেব, অবশ্যই মাদ্রাসায় পড়াবে। আগে তো 'সাহেবকে' পরিণত হতে হবে ভালো করে? কুরআন শরীফের নাজারা-পড়াই শুদ্ধ নেই, কি পড়াবে?

সুতরাং প্রবীনদের কাছে পরিবর্তন আশা করা যায় না। তোমরা নিজেরা অঙ্গিকার করতে পারো; একটা ভালো মাদ্রাসা গড়ার।

পঞ্চম প্রশ্ন (যায়েদ হুসাইন):

হুজুরের ব্যক্তিগত বিষয়ে। আমাদের সামনে হুজুর একটি আদর্শ। দারুল উলূমে হুজুরকে দেখে আমরা উজ্জিবিত হই। তো হুজুরের পড়ালেখার মূল চেতনা কী ছিল। অর্থাৎ কী হতে চেয়েছিলেন।

মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা.।

মূল চেতনায় আমারও এমনই অবস্থা ছিল, যেরকম মাদ্রাসাগুলোর এখনকার অবস্থা। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগেও খুব বেশি ফারাক ছিল না। তবে তখন মানুষের আর্থিক অবস্থা দুর্বল ছিল। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভাবনা এতটুকুই ছিল, আমি মাদ্রাসায় পড়ছি, মাদ্রাসায় পড়াব ।

কিন্তু আমার পড়ার চেয়েও সফর বেশি হয়েছে, সফরে গিয়ে মানুষের সাথে; বিশেষ করে স্কুল-কলেজে পড়ুয়াদের সঙ্গে মেশার পর, মূলত তাবলিগ জামাতের সাথে কাজ করার পর নিজের চেতনা জেগেছে যে, মাদ্রাসায় কেবল এক পার্সেন্ট মানুষ পড়াশুনা করে। আরও যে ৯৯ শতাংশ মানুষ আছে, তাদেরকে কীভাবে ইলম শেখানো যায়? মাদ্রাসা ছাড়াও কিন্তু এর জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে। গত কয়েক বছর আগে আমি নিজ এলাকাতে একটা সিস্টেম চালু করেছি। দ্বীনিয়াত মকতব। মুম্বাইয়ের একটি সংস্থা। তাদরে মিশন শুধু বাচ্চাদের জন্য নয়, বড়ো এবং বয়স্কদের জন্যও মকতব কায়েম করা

তারপরে দারুল উলূমে আসার পর যার সুহবত থেকে বেশি উপকৃত হয়েছি, তিনি হচ্ছেন মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আজমি সাহেব। যদিও-বা ক্লাস শুরু হয়েছে হাপ্তম থেকে। এর আগে থেকেই তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতাম, ক্লাসে সামনে বসতাম। তাঁর কথাগুলো বেশি লক্ষ করতাম।

মহিলাদের জন্যও আলাদা মক্তব কায়েম করা। আবার মহিলাদের মধ্যে ছোটো মেয়েদের আলাদা সিলেবাস, বড় মেয়েদের আলাদা সিলেবাস তৈরি করেছে তারা।

-(যায়েদ) এই সিস্টেমটাকে আমরাও আমাদের এলাকাতে (ঢাকাতে) চালু করতে পারব?

-মুফতী উসমান গনী সাহেবঃ
হ্যাঁ, প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাসটা আপনাদের দেশে চালু আছে মনে হয়। মুম্বাইতে যে সেন্ট্রার আছে ওখানে "এদারায়ে দ্বীনিয়াত" নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সপ্তাহ-দশ দিনের একটা ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই ট্রেনিংয়ে সিলেবাসটা কিভাবে পড়াবে, তার মার্কেটিং কিভাবে করবে, মানুষকে তার স্কিল কিভাবে করবে, কিভাবে ক্লাস বানাবে, সবগুলোর সামষ্টিক ধারণা দেওয়া হয়। আমাদের আন্ডারে হাওড়া জেলাতে চালু হয়েছে। আমার ভাই মুফতি এহসানুল হাসান সাহেব সেটির জিম্মাদার। দারুল উলূম থেকে ইফতা পড়ে গেছেন। এক ঘণ্টা করে সাধারণ মানুষদেরকে পড়ানো হয়, কারণ ৯০% বাচ্চা মাদ্রাসায় আসেনা, স্কুলে পড়ে। যারা একেবারেই পড়াশোনা করে না, তাদের জন্যও একটা সিলেবাস শুরু করা হয়েছে এক ঘন্টার মতো ।

স্কুলের ছেলেদের জন্য খুব সুন্দর সামঞ্জস্যতা রেখে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে, যে ছেলে ক্লাস ওয়ানে পড়ে, মক্তবেও তার জন্য ক্লাস ওয়ানের সিলেবাস আছে। যদি সামনের বছর সে ক্লাস টুতে যায়, তাহলে মক্তবেও ক্লাস টু-এর সিলেবাস ক্লাস ওয়ান থেকে একটু উন্নত মানের করে তৈরি করা হয়েছে। এভাবে ১৫ বছরের সিলেবাস রয়েছে, যেমন হিদায়া কিতাবকে চার ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং সহজ আকারে করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক প্রত্যেকের মাতৃভাষায় রচনা করা হয়েছে। উর্দুভাষীদের জন্য উর্দুভাষায় সিলেবাস রয়েছে, তেমনি হিন্দিতেও সিলেবাস রয়েছে, অর্থাৎ তরজমা আছে। এখন বিভিন্ন দেশেও চালু হয়েছে, সাথে সাথে প্রত্যেকের বয়সের অনুপাতও ঠিক রাখা হয়েছে। মহিলাদের অনেক মাসআলা-মাসায়েল আলাদা হয়, তাদের জন্য আলাদা সিলেবাস রয়েছে। এই সিলেবাসের জন্য প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে বের করা বেশি কষ্ট নয়, স্কুল-কলেজে পড়তে পড়তে একটা ছোটখাটো আলেম হয়ে যাওয়ার কোর্স। স্কুল-কলেজের যারা পড়ে না, তারাও কোর্স করত পারবে!

৬ষ্ঠ প্রশ্ন (মাসনূনুল হক, আসাম) : হযরতের প্রিয় ওস্তাদ কে?

উসমান গনী সাহেব দা বা.:
আমি পাঁচ বছর বাড়ির কাছের মাদ্রাসায় পড়েছি, সেখানে একজন উস্তাদ ছিলেন মাওলানা আমানুল্লাহ সাহেব। এখনো জীবিত আছেন, এবং খুব সুস্থ আছেন। তিনি খুব বেশি ভালো বক্তা নন, কোনো জায়গার দাওয়াতে খুব বেশি যান না, কিন্তু সব ক্লাসে খুবই উন্নতমানের পড়ান। যেকোনো পড়া কঠিন থেকে কঠিন মাসআলা খুব সহজভাবে ছাত্রদেরকে বোঝাতে পারেন। তার কাছে আমি তারজমাতুল কুরআন পড়েছি, ক্লাসের বাইরে তাঁর কাছে আরবি তামরীন করতাম । তারপরে দারুল উলূমে আসার পর যার সুহবত থেকে বেশি উপকৃত হয়েছি, তিনি হচ্ছেন মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আজমি সাহেব। যদিও-বা ক্লাস শুরু হয়েছে হাপ্তম থেকে। এর আগ থেকেই তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতাম, ক্লাসে সামনে বসতাম। তাঁর কথাগুলো বেশি লক্ষ করতাম। তারঁ কাছে পড়েছি আবু দাউদ শরীফ ও মুসলিম শরীফ। আমার চেয়ে ভালো ছেলেরা বলত, আমাদের বুঝে আসে না। কিন্তু আমার অনেকটাই বুঝে আসত।

-(জুবাইর), হযরত পড়ালেখা শেষ করে সর্বপ্রথম কোথায় ছিলেন, দারুল উলূমে কিভাবে আসা?

-(মুফতী উসমান গনী সাহেবঃ)
সর্বপ্রথম তো আমি পড়িয়েছিলাম পাঁচমুড়া কনকপুর মাদ্রাসায়। যেখানকার কথা বললাম। আমার বাড়ি থেকে কাছে। একেবারে হাওড়া জেলায়, হাওড়া থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার পথে একটি স্টেশনের নাম এটি । গ্রামের নাম কনকপুর। মাদ্রাসার নাম মাদ্রাসা মাজাহিরে উলূম। ওখানে পড়িয়েছি প্রায় পাঁচ বছর। এর পরে হযরত আরশাদ মাদানি সাহেব, মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আমাকে পাঠিয়েছিলেন কেরালা। কেরালা জামিয়া নাজমুল হুদায় । মুসলিম সংখ্যাদিক্যের দিক থেকে ভারতে দুটি জেলাই সবার চেয়ে এগিয়ে, একটা হলো আমাদের বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলা, আরেকটা হলো কেরালা মালাপ্পুরাম জেলা। প্রায় ৯৯% সেখানের বড়ো মাদ্রাসা হলো জামেয়া নাজমুল হুদা। মাদ্রাসায় দাওরা হাদিস খোলা হচ্ছে, তাই মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরি সাহেবের কাছে তারা উস্তাদ চেয়েছিলেন বুখারী শরীফ পড়ার জন্য। আমার সঙ্গে হযরতের যোগাযোগ হলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। সেখানে ছিলাম চার বছর। তারপরে ২০০১ সালে দারুল উলূমে আসা।

৭ম প্রশ্ন (মনিরুল হক) : হজরত তো "উলফত সাহিত্যাসর"-এর অভিভাবক, উলফতের ৪ মাসের কাজ হজরতে সামনে রয়েছে। উলফতের কাজ কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়?

মুফতী উসমান গনী সাহেবঃ এটা বরাবর রাখার জন্য কিছু ছাত্র এরকম থাকা দরকার; [হুসাইন আলহুদার দিকে ইশারা করে] আপনি যেমন সক্রিও, এরকম একজন-দুজন প্রতিবছর সক্রিও থাকলে, তবেই চলবে। সেরকম কোনো ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

-(জুবায়ের) সেজন্য আমরা আগামী বছরের হিফাজতি কমিটি গঠন করতে পারি।

-মুফতী উসমান গনী সাহেবঃ
সমস্যা হচ্ছে, দারুল উলূম-এর পক্ষ থেকে তো কোনো নতুন সংগঠন নিবন্ধন করা নিষিদ্ধ। সংগঠন হিসেবে না করে ভাষা শিক্ষার কোর্স হিসেবে চালিয়ে গেলেই ভালো হবে। আমরা বাঙালি, বাংলা ভাষা শিখব। বাংলা ভাষায় আমাদের ইলমগুলো মানুষদের বুঝাতে হবে। তাই বাংলা শিখব। ব্যস, এখানে কেউ বাধা দেবে না। একটা ক্লাস হিসেবে যেরকম চলছে, দারুত তাফসীরের দরসগায় কাজ করে যেতে হবে। সংগঠন বা তার নাজেম-সদর ইত্যাদিতে ঝামেলা হয়, ফিতনা হয়।

উলফতঃ হজরতের শোকরিয়া। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। জাযাকাল্লাহ।

মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা.: আপনাদেরও আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

VICTORIES! THE ONE THEY CALL THE 'MAG...
CORONAVIRUS, AND HIS FAITHFUL BACILLUS!
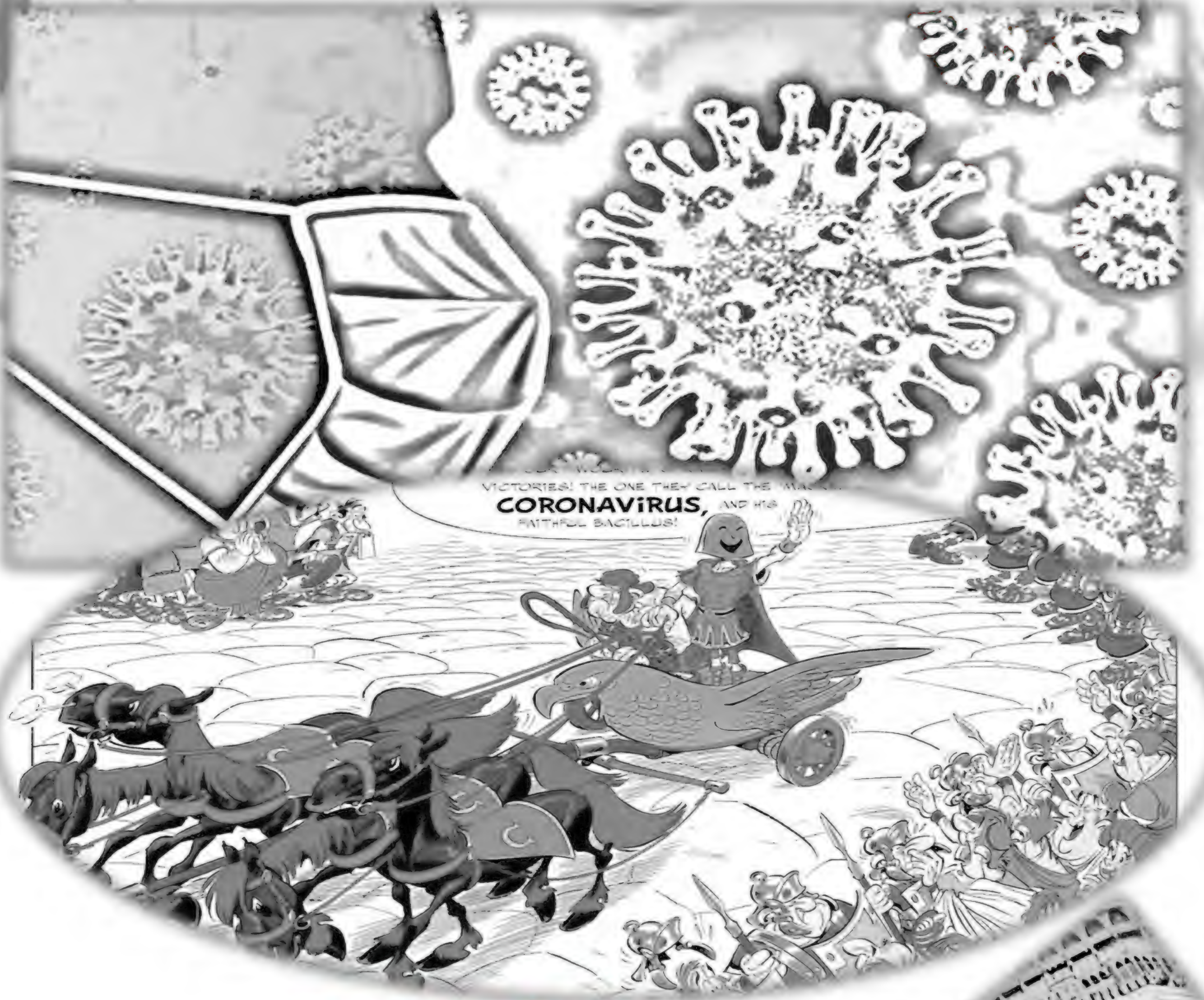
করোনা ভাইরাস: একটু ভেতর থেকে দৃষ্টিপাত

-ইবনু লুৎফ

সম্পাদনা, অঙ্গসজ্জা ও অক্ষর বিন্যাস:
হুসাইন আলহুদা

করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যে পৃথিবীকে থমকে দিয়েছে। আতঙ্কের সর্বোচ্চ নজির স্থাপন করে নিয়েছে মনে হচ্ছে। একজন মুমিনকে এই ধরণের মহামারি সম্পর্কে যেমন আল্লাহর উপর আস্থা-বিশ্বাসের সাথে তার আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আহাজারি এবং সব ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। তেমনি মুমিন হিসেবে অন্তর্দৃষ্টি খোলা রেখে বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করাও তার কর্তব্যে পড়ে। তাই উলফতের এই আয়োজন। দুই ধরণের লিখনীই আমরা ছাপছি।

১. বৈশ্বিক মহামারি ও একজন মুমিনের কর্তব্য।
২. করোনা ভাইরাস: একটু ভেতর থেকে দৃষ্টিপাত।

-সম্পাদক

রহস্য বচনা
- করোনা ভাইরাস: একটু ভেতর থেকে দৃষ্টিপাত

মিডিয়া পর্যালোচনা
- করোনা ভাইরাস: মিডিয়া পর্যালোচনা

দিকনির্দেশনা
- বৈশ্বিক মহামারি: একজন মুমিনের করণীয়

করোনা ভাইরাস, বর্তমান বিশ্বের একটি আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এক মহাপ্রলয়ের নাম! যা ইতিমধ্যেই বৈশ্বিক মহামারিতে রূপ নিয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে এ নিয়ে অনেক ভেতর-বাহিরের তথ্য ও তত্ত্ব এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অনেক খটকাও সামনে আসছে ।

করোনা ভাইরাস হোক বা যেকোনো রোগব্যাধি,এ সম্পর্কে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস একদমই স্পষ্ট, ভালো হোক, মন্দ হোক, সবকিছু আল্লাহর হুকুমেই হয়। আর যে কোনো মুসিবত থেকে তিনিই উদ্ধার করেন। জীবন-মরণ আর লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র তিনিই। আরোগ্য তাঁরই হাতে। আফিয়াত-সালামত এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মালিকও একমাত্র তিনিই।

এ মর্মে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- অর্থ : "পৃথিবীতে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় নেমে আসে, আমি তা সংঘটিত করার আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য বেশি উৎফুল্লও না হও। আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না।" (সুরা হাদীদ : আয়াত ২২-২৩)

কিন্তু এর বিপরীতে এমন কিছু তথ্য সামনে আসছে, যা দেখে মনে হচ্ছে এই বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস হয়তো কোনো ষড়যন্ত্রের ফসল! তার মানে, হয়তো কোনো গোপন গোষ্টি নিজের ফায়দা লুটতে এই ভাইরাসটা আবিষ্কার করেছে, আর ছড়িয়ে দিয়েছে...!

তবে হ্যাঁ, এতে করে আমাদের আকিদা-বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র শঙ্কাও সৃষ্টি হবে না! কারণ, এটি একটি প্ল্যান যা হয়তো করা হয়েছিল আজ থেকে ৫০ বছর আগে, আর আজ এসে তা বাস্তবায়ন করা হলো মাত্র!

এটা সহজে এভাবে বুঝে নিতে পারেন যে, আপনি একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন ১০বছর পর, কিন্তু আপনি ১০ বছর আগেই কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে সেই বাড়ির একটি প্লান বা নকশা করে নিলেন। আচ্ছা এখন দেখুন আপনার কাছে ১০ বছর পরের বাড়ির একটা নকশা আছে, তাহলে কি আপনি আপনার বাড়ি সম্পর্কে ভবিষ্যত জাননেওয়ালা হয়ে গেলেন!? নিশ্চয়ই না! কেননা এটা তো ভবিষ্যৎ নয়, এটা আপনার একটা প্ল্যান, যেটা আপনি ১০বছর আগেই করে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে এসে বাস্তবায়িত হয় মাত্র!

তবে হ্যাঁ, এখানে একজন মুসলমান হিসে বে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস হলো, মহান রাব্বুল আলামীন যদি চান, তাহলে আপনার ওই বাড়িটি আপনি ১০ বছর পর নির্মাণ করতে পারবেন, আর যদি তিনি না চান তাহলে আপনি তা নির্মাণ করতে পারবেন না! এখানে এসেই একজন মুমিন আর একজন কাফিরের আকিদা-বিশ্বাসের ফারাক্ব। আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে, হয়তো কারো প্ল্যান বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিচে তেমন কিছু রহস্যমাখা রিপোর্ট তোলে ধরা হলো।
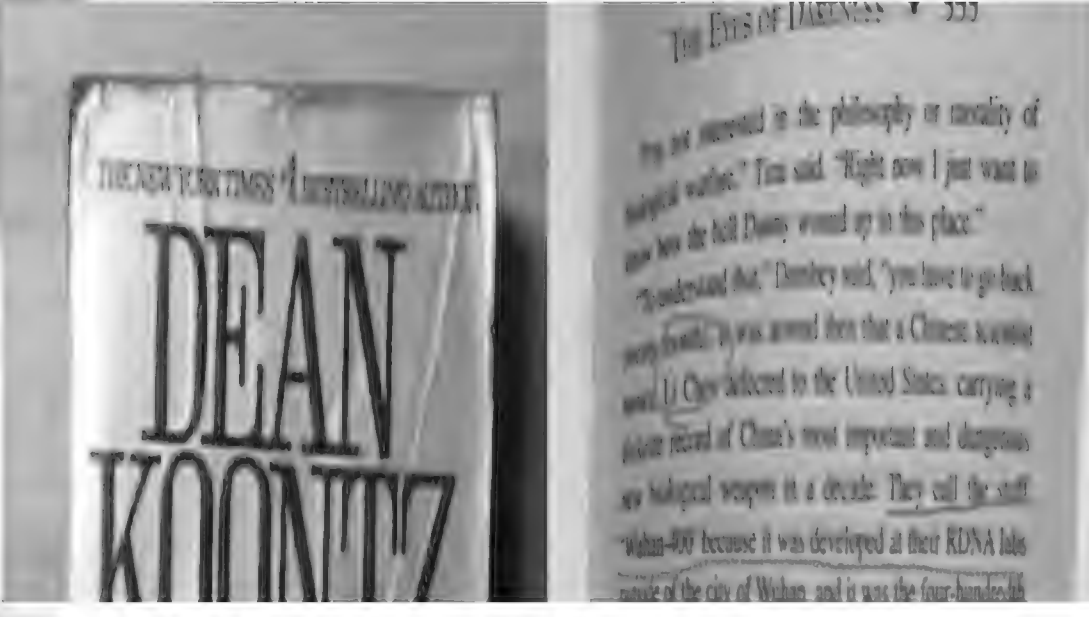
(০১)

হয়তো ১৯৮১ তে প্ল্যান আর ২০২০-এ বাস্তবায়ন।

আজ থেকে ৪০ বছর আগে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হওয়া একটি বইয়ে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। 'দ্য আইজ অফ ডার্কনেস' নামে ওই বইটির লেখক "ডিন কুন্তজ"। তিনি লিখেছিলেন, চিনের উহান শহর থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে ভাইরাস। ঘটনাচক্রে ঠিক সেটাই হয়েছে। ফলে অনেকেই এটা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছেন, লেখক কীভাবে কয়েক দশক আগেই এই ভাইরাসের কথা জেনে গিয়েছিলেন!

মূল বইয়ের কিছু অংশ- "The Chinese could use Wuhan-400 to wipe out a city and a country, and then there wouldn't be any need for them to conduct a tricky and an expensive decontamination before they moved in and took over the conquered territory......"

মূল বইয়ের আলোচনা একটু লম্বা, প্রায় দুই-আড়াই পৃষ্ঠা! তবে তা সংক্ষেপে বললে এমন-

"Wuhan-400 নামে একটি ভাইরাস চীনের উহান নামক শহরের পার্শে RDNA নামের একটি গবেষণা ল্যাবরেটরি থেকে তৈরি করা হবে। আর এই ভাইরাসটার 400 এর মতো স্টাইং থাকবে। যার ফলে এটার ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হবে না। Wuhan-400 একটি পার্ফেক্ট জীবাণু অস্ত্র হবে। যেটা শুধু মানুষকেই আক্রমণ করবে, অন্য কোনো সৃষ্টিজীব এটাকে ক্যারি করতে পারবে না, আর Wuhan-400 ভাইরাস Syphilis রোগের মতো অন্য লিভিং বডিতে বসবাস করতে পারবে না। আর এটা তারা (চায়নারা) চাইলেই ছড়িয়ে দিতে পারবে। যদি কেউ এই Wuhan-400 ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, তো বাঁচার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আর এটা এতো শক্তিশালী জীবাণু অস্ত্র হবে যে, কেউ এতে আক্রান্ত হওয়ার 8 ঘন্টার মধ্যে তার শরীরের অবস্থা পরিবর্তন হতে শুরু করবে.............!"

(০২)

"দ্য সিম্পসনস'-এ ২৭ বছর আগেই করোনা ভাইরাসের ইঙ্গিত!

আমেরিকার কার্টুন প্রোগ্রাম "দ্য সিম্পসনস'। এই কার্টুনের একটি ধারাবাহিকে ২৭ বছর আগে চায়নায় ছড়িয়ে পড়া করোনার লক্ষণের বিষয়গুলি সম্প্রচার করা হয়েছিল। যদিও এই ধারাবাহিকটিতে ভাইরাসের নাম "ওসাকা" বলে ব্যবহার করা হয়েছিল, যা বর্তমানে করোনা ভাইরাস নামে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে বিশ্বজুড়ে। কার্টুনটির এক ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছিল করোনা ভাইরাসের হুবহু লক্ষণগুলি। ১৯৯৩ সালে প্রচারিত "দ্য সিম্পসনসের" একটি এপিসোডে দেখা গেছে যে, আমেরিকার কল্পিত শহর "স্প্রিংফিল্ডে" একজন ব্যক্তি জাপান থেকে এসেছেন। তিনি শহরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছোঁয়াচে এই রোগে শহরজুড়ে একটি বিপজ্জনক ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এই পর্বটির নাম ছিল- "মার্গইন চেইন্স!"

শুধু তাই নয়, সিম্পসনে ২০০০ সালেও একটি পর্ব প্রচার করেছিল, যাতে দেখানো হয়েছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যা ট্রাম্প মার্কিন রাষ্ট্রপতি হওয়ার ১৭ বছর আগেই সম্প্রচার করা হয়েছিল।এছাড়াও আমার কাছে তাদের কম্পানি সম্পর্কে ৩০- এর উপর এমন তথ্য আছে যা আপনার মাথা ঘুরে দেবে! সময় হলে সেগুলো নিয়েও উলফতে লেখা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

(০৩)

"রেসিডেন্ট ইভিল" সিনেমায় ২০০২ সালেই করোনা ভাইরাসের আবাস!

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের দাপট যেন আজ থেকে ১৮ বছর আগের সেই "রেসিডেন্ট ইভিল" সিনেমার বাস্তব প্রতিফলন। ইউক্রেন বংশোদ্ভূত অভিনেত্রী "মিলা জভোভিচ" অভিনীত, "পল অ্যান্ডারসন" পরিচালিত হলিউডি সুপারহিট ছবিটির রয়েছে মোট ছয়টি সিরিজ। মুক্তি পেয়েছিল ২০০২ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দফায় দফায়।

জৈব রাসায়নিক অস্ত্র এবং জেনেটিক্যাল মিউটেশন কীভাবে মানব সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনবে তা দুর্দান্তভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে এই বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন এবং হরর থ্রিলার ছবিতে।

রেসিডেন্ট ইভিলে দেখানো হয়েছে, গোপন গবেষণাগারে তৈরি "টি ভাইরাস" ও ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন নিরীহ প্রাণী ও মানুষের উপর প্রয়োগ করে প্রথমে তাদের জিনগত অভিযোজন ঘটাচ্ছে। তারপর তাদের হিংস্র দানবে পরিণত করে সাম্রাজ্য বিস্তারের চক্রান্ত করছে একটি বেসরকারি সংস্থা।

কিন্তু দুর্ঘটনাবশত এই গবেষণা বুমেরাং হয়ে যায়।কোটি কোটি মানুষ "টি ভাইরাসে" আক্রান্ত হয়ে জম্বিতে পরিণত হয় এবং গবেষকদের দোষেই মানব সভ্যতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দুনিয়া থেকে।

ash in this
@ashakiiii

The Simpsons scares me. This episode aired 27 years ago in 1993 🐱 #CoronaVirus

২

CORONA VIRUS

3:26 PM · Jan 30, 2020 · Twitter for Android
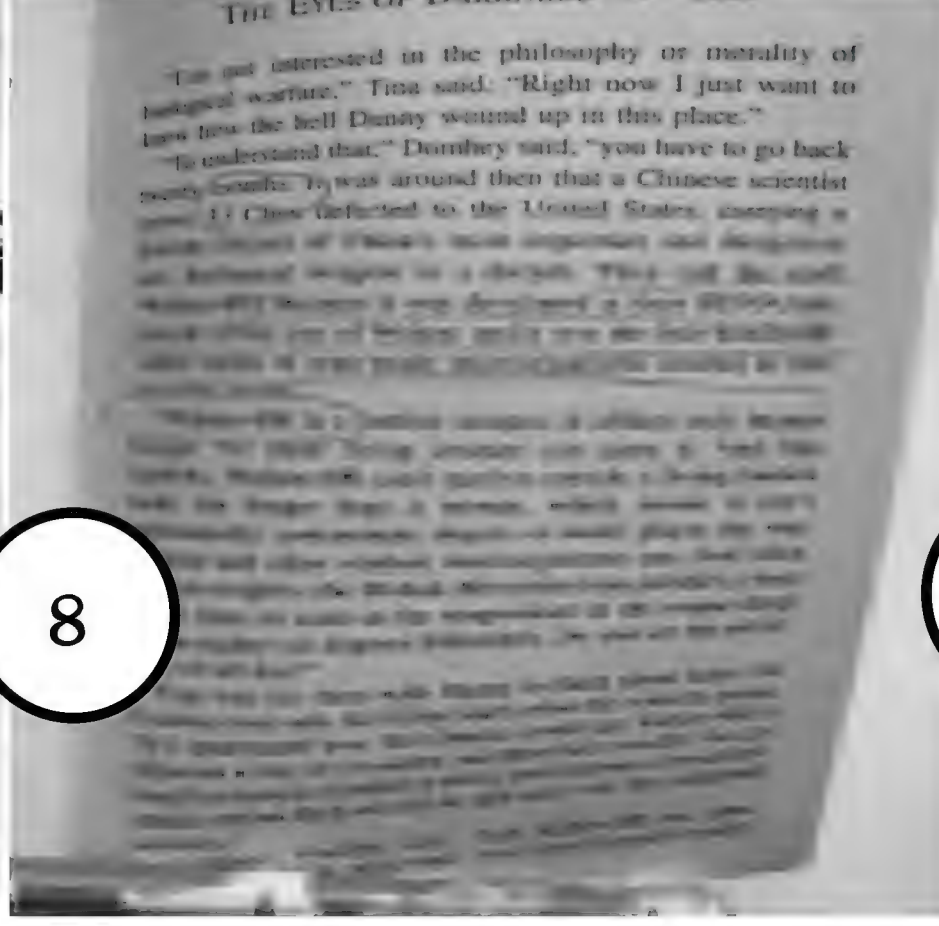
৩ ৪ ৫

(০৪)

হয়তো ১৩ বছর আগেই প্ল্যান আর ১৩ বছর পর তার বাস্তবায়ন!

বিশ্বজুড়ে মহামারি আকার নেবে করোনা ভাইরাস, ইঙ্গিত মিলেছিল অনেক আগেই! ২০০৮ সালে প্রকাশিত হওয়া আরও একটি বই "এন্ড অফ ডেজ"-এ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বজুড়ে মহামারির আকার ধারণ করবে "নোভেল করোনা ভাইরাস।" বইটির লেখিকা প্রয়াত "সিলভিয়া ব্রাউন"। সোশ্যাল মিডিয়ায় বইটির ছবি শেয়ার করেছেন "কিম কার্দাশিয়ান"ও। বইটিতে লেখা রয়েছে যে: ২০২০ সালে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে ভাইরাস।

বইটির বক্তব্য: "In around 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again ten years later, and then disappear completely." (Para from the book eyes of darkness page 210/312)

অর্থাৎ-"২০২০ সাল নাগাদ সিভিয়ার নিউমোনিয়ার মতো একটি রোগ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এই রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফুসফুস ও শ্বাসনালি। কোনও চলতি চিকিৎসায় এই রোগ সারবে না। এই রোগ যেমন দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে, তেমনই হঠাৎ দূর হয়ে যাবে। ১০ বছর পরে আবার ফিরে আসবে এই রোগ। তারপর এটি চিরতরে উধাও হয়ে যাবে।"

(উক্ত বইয়ের দুই প্রকাশনীর একটির ২১০ আর অন্যটির ৩১২নম্বর পৃষ্ঠায় দেখুন।)

(০৫)

"কন্টাজিওন" চলচ্চিত্রে ৯ বছর আগেই করোনা ভাইরাসের ইঙ্গিত!

চলচ্চিত্রটি ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে ইতালির ভেনিসে ৬৮ তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৯ই সেপ্টেম্বরে সর্বসাধারণের মাঝে মুক্তি পেয়েছিল।

গল্পের মূল প্লটটি "ফোমাইটস" নামক এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত রোগকে নির্দেশ করে বানানো হয়েছে, যা চিকিৎসা গবেষক এবং জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দ্বারা এই রোগ সনাক্তকরণ এবং এটি নির্মূল করার চেষ্টা, মহামারীতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা হ্রাস এবং অবশেষে এর বিস্তার আটকাতে একটি ভ্যাকসিনের আবিষ্কার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বেশ কয়েকটি ইন্টারেক্টিভ প্লট লাইন অনুসরণ করতে, ছবিটি বহু-ন্যারেটিভ "হাইপারলিঙ্ক সিনেমা" স্টাইল ব্যবহার করে, যা সোডারবার্গের বেশ কয়েকটি ছবিতেও জনপ্রিয়।

এই ছবিতে দেখানো হয় যে, একজন নারী হংকং থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় ফিরে আসার চতুর্থ দিনে মারা যান। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) এই মারা যাওয়ার লক্ষণ পর্যবেক্ষন করে। কোথেকে এই রোগের উৎপত্তি; তা খুঁজতে শুরু করে। রোগীর সংস্পর্শে আসা সকলের জন্য কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই রোগ ছড়িয়ে যায়, ঠেকানো অসম্ভব হয়ে যায়। অন্য দিকে চলতে থাকে ভ্যাকসিন তৈরির প্রচেষ্টা। অবশেষে একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কারও হয়, ধীরে ধীরে সবকিছু স্বাভাবিক হতে শুরু করে, মানুষ আবার সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

(০৬)

২০১৭ সালে চীনে নয় রোমে তৈরি করোনা ভাইরাস!

আজ থেকে ৩ বছর আগে ২০১৭ সালে প্রকাশিত অ্যাস্টারিক্স সিরিজের ৩৭ তম বই "অ্যাস্টারিক্স অ্যান্ড দ্য চ্যারিয়ট রেস"-এ রয়েছে এই করোনা ভাইরাসের উল্লেখ। ওই বইয়ের কভারের ছবিটিতে দেখা যায় রথ চালকের মাথার উপর তার নাম লেখা "করোনা ভাইরাস।"

ওই বইতে জুলিয়াস সিজারের আমলে অনুষ্ঠিত এক রথ চালানোর প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে। ওই বইয়ের গল্প অনুসারে, জনৈক রোমান সেনেটর কর্তৃক আয়োজন করা হয় এক রথ চালনা প্রতিযোগিতার। ওই রোমান প্রতিযোগীর নামই এখানে "করোনা ভাইরাস।"

৬

(০৭)
২০১৮ সালেই The Economist Magazine-এর ৩৩ তম সংস্করণে করোনা ভাইরাসের ইঙ্গিত!

“The Economist Magazine” হলো “রথ চাইল্ড” পরিবারের মালিকানাধীন একটি বৈশ্বিক ম্যাগাজিন। এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ইলুমিনাতি তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আগাম বার্তা প্রকাশ করে থাকে। এই ম্যাগাজিন বিশ্বের অর্থনীতি এবং বিভিন্ন অগ্রিম ইভেন্টের আগাম বার্তা দিয়ে থাকে। সবচেয়ে মজার বিষয় তাদের ভবিষ্যৎবানী গুলো প্রায় খেটে যায়।

এবার আমরা ২০১৯ সালের ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনের কাভার পেজে দেখবো তারা ২০১৯ সাল এবং আগামীর জন্য কি বার্তা দিয়েছে। 2019 Economist Magazine- এর সংস্করণ ছিলো এদের ৩৩ তম সংস্করণ। এই ৩৩ তম সংখ্যাটা ফ্রিম্যাসনরিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। কারণ২০১৯ সাল ছিলো “লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি” এর ৫০০তম জন্মবার্ষিকী। তাই ইলুমিনাতিদের কাছে এই সংখ্যাটা খুব গুরুত্ব বহন করে। ২০১৯ সালের ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনের কাভার পেজ খেয়াল করলে দেখতে পারবেন অনেকগুলো স্কেচ। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড়ো স্কেচ নিয়ে আমরা কথা বলবো।

বড় স্কেচটি হলো একটি ভিট্রুভিয়ান ম্যান (Vitruvian Man) বা পারফেক্ট ম্যানের স্কেচ। এই স্কেচ আঁকেন লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি। এই পারফেক্ট ম্যানই হলো বর্তমান সমাজের এক একটা মানুষ। ইলুমিনাতি বর্তমান সমাজের মানুষদেরকে ভিট্রুভিয়ান ম্যানের মতো দেখতে চায়। যে মানুষ বাস্তব জগত থেকে অনেক দূরে সরে ভার্চুয়াল জগত নিয়ে মেতে থাকবে।

(ক) ভিট্রুভিয়ান ম্যানের এক হাতে আছে গাঁজা। ইলুমিনাতি চায় বর্তমান সমাজের মধ্যে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে মাদকাসক্ত করে রাখতে , যাতে করে তরুণ প্রজন্ম তাদের চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যে আমেরিকায় গাঁজা চাষ এবং গাঁজা সেবন বৈধতা পেয়েছে।

(খ) ভিট্রুভিয়ান ম্যানের অপর হাতে আছে বেস বল বা ক্রিকেট বল। এটা থেকে বোঝা যায় ইলুমিনাতি মানুষকে ক্রিকেট তথা স্পোর্টস নিয়ে মাতামাতি করবে এবং একইসাথে চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলবে।

(গ) ভিট্রুভিয়ান ম্যানের অন্য হাতে আছে স্মার্টফোন। স্মার্টফোন এর সাথে সোশ্যাল মিডিয়া মিলে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় সবাই মগ্ন। মানুষ অনেক বেশি ভার্চুয়াল দুনিয়া নির্ভর হয়ে উঠেছে। স্মার্টফোন এর ভেতরে একটা QR code আছে। এটাও ভার্চুয়াল দুনিয়ার সিম্বল। যে কোনো পণ্য কেনাকাটা বা কোন নিউজ পড়তে এই QR Code scan করতে হয়। QR code এর মাধ্যমে মানুষের ব্যাক্তিগত তথ্য বিভিন্ন Remote Server-এ পাচার করে নিচ্ছে ইলুমিনাতি। (ঘ) ভিট্রুভিয়ান ম্যানের অপর হাতে আছে সাম্য ও ন্যায়ের প্রতীক, কিন্তু সেটা অসামঞ্জস্য। এটা থেকে বোঝা যায় কোথাও ন্যায় থাকবে না, সবর্দা অন্যায় বিরাজ করবে। চারিদিকে অন্যায়ের রাজত্ব কায়েম হবে। চারিদিকে অন্যায় রাজ করবে। (ঙ) ভিট্রুভিয়ান ম্যানের বাম বুকে 'Me Too' মুভমেন্টের কথা লেখা আছে। আমরা সকলেই অবহিত আছি গত বছর বিশ্বজুড়ে সাড়া জাগানো Me Too মুভমেন্টের কথা। মি-টু মুভমেন্টের জন্য হলিউড এবং বলিউড নড়ে গিয়েছিলো।

(চ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো ভিট্রুভিয়ান ম্যানের বাম হাতের নিচে একটি “প্যাঙ্গোলিন” এর ছবি আঁকা আছে। যেটি সম্পর্কে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০- এ বিবিসি বাংলা “করোনাভাইরাস : রোগের ভাইরাস ছড়ানো বন্যপ্রাণীর সন্ধান চলছে” শিরোনামে একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, করোনা ভাইরাস সম্ভবত ওই প্যাঙ্গোলিন থেকেই ছড়িয়েছে!

কিন্তু হায় আফসোস! ইলুমিনাতি পূর্ব থেকে প্ল্যান করে আমাদের দুর্গন্ধে নিক্ষেপ করছে, আর আমরা অন্ধের তাদেরসেই আস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হচ্ছি। ইলুমিনাতি আমাদের চিন্তাশক্তি কেড়ে নিয়ে লুসিফার বা ইবলিশের রাজত্ব কায়েম করতে চাচ্ছে। ইলুমিনাতি ঠিক করে দিচ্ছে আগামীতে এই পৃথিবীতে কি ঘটবে এবং ঠিক করে দিচ্ছে মানুষের মুভমেন্ট।

(০৮)

মক্কা ও মদিনা বন্ধ করে দেয়ার জন্য ইহুদি ও আমেরিকানরা করোনাভাইরাস তৈরি করেছে!

-(ইয়েমেনী গবেষক) আল-উবেইদী।

দ্য জেরুজালেম পোষ্ট, ২৯,৩,২০২০- এ প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে- ইয়েমেনি ইসলামি গবেষক শেখ ইব্রাহীম আল-উবেইদী অভিযোগ করেছেন যে, ইহুদবাদী ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র মক্কা শরীফ বন্ধ করে দেয়ার জন্য করোনা ভাইরাস তৈরি করেছে।

ভিডিওতে প্রচারিত জুমা'র খুৎবায় তিনি বলেন- "ইহুদীরা মক্কা ও মদিনা দখলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চক্রান্ত করছে। আর এখন তারা পবিত্র মক্কা ও মদিনা বন্ধ করে দেয়ার জন্যই কোভিড-১৯ তৈরি করেছে। গোপন চক্রান্তে এ মহামারী দেখা দিয়েছে তাই নয়, সৌদি রাজপরিবার গোপনে ইহুদি বংশোদ্ভূত এবং তারা হলো মোরদেকাই নামে একজন ইহুদির বংশধর।"

মোরদেকাই একসময় ইরাকে বসবাস করতেন। ইব্রাহীম আল-ওবেইদী আরও বলেন- "মুসলিম বিশ্বে মরহুম হোসেন বাদরুদ্দিন হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ইসলামের দুটি পবিত্র মসজিদ বন্ধ করে দেয়ার জন্য ইহুদী ও আমেরিকানরা জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে।"

(০৯)

Óডেনমার্ক মাইন" নামে একটি ব্লগে করোনা ভাইরাসের মাননির্ণয় ৬৬৬!

"ডেনমার্ক মাইন" নামে একটি ব্লগে 22.01.2020-এ CORONA শব্দের মান-নির্ণয় করে- C তে 3, O তে 15, R তে 18, O তে 15, N তে 14, A তে 1, সবমিলিয়ে হয় =66, আর CORONA তে আছে 6 টি অক্ষর, যা সবমিলিয়ে হয়= 666.

এখন এই 666 সম্পর্কে শুনুন, এটা দাজ্জাল এবং তার বাহিনী ইলুমিনাতি ও ইহুদী জাতির একটি জাতীয় সিম্বল বা চিহ্ন, যা তারা তাদের মাসীহ তথা দাজ্জালের আগমনের বছর নির্দেশ করে সব জায়গায় ব্যবহার করে থাকে। বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা গোগোলে সার্চ দিয়েও জেনে নিতে পারেন। ব্লগের সূত্র-

C = 3, O = 15
R = 18, O = 15
N = 14, A = 1
6 + 66 = 666.

66 And the word "CORONA" has exactly 6 words. So we get 666. And in Bible , Book of Reavealation says the number of the beast will be "666" . What do you think ?
Coincidence, huh ?

(১০)

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিছু হাইপ্রোফাইল ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সমীক্ষা !

যারা করোনাকে পুরোপুরিই মহামারী ও ছোঁয়াচে রোগ হিসাবে দেখছেন, তারা বলুন তো, ধরা-ছোঁয়ার বাইরের লোকগুলো কেনো করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন? নিচের লোকগুলোকে একটু দেখুন, তারা কি মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করেননি, সতর্ক বা সাবধান থাকেননি!?

(ক) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রিটিশ রানীর ছেলে প্রিন্স চার্লস: দেখুন- https://bit.ly/3dDoU3m

(খ) করোনায় আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন: দেখুন- https://bit.ly/2Uog3uN

(গ) রিয়ালের আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট করোনায় আক্রান্ত: দেখুন- https://bit.ly/2JmKivW

(ঘ) পুতিনের প্রশাসনের পাঁচ কর্মী করোনায় আক্রান্ত: দেখুন- https://bit.ly/3bIPpTB

(ঙ) করোনায় মারা গেলেন রিয়ালের সাবেক প্রেসিডেন্ট: দেখুন- https://bit.ly/2wIIIs

চ) মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের কর্মী করোনায় আক্রান্ত: দেখুন- https://bit.ly/2JmuBoM

(ছ) এবার করোনায় আক্রান্ত ব্রিটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী: দেখুন- https://bit.ly/2UnIYPK

করোনায় আক্রান্ত আরও কিছু হাই প্রোফাইল ব্যক্তির নাম দেখুন-

০১. হলিউডের ইদ্রিস এলবা ও সব্রিনা ধৌরী।
০২. গেম অফ থ্রোনস অভিনেতা ক্রিস্টোফার হিবজু।
০৩. কানাডার প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সোফী গ্রেগরি ট্রাডিউ।
০৪. মোনাকোর প্রিন্স এলবার্ট দ্বিতীয়।
০৫. হলিউড অভিনেত্রী ওলগা কুরিলেনকো।
০৬. আমেরিকান টিভি হোস্ট আন্ডি কোহেন।
০৭. স্পেনের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার কারমেন কালভো
০৮. হলিউডের হল অফ ফেম মেম্বার জ্যাকসন ব্রাউন।
০৯. বিখ্যাত শেফ ফ্লয়েড কারদোজ।
১০. হলিউড অভিনেতা গ্রেগ রিকার্ট।
১১. হলিউডের টম হ্যাংকস ও রিটা উইলসন।
১২. হলিউডের হার্ভে উইনস্টিন ।

এখন আপনারা কী বলবেন যে, তাঁদের মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করার টাকা ছিল না বা করোনা নিয়ে তাঁরা যথেষ্ট সচেতনও নন?

তাহলে শুনুন, এসব ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার একেবারে বাইরে থাকেন। দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন, মোস্ট হাই স্ট্যান্ডার্ড লাইফস্টাইল তাঁদের। চমৎকার, বিলাসবহুল বড়ো বড়ো বিল্ডিং এ থাকেন, যেখান সাধারণদের প্রবেশের অনুমতিই নেই। তবুও কেনো করোনা তাদের বাদশাহী বিল্ডিংয়ে গিয়ে আক্রমন করছে, এগুলো কোনো প্ল্যানের অংশ নয় তো? একটু ভাবুন তো।

করোনা ভাইরাস: মিডিয়া পর্যালোচনা

-ইবনু লুৎফ

সম্পাদনা, অঙ্গসজ্জা ও অক্ষর বিন্যাস:
হুসাইন আলহুদা

পর্ব- (০২)

উলফত বন্ধুরা! এতক্ষণ তো চললো তথাকথিত ভবিষ্যতবাণী বা প্ল্যানের কথা, এবার আসুন মিলিয়ে নেই! কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে, তাদের সেই প্ল্যান বলুন আর ভবিষ্যতবণী?

এক্ষেত্রে আমরা নির্ভরযোগ্য নিউজ পেপার এবং তথ্যভান্ডারগুলোর উপর ভর করেই পথ চলব। (ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ)

ভূমিকা:

জীবাণু অস্ত্রের প্রাথমিক ধারণা

চলুন, প্রথমে জীবাণু অস্ত্র সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই।
প্রশ্ন:- জীবাণু-অস্ত্রটি আসলে কী?
উত্তর:- এটি একটি ভাইরাস, আর ব্যাকটেরিয়া হলো এক ধরনের অণুজীব। এই ধরনের অণুজীব দ্বারা তৈরি হয় বায়োলজিক্যাল উইপেন বা জীবাণু অস্ত্র। উদাহরণ হিসেবে অ্যানথ্রাক্স, বটুলিনিয়াম টক্সিন, প্লেগের মতো জৈবিক উপাদানের কথা বলা যায়। কোনও রাষ্ট্র বা সন্ত্রাসবাদীগোষ্ঠী দ্বারা পরীক্ষাগারে এই ধরনের জীবাণু প্রস্তুত করে অন্য কোনো রাষ্ট্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দিলে তখন বলা হয় জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রশ্ন:- এ যাবত জীবাণু অস্ত্র ব্যবহারের কি কোনো নজির আছে?
উত্তর:- হ্যাঁ, অবশ্যই আছে, আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর পক্ষ থেকে জীবাণু অস্ত্রের ভয়াবহতার উপর ভিত্তি করে সেটিকে মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, নিচে নজিরসহ তোলে ধরা হলো- = (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

Ajker Khobor
BANGLA ENGLISH LIVETV
NEWS24 দেশে বিদেশে

এক.

আজ থেকে ৯ বছর আগে ২,১২,২০১১ তে "বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর.কম" একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেটির শিরোনাম ছিল,

"জীবাণু অস্ত্রের ঝুঁকিতে উন্নয়নশীল দেশগুলো"

সেখান মার্কিন কূটনীতিক "টমাস কান্ট্রিম্যান" বর্তমান শতকে জীবাণু অস্ত্র ও বিশ্বব্যাপী এর ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "সত্যিকারের হুমকিটা আসছে আসলে সন্ত্রাসী এবং রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের পক্ষ থেকে। আর এই ভয়াবহতার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের মতো বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে এর ফলে দেখা দিতে পারে ভয়াবহ সব রোগ। আসলে আমরা এটা ঘটার আগে বুঝতে পারবো না, হয়তো জানতেও পারবো না। সম্প্রতি এধরণের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বব্যাপী নতুন নতুন ভাইরাস অথবা অণুজীবের জন্ম হচ্ছে।"
তিনি বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর.কম-এর সাংবাদিককে লক্ষ্য করে আরও বলেন, "আপনি খেয়াল করলে দেখতে পাবেন এই ঘটনাগুলো কিভাবে প্রকৃতি থেকে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর কারণে নানান রোগ দেখা দিচ্ছে; 'এবোলা ভাইরাস', 'সোয়াইন ফ্লু' অথবা 'অ্যাভাইন ফ্লু' আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে পর্যাপ্ত সুবিধা নেই যে তারা এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবে। তারা জানেও না বা কখনও দেখেওনি; এমন শত্রুরাই তাদের বিরুদ্ধে জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করছে। এ সকল উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করতে আমার অনেক অর্থ ব্যয় করছি। এছাড়াও জৈব নিরাপত্তা পরিকল্পনাও দিচ্ছি আমরা। আর অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই তা আমরা করে যাব। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং অ্যাকাডেমিক কমিউনিটিগুলোতেই শুধু নয়, সাধারণ মানুষেরও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমাদের আরও কাজ করতে হবে।"

বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর.কম
২, ১২, ২০১১ ইং

দুই.

দৈনিক যুগান্তরে, ২০১৮ সালের রিপোর্ট

"গোপনে জীবাণু অস্ত্র কারখানা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র"

বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা "যুগান্তর" ৭ অক্টোবর ২০১৮ সালের একটি রিপোর্টে "গোপনে জীবাণু অস্ত্র কারখানা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র!" এই শিরোনামে একটি খবর প্রকাশ করে।
সেখানে বলা হয়েছে যে, "ইরাক, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া বা বিশ্বের কোনো দেশে রাসায়নিক অস্ত্র বা জীবাণু অস্ত্রের ব্যবহার হলে সবার আগে রুখে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। অথচ সেই যুক্তরাষ্ট্রই নাকি জীবাণু অস্ত্র তৈরি করে।
সেই সাথে বিভিন্নভাবে এর পরীক্ষাও চালায়। বিশ্ব মোড়ল এই রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে আগে থেকেই এ অভিযোগ ছিল। এবার সেই একই অভিযোগ এলো রাশিয়ার পক্ষ থেকে। দেশটির অভিযোগ, জর্জিয়ায় রুশ সীমান্তের কাছেই অতি গোপনে একটি জীবাণু অস্ত্রের কারখানা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।
সেই অস্ত্রের পরীক্ষাও চালানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। এই অপতৎপরতা আন্তর্জাতিক চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন। এতে ঝুঁকির মুখে পড়েছে রাশিয়ার জীবন। আর বরাবরের মতো এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে ওয়াশিংটনও। শুক্রবার মার্কিন দৈনিক মিলিটারি টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়েছে।

রুশ সেনাবাহিনীর বিশেষ বিভাগ বিকরণ, জৈব ও রাসায়নিক সুরক্ষা সেনা বিভাগের প্রধান "মেজর জেনারেল ইগর কিরলভ" বৃহস্পতিবার নতুন করে এ অভিযোগ তোলেন। মস্কোয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতরে দেয়া ওই বিবৃতিতে তিনি বলেন, রাশিয়ার সীমান্তের কাছে এ ধরনের কার্যক্রম সহ্য করা হবে না।

তিনি নিশ্চিত করে বলেন, জর্জিয়ার অ্যালেক্সেইয়েভকা উপশহরের একটি পাবলিক হেলথ রিসার্চ সেন্টারে রাসায়নিক অস্ত্রের একটি গোপন ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ল্যাবটিতে যে জৈব অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে এ ব্যাপারে রাশিয়ার হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে বলে জানান কিরিলভ। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে হালকা ক্ষমতাসম্পন্ন বিষাক্ত

= বিভাগ- (ক) (জনস্বাস্থ্যের প্রবল ক্ষতিকারক জিবাণু)

(১) অ্যানথ্রাক্স রোগ। রোগের কারণ ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (ব্যাকটেরিয়া)। এই জীবাণু অস্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছিল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। এ ছাড়া জানা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯সালে, জাপান ১৯৯৫ সালে ও আমেরিকা ২০০১ সালে এই জীবাণুর অপব্যবহার করে।

(২) বটুলিজম রোগ। রোগের কারণ ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম টক্সিন ব্যাকটেরিয়া। শোনা যায় বিশ্বযুদ্ধগুলো ছাড়াও পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপান ও আমেরিকা এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করেছিল।

(৩) হেমোরেজিক ফিভার (অসুখ)। রোগের কারণ মারবার্গ, ইবোলা, অ্যারেনা ভাইরাস। সোভিয়েত ইউনিয়ন জৈব অস্ত্র হিসেবে এই ভাইরাস ব্যবহার করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়।

(৪) প্লেগ রোগ। রোগের কারণ ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস ব্যাকটেরিয়া। চতুর্দশ শতকে ইউরোপে এর প্রকোপ দেখা যায়। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এই ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়।

(৫) স্মল পক্স অসুখ। রোগের কারণ ভ্যারিওলা ভাইরাস। উত্তর আমেরিকায় অষ্টাদশ শতকে এই ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল।

(৬) টুলারেমিয়া অসুখ। রোগের কারণ ফ্রান্সিসেলা টুলারেনসিস ব্যাকটেরিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার করা হয়েছিল। =

যুগান্তর

ক্যাপসুল তৈরির চেষ্টা করছে। এগুলোর ধ্বংস ক্ষমতা কম হলেও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে ঘায়েল করা সম্ভব। রাশিয়ার পাশাপাশি চীন সীমান্তেও যুক্তরাষ্ট্র নিষিদ্ধ অস্ত্রের বেশ কয়েকটি গবেষণাগার স্থাপন করেছে বলেও দাবি করেন তিনি।"

সেই রিপোর্টে জৈব অস্ত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে আরও বলা হয়েছে- "জৈব অস্ত্র হচ্ছে জৈব উপাদান থেকে তৈরি জীবাণু। এই জীবাণু প্রয়োগের মাধ্যমে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। এটি এমন এক অস্ত্র যার মাধ্যমে মহামারী সৃষ্টিতে সক্ষম কোনো জীবাণুকে বিশেষ উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় সবার অজ্ঞাতে..... ছড়িয়ে দেয়া হয় আর ওই এলাকার মানুষ এই রোগ প্রতিরোধে অক্ষম থাকবে। পারমাণবিক বোমা তৈরি ও এর নিক্ষেপ এসব অত্যন্ত দৃশ্যমান বিষয় এবং শত্রুরা সহজেই জেনে যেতে পারে। তবে জৈব অস্ত্র দিয়ে শত্রু দেশের যেকোনো জায়গায় রেখে এলেই হবে। ফিরে আসতে আসতেই ছড়িয়ে পড়বে সবখানে। কিন্তু কে এর সঙ্গে যুক্ত তার কোনো প্রমাণ সহজেই পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে এখন প্রায় ১২০০ ধরণের জৈব অস্ত্রে ব্যবহারযোগ্য জীবাণু আছে। জৈব অস্ত্র হতে হলে একটা অণুজীবের অবশ্যই উচ্চ সংক্রমণ করার ক্ষমতা, রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা, ওই রোগের প্রতিষেধকের অপ্রতুলতা এবং সহজে পরিবহন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।"

এবার দেখুন ২০১৮ সাল থেকেই বিশ্বমোড়ল দেশগুলো ভেতরে ভেতরে এই জীবাণু অস্ত্রের গবেষণা ও বিস্তারের কেমন তড়িঘড়ি প্ল্যান করছিল, আর এর মাঝেই হঠাৎ চায়না অথবা আমেরিকা ওই জীবাণু অস্ত্র তৈরি করে ফেলে আর করোনা ভাইরাস নাম দিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়!

তিন.

সি সি এন-এর একটি রিপোর্টে অনেক আগেই বলা হয়-

"জীবাণু যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে চীন!"

নিউজ পোর্টাল সি সি এন- ২৯ জানুয়ারি ২০২০-এর একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, "দুটি তথ্য ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়াজুড়ে। প্রথমটি হলো ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ সন্দেহ করছে যে,, রহস্যময় "নোভেল করোনা ভাইরাসের উপাদান চাষ করেছে চিনের গোপন সামরিক গবেষণাগার।" দ্বিতীয় তথ্য হলো, মার্কিন পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্ট এই দাবিকে সমর্থন দিয়ে দিয়েছে।

সিসিএন রিপোর্টে অনেক আগের একজন ইসরায়েলি গোয়েন্দার উদ্ধৃতি নকল করে বলা হয় যে, "ইসরায়েলি সেনা গোয়েন্দা দফতরের প্রাক্তন প্রধান লেফটেন্যান্ট ড্যানি শোহাম জানিয়েছেন যে, বায়ো-ওয়ারফেয়ার বা জীবাণু যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে চীন। জিনের কারসাজিতে এমন ভাইরাস তৈরি করা হচ্ছে, যেটি মিসাইল, ড্রোন, বোমা বা সামান্য একটি পেন অথবা ঘড়ির মধ্যে দিয়েই ছড়িয়ে দেওয়া যাবে শত্রুর ভূখণ্ডে। সেই ভাইরাসের দাপটে ২৫ দিনের মধ্যেই মৃত্যুমিছিলে উজাড় হয়ে যেতে পারে একটি বড় শহর বা একটি জেলা।"

ইসরায়েলের সেনা গোয়েন্দাদের উদ্ধৃত করে মার্কিন সিসিএন-সহ ইসরায়েলের একাধিক ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, "সেনাবাহিনীর ব্যাপক আধুনিকীকরণ, ছাঁটাই প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন করছে চীন। চলছে জীবাণু অস্ত্র ও রাসায়নিক অস্ত্র নিয়েও গবেষণা। এরই অংশ হিসেবে সার্স জাতীয় ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছে চীনের সামরিক বাহিনীর গবেষণাগার।"

"শক্তিশালী জীবাণু অস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছেন ইসরায়েলের জীবাণুঅস্ত্র বিশেষজ্ঞরা।"

ইসরায়েলের দাবি, "অসাবধানতাবশত এই গবেষণাগার থেকেই ছড়িয়েছে ভাইরাসের সংক্রমণ। আসলে জৈব রাসায়নিক অস্ত্রের উপর গবেষণা করতে গিয়েই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন চীনের বিজ্ঞানীরা।"

তাদের দাবি, "বিশ্বের সব দেশকে জব্দ করতে, চাপে রাখতে সবচেয়ে শক্তিশালী জীবাণু অস্ত্র বানাচ্ছে চীন। এজন্য জিনগত অভিযোজন ঘটিয়ে করোনা ভাইরাসের মতো অনেক ভাইরাস তৈরি করছেন চীনের সামরিক বাহিনীর গবেষকরা।"

= **বিভাগ- (খ) (জনস্বাস্থ্যের [সাধারণ] ক্ষতি)**
(১) ব্রুসেলোসিস রোগ। রোগের কারণ ব্রুসেলা ব্যাকটেরিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল।
(২) কলেরা রোগ। কারণ ভিব্রিও কলেরি ব্যাকটেরিয়া। ব্যবহার হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।
(৩) এনকেফেলাইটিস। রোগের কারণ আলফা ভাইরাস। ব্যবহার হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।
(৪) ফুড পয়েজনিং। সালমোনেলা, শিগেলা ব্যাকটেরিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ৯০-এর দশকে শীতল যুদ্ধে আমেরিকা এই ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার করে বলে সন্দেহ করা হয়।
(৫) গ্ল্যান্ডার্স। বারখলডেরিয়া ম্যালেই ব্যাকটেরিয়া। ব্যবহার করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে।
(৬) সিটাকসিস অসুখ। ক্ল্যামাইডিয়া সিটাকি ব্যাকটেরিয়া। ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।
(৭) কিউ ফিভার । কক্সিয়েল্লা বারনেটি ব্যাকটেরিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। (৮) টাইফাস রোগ। রিকেটসিয়া প্রাওয়াজেকি(রিকেটশিয়া)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার হয়েছিল।

বিভাগ- (গ) (নতুন জীবাণু যাদের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বারা বেশি ক্ষতিকারক করে তোলা হয়) হান্টা ভাইরাস, নিপা ভাইরাস, টিক-বর্ন এনকেফেলাইটিস ভাইরাস, হেমোরেজিক ফিভার ভাইরাস, ইয়েলো ফিভার ভাইরাসসমূহ এবং বিভিন্ন মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। =

চার.

দৈনিক সমকাল ৪.৩.২০২০-এ একটি খবর প্রকাশ করে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সেরা সাংবাদিকের হাওলা দিয়ে বলা হয়, "তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন,

কভিড-১৯-এর জন্ম নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটির গবেষণাগারে, পাঁচ বছর পর যেটি ছড়িয়েছে চীনের উহান থেকে।"

এছাড়া সেখানে আরও বলা হয় যে, "যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (চ্যাপেল হিল) সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. রালফ ব্যারিক ২০১৫ সালের নভেম্বরে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন "নেচার মেডিসিন পত্রিকায়।" সেখানে তিনি বলেছিলেন : চীনের ঘোড়া-বাদুড়ের লালা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এক ধরনের ভাইরাসকে সক্রিয় করে তা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, যার বৈজ্ঞানিক নাম দেন এসএইচ সি-০১৪।
এ গবেষণার কারণ জানিয়ে সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক ফ্রান্সিস কলিন্স বলেছিলেন, অণুজীবের মাধ্যমে জৈব নিরাপত্তা এবং সতর্কতামূলক বিষয়গুলোকে আরও সুদৃঢ় করতেই এ ধরনের গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। গবেষণাগারের প্রকৌশলবিদ্যা ব্যবহার করে ভাইরাসটির সংক্রমণ ক্ষমতার বিচিত্র কয়েকটি দিক নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। নেচার মেডিসিনে সেই গবেষণাপত্র প্রকাশ হওয়ার পরই এ ধরনের গবেষণার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন অণুজীব বিশেষজ্ঞ রিচার্ড এডব্রাইট।"
2015 সালের নভেম্বরেই দ্য সায়েন্টিস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, "এ ধরনের বিপজ্জনক গবেষণার ফলে কোনো কারণে ভাইরাসটি গবেষণাগার থেকে পালিয়ে লোকালয়ে চলে আসতে সক্ষম হলে এটা মানবজাতি এবং অন্য অনেক প্রাণীকুলের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। কারণ এটা যখন প্রকৃতিতে অন্য কোনো পোষকদেহে নির্জীব অবস্থায় থাকে, তখন সেটির সক্রিয় হওয়ার ঝুঁকি কম। তবে এটি গবেষণাগারে সক্রিয় করার পর একবার যদি মানুষে সংক্রমিত হয়, তাহলে সেটি প্রাণঘাতী ভয়ংকর অস্ত্রের মতোই আঘাত করবে।"

দৈনিক সমকাল
৪.৩.২০২০

= **প্রশ্ন:- জৈব অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেই?**
উত্তর:- হ্যাঁ, আছে নামে মাত্র! যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জীবাণু অস্ত্রের ব্যবহারের ভয়াবহতা কাঁপিয়ে দিয়েছিল পুরো বিশ্বকে। লাখ লাখ মানুষ এবং সৈনিকের অকাল মৃত্যুর কারণে জীবাণু অস্ত্রের ব্যবহারকারী রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভ বাড়ছিল ক্রমশ।
আন্তর্জাতিক নানা মহলের চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ সালে স্বাক্ষরিত হয় জেনেভা চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজুড়েই জীবাণু অস্ত্র ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়। তবে জেনেভা চুক্তিতে জীবাণু নিয়ে গবেষণা স্তব্ধ করার কথা বলা হয়নি। তাই বিভিন্ন দেশ যেমন ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি, কানাডা, বেলজিয়াম, পোলান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন (অধুনা রাশিয়া) জীবাণু নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকে। মনে রাখতে হবে, ১৯২৫ সালের জেনেভা চুক্তিতে আমেরিকা কিন্তু সই করেনি। বরং জীবাণু গবেষণাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় তারা। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধলে ফের জীবাণু অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। পুনরায় সংগঠিত হয়ে ওঠে চিকিৎসাশাস্ত্রের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । চুক্তির অর্ধশতক পর, অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে আয়োজিত হয় "বায়োলজিক্যাল উইপেনস কনভেনশন (বিডব্লিউসি)।" সেখানে সবরকমের জীবাণু অস্ত্র তৈরি ও মজুদ রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আগে থেকে মজুদ করা সমস্ত জীবাণু বা জৈব অস্ত্র ধ্বংস করার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়। আমেরিকাও শেষ পর্যন্ত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। =

আনন্দবাজার পত্রিকা

পাঁচ.
১৮.০৩.২০২০- তারিখে কোলকাতায় "আনন্দবাজার পত্রিকা" একটি খবর প্রকাশ করে, যেটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল যে, আমার মন চাচ্ছিল পুরো খবরটাই উলফত বন্ধুদের জন্য তোলে ধরি! কিন্তু না, বর্তমানে জায়গা-জমির বড্ড বেশি দাম!
যাইহোক, তারা "করোনা থেকে ফায়দা তুলছেন তারা!" এই শিরোনামে খবরের এক অংশে বলেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথাবার্তায় ক্রমাগত একটা অভিযোগের সুর। তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন "তার দেশকে এভাবে বিপন্ন করছে যত সব "বাইরের ভাইরাস..." এরপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের কী কী ফায়দা এতে সব তুলে ধরা হয়।
এরপর চীনের কথা বলা হয় এভাবে, "চীনের অবস্থাও তথৈবচ। প্রেসিডেন্ট শি বুঝে গিয়েছেন নরমভাবে ক্ষমতার আসর ফেঁদে বসার এটাই সুবর্ণসুযোগ। সুতরাং উহানে বিপর্যয় এড়াতে না পারলেও বা সে জন্য প্রথম পর্বে যথেষ্ট তৎপর হতে না পারলেও, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরে তিনি সেই অঞ্চলে দৌড়ে যেতে ভুল করেননি, যাতে মারণ-ভাইরাস কমে-আসার "সাফল্য"-এর সঙ্গে তাঁর নামটি শক্তভাবে যুক্ত হয়ে যায়।..."
এরপর রাশিয়ার ফায়দা লুটার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, আর রাশিয়ার? এই মুহূর্তে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কার্যত নিজেকে সম্রাট বানানোর চেষ্টা করছেন। পুতিন যাতে আরো অনেক বছর (দশক?) প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা চলছে। এমন সময়ে পশ্চিমি বিশ্বে এসে পড়েছে করোনার করাল থাবা। সুতরাং তিনি এখন খুবই বিশ্বাসযোগ্য ভাবে দাবি করতে পারছেন, এই তো অস্থির আমেরিকা ও ইউরোপের অবস্থা, তাদের কে দেখে তারই ঠিক নেই 'এই অবস্থায় তাদের জারি করা রাশিয়া-বিরোধী নিষেধাজ্ঞায় কাঁচকলা এসে যায় মস্কোর! তা ছাড়া, পুতিন জানিয়েছেন, গোটা বিশ্বেই যে জরুরি অবস্থা, তার সরকার যথাসাধ্য শক্তভাবে আগলাচ্ছে দেশ। অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তার নামে অনেক কিছুই করা যাবে এখন তার দেশে, প্রশ্নহীন। সবাই সব জানে, তবুও তাঁর আকস্মিক ঘোষণায় চমকে উঠল ক্রেমলিন। বিশ্বপরিস্থিতি দেখিয়ে তাদের প্রেসিডেন্ট বলে দিচ্ছেন, ২০২৪-এর পরও তিনি ক্ষমতায় থাকছেন। ২০২৪ সাল ' মানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুতিনের চতুর্থ টার্মের শেষ। চার বারের বেশি প্রেসিডেন্ট হওয়ার নিয়ম নেই তার দেশের সংবিধানে, তাই দরকারে সংবিধানই শুধরে নেবেন তিনি। সংবিধান সংশোধন যে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির ক্ষমতাক্ষুধার কাছে পানিভাত, আজ তা কে না জানে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৮.০৩.২০২০

ছয়.
দৈনিক বর্তমান ১৯.০৩.২০২০-এ "কলেরা থেকে করোনা : ভাইরাসই যখন অস্ত্র" এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে, "পেন্টাগন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দিয়ে থাকে জীবাণু অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করার জন্য। অভিযোগ রয়েছে, অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার নামে জীবাণু অস্ত্রের গবেষণাগার গড়ে তোলে।
১৯৮১ সালে প্রকাশিত মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পোকামাকড়ের মাধ্যমে জীবাণু অস্ত্র ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আমেরিকারই ছিল। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ অ্যালগিপ্টি মশার মাধ্যমে আফ্রিকায় ইয়েলো ফিভার ছড়ানো হয়। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক বায়ো-ল্যাব থেকে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বহু মানুষ মারা যায়। তদন্তের পর প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন এর দায় স্বীকার করে নেন।
করোনার ক্ষেত্রে জীবাণু অস্ত্রের ধারণাও একেবারেই বাতিল করে দেয়া যায় না। অস্ত্র ছাড়াই প্রাণঘাতী কোনো ভাইরাসের মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে তিলে তিলে খতম করে দেয়ার জন্যই মূলত এসব ভাইরাস তৈরি করা হয়। জৈবিক বিষাক্ত পদার্থ কিংবা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাকের মতো সংক্রামক অণুজীবের মাধ্যমে বায়োলজিক্যাল এসব অস্ত্র নাকি পারমাণবিক অস্ত্রের থেকেও ভয়ঙ্কর! আসলে মানুষই মানুষের শত্রু সৃষ্টি করে। তারপর তা যখন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ওঠে, তখন তাকে ধ্বংস করার জন্য হিমশিম খায়। এরপর সেখানে আরও বলা হয়, "২০১৮ সালে জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার এক সভায় আর অ্যান্ড ডি ব্লুপ্রিন্টের বিশেষজ্ঞ দল প্রথম "ডিজিজ এক্স" নাম দিয়ে পরবর্তী মহামারি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, পরবর্তী মহামারী কী থেকে উৎসারিত হবে, তা জানা নেই। কিন্তু এর আশঙ্কা প্রবল। অজানা সেই জীবাণুর নাম তারা দিয়েছিলেন, "ডিজিজ এক্স।" তারা বলেছিলেন, চেনা কোনো জীবাণু থেকে পরবর্তী মহামারি হওয়ার আশঙ্কা কম। আর তেমন হলেও চেনা শত্রুর বিষয়ে মানুষের মোটামুটি প্রস্তুতি থাকে। মুশকিল হচ্ছে অজানা জীবাণু নিয়ে। সেই সময় গবেষকরা এও বলেছিলেন যে, এই "ডিজিজ এক্স" কোনা প্রাণীদেহ থেকে আসা ভাইরাস থেকেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষ এখন এক নতুন মহামারির যুগের সামনে দাঁড়িয়ে।"

দৈনিক বর্তমান
১৯.০৩.২০২০

= মনে রাখতে হবে, ১৯৭৫ সালের বিডব্লিউসি ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি যেখানে শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয় বা রোগ নিরাময়ের জন্য জীবাণু বা জৈব পদার্থের ব্যবহার বাদ দিয়ে সমস্ত রকম হানীকর জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯২৫-এর পর থেকে প্রতি ৫ বছর এই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। তা এখনও জারি আছে। ২০১৫ অবধি ১৭৩টি দেশ এই চুক্তির আওতাধীন হয়েছে। তবে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, জেনেভা চুক্তি বা বিডব্লিউসি 'কোনো চুক্তিতেই জীবাণু নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গেই বলে রাখি, ২০০১ সালে "আমেরিকার অ্যানথ্রাক্স লেটারস" বা "অ্যানথ্রাক্স পত্র" র ঘটনার পরে গত কুড়ি বছরে পৃথিবীতেই কোনও প্রমাণিত জীবাণু-অস্ত্র ব্যবহারের ঘটনা ঘটেনি।

প্রশ্ন:- আপনার কথা মতে, বেশ কিছু দেশের কাছে ভয়ঙ্কর জীবাণু রয়েই গেছে?

উত্তর:- হ্যাঁ অবশ্যই! বেশ কিছু উন্নত দেশে মারাত্মক ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাযুক্ত পরীক্ষাগারে জীবাণু নিয়ে গবেষণা চলছে। তাদের কাছে কোন ধরনের জীবাণু আছে তা বলা সম্ভব নয়। জীবাণু নিয়ে গবেষণা মূলত দুইটি কারণে করা হয়-

(ক) জীবাণু সংক্রমণের দ্বারা হওয়া ব্যাধির উন্নততর নির্ণয়পদ্ধতি আবিষ্কার।

(খ) রোগ প্রতিরোধের জন্য উন্নততর ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক আবিষ্কার। •

সাত.

এদিকে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া নিয়ে যখন সবাই মাতাল তখন সব ফায়দা লুটে নিচ্ছে বিশ্ব-চোর ইহুদী জাতি! সেরকম একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে নিউজপোর্টাল ১৭,৩,২০২০ তারিখে ***"জীবনঘাতী জীবাণুর বেআইনি গবেষণা"*** এই শিরোনামে।

সেখান বলা হয়েছে যে, "ভারত সরকারের যথাযথ অনুমোদন না নিয়েই প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় সহায়তা করার জন্য ইসরাইলের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিপাহকে সম্ভাব্য জৈব-অস্ত্র বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে সন্ত্রাসীদের হাতে পড়লে এই জীবাণু ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।"

সব কিছুর নাটেরগুরু ওই মহাশয়রাই! কিন্তু পর্দা ভেদ করে কখনো তারা সামনে আসবে না, কারণ "খোদার ইন্তেজার!"

আট.

১৭,৩,২০২০-এ "দ্য ওয়াশিংটন টাইমস" একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, সেখান বলা হয়েছে যে, "এবার নতুন দাবি তুলেছেন, ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা ও জীবাণু অস্ত্র বিশারদ ড্যানি শোহাম। ইসরায়েলি জীবাণু অস্ত্র বিশারদের দাবি, চিনের গোপন অস্ত্র গবেষণাগার থেকেই রহস্যময় করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে। দ্য ওয়াশিংটন টাইমসকে তিনি জানিয়েছেন, উহানে চীনের গোপন জীবাণু অস্ত্র গবেষণা কার্যক্রমের ল্যাবরেটরি রয়েছে। সেখান থেকেই করোনা ভাইরাস প্রথম ছড়িয়ে থাকতে পারে। তবে চিনের তরফে এই জীবাণু অস্ত্র গবেষণার কথা অস্বীকার করা হয়েছে।"

এই ড্যানি শোহাম কিন্তু এলেবেলে লোক নন। ১৯৭০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর হয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ সারাবিশ্বে জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। মাইক্রোবায়োলজিতে পিএইচ ডিও করেছেন তিনি।

নয়.

এদিকে চীনের দাবি এটা যুক্তরাষ্ট্রের কাজ, "একজন চীনা কূটনীতিক তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে সরাসরি ইঙ্গিত করেছেন, উহানে গত বছর অক্টোবর মাসে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসা মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি দল এই ভাইরাস ছড়িয়ে গেছে। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র "ঝাও লিজিয়িন" টুইটারে মার্চের ১১ তারিখে মার্কিন কংগ্রেস কমিটির সামনে সে দেশের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের (সিডিসি) প্রধান রবার্ট রেডফিল্ডের সাক্ষ্যের ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করেছেন। ওই ফুটেজে রেডফিল্ড যুক্তরাষ্ট্রে কিছু ইনফ্লুয়েঞ্জা-জনিত মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে বলছেন, পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোভিড-১৯-এর কারণেই ওই মৃত্যু।"

দশ.

এপ্রিলের শেষে নিয়ন্ত্রণে আসবে করোনা!

দাবি চীনা বিশেষজ্ঞ জুং নানশান এর! ২,৪,২০২০ এ চীনের শেনজেন টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি কিভাবে বলছেন একথা...? প্ল্যান নয়তো....!!!

এখন আমার একটা প্রশ্ন! চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন বা ইসরাইল যেই এই ভাইরাস তৈরি করুক বা ছড়িয়ে দিক, কিন্তু তাতে তাদের অভ্যন্তরীণ বিভেদ ছাড়া অন্য আরও কোনো কারণ আছে কিনা তা একটু খতিয়ে দেখতে হবে!

যাইহোক, উলফত বন্ধুরা! এ গোপনের গোপনীয় বিষয়গুলো যা আপনাদের সামনে পেশ করা হলো। শুধু একটু ভাবনার জগতে ডুবে ভাব্বার জন্য! কারণ একজন সাধারণ ঈমানদার মুসলমানের যেখানে ঘটনার এপিঠ-ওপিঠ উভয় পিঠ সম্পর্কেই ধারণা থাকা দরকার, সেখান একজন দ্বীনের দায়ী, নবীজির সা. ওয়ারিশ হিসেবে তো আরও বেশি জরুরি। তাই আমরা সব বিষয়ে চোখ -কান খোলা রাখি।

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি বেশি দোয়া করি, রব্বে কারীম যেনো আমাদের হেফাজত করেন, আমাদের কবুল করুন।
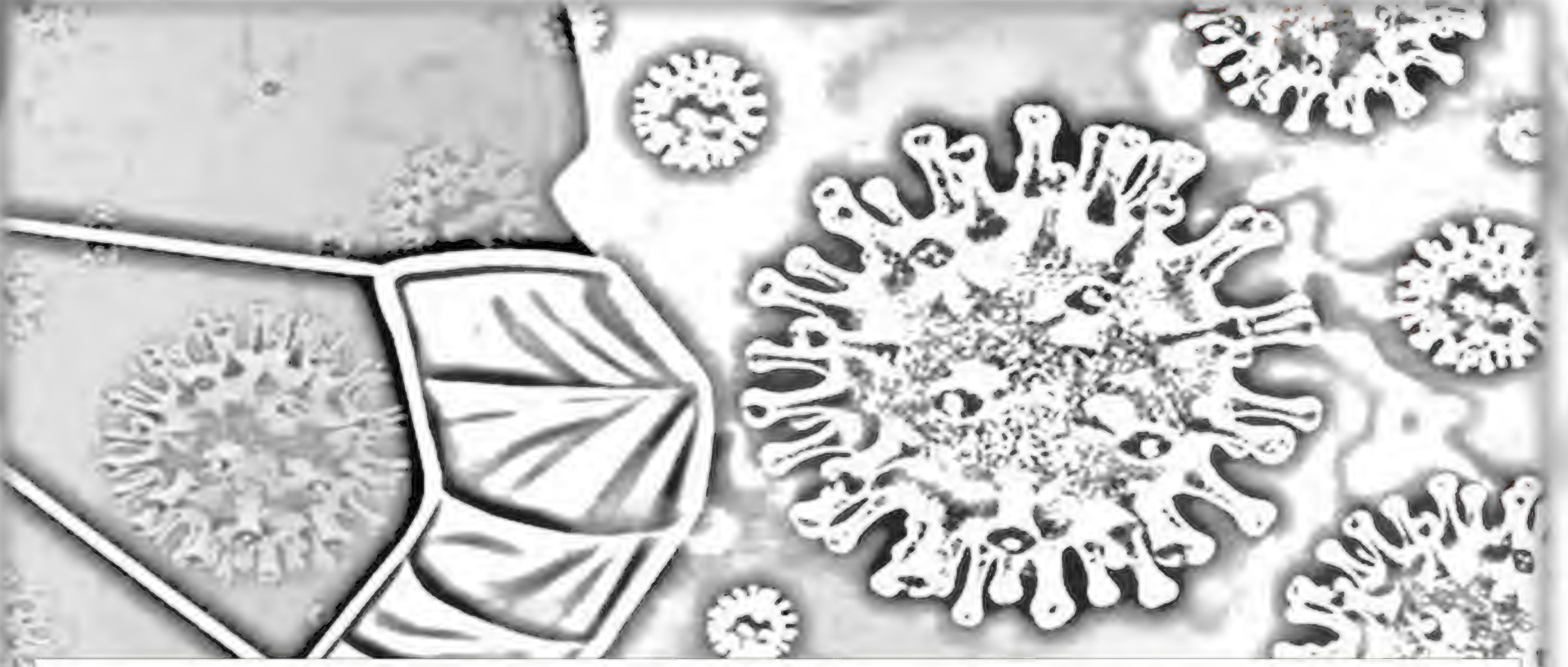
করোনা ভাইরাস:

বৈশ্বিক মহামারি: একজন মুমিনের করণীয়।

-ইবনু লুৎফ
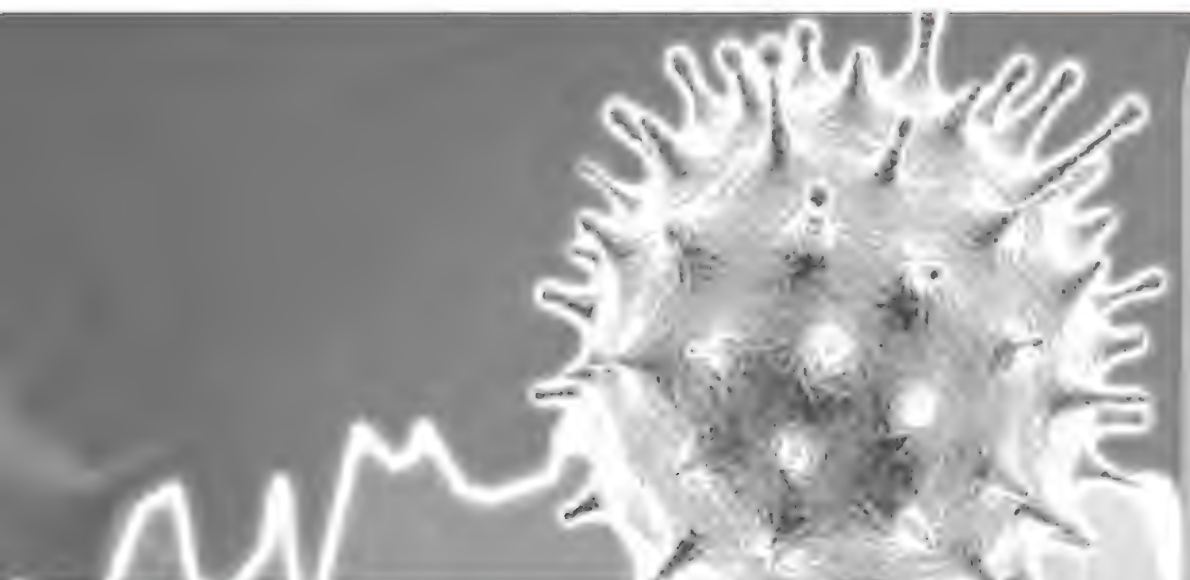
সম্পাদনা, অঙ্গসজ্জা ও অক্ষর বিন্যাস:
হুসাইন আলহুদা

গত কয়েক মাসব্যাপী "করোনা" নামের এক বৈশ্বিক মহামারি মানবজীবন আতঙ্কিত করে রেখেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, ভাইরাসটা যেনো কোনো মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে, যতক্ষণ না তার মিশন শেষ হবে ততক্ষণ সে মাঠ ছাড়তে একদমই রাজি নয়। তাই ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে সচেতন হওয়া জরুরি।

নিচের রচনায় সচেতনতামূলক ৪ টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে ।

১. আসুন বালা-মুসিবত এবং মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কারণসমূহ একবার স্মরণ করে নেই

২. মহামারি থেকে উত্তরণে অস্থায়ী কিছু প্রতিকার!

৩. মহামারি থেকে হেফাজতে থাকার স্থায়ী কিছু করণীয়।

৪. কোনো এলাকা করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেলে সেখানকার অধিবাসীদের জন্য বিশেষ করণীয়।

১ আসুন বালা-মুসিবত এবং মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কারণসমূহ একবার স্মরণ করে নেই

এ শিরোনামে আলোচনা করতে হলে নিজেদের আত্মসমালোচনা না করে উপায় নেই। সমাজে আমাদের অন্যায় কর্মের মাত্রা আজ এতটাই বেড়ে গেছে যে, পুরো শরীর যেন পাপে ভরপুর। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি যাই করছি না কেন, সব কিছুতেই যেন অসৎকেই প্রাধান্য দিচ্ছি। এমনকি মুখে আমরা যা বলছি তাও মিথ্যা বলছি, আল্লাহর ভয়ে যখন দুই রাকাত নামাজ আদায় করি সেখানেও দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকতে দ্বিধা হয় না আমাদের, অপেক্ষায় থাকি কখন নামাজ শেষ করব আর বাহ্যিকতায় মত্ত হব।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- অর্থ : "মানুষের কৃতকর্মের দরুন জল-স্থলে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে যায়। এর পরিণামে তিনি তাদের কিছু কিছু কর্মের শাস্তি (দুনিয়াতেই) ভোগ করাবেন, যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

(সুরা আর রুম: ৪১)

পৃথিবীর এমন কোনো দেশ বা এমন কোন জাতি নেই যাদের উপর আজাব আসেনি । যত বড়ো শক্তিধর রাষ্ট্রই হোক না কেন, আজাব সময় মতো লক্ষ্যপানে এসে আঘাত হেনেছে।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে যে,
"(হে রসূল) আপনি বলে দিন, আল্লাহর হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের কোনো শাস্তি দিতে চান? অথবা তিনি যদি তোমাদের প্রতি কৃপা করতে চান তবে কে এ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করতে পারে? আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন অভিভাবক বা কোনো সাহায্যকারীও খুঁজে পাবে না। (সুরা আহজাব: ১৭)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, এসব জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর আমার শাস্তি নেমে আসবে না? আর এসব জনপদের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, দুপুর বেলায় খেলাধুলায় মত্ত থাকা অবস্থায় তাদের উপর আমার শাস্তি নেমে আসবে না?

(সুরা আরাফ: ৯৯-১০০)।

তিঁনি কেন আজাব দেন?

মহান আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে কেন আজাব-গজব অবতীর্ণ করেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্নস্থানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে; কিন্তু আমরা তো উদাসীন! দিন দিন আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যেতে চলেছি। একটি বিষয় অনুধাবন করা উচিৎ যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক কেনো বার বার আজাবের কথা উল্লেখ করলেন? আবার আমরা যেন সকল প্রকার আজাব-গজব বা ব্যাধি থেকে রক্ষা পাই সেজন্য মহানবী (স.) আমাদের দোয়াও শিখিয়েছেন!

কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের শাস্তি ও অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেছেন যে:
"সুতরাং আমি তাদের উপর একের পর এক তুফান, পঙ্গপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি নিদর্শন পাঠিয়েছিলাম। তারপরও তারা অহংকার করে যেতে লাগল। বস্তুত তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। (সুরা আরাফ : আয়াত ১৩৩)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, অর্থ : তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা আশ্-শূরা, আয়াত: ৩০)

আরও ইরশাদ হয়েছে যে, অর্থ : "আর আপনার রব এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন অথচ তার অধিবাসীরা সৎকর্মে লিপ্ত রয়েছে।" (সূরা হুদ : ১১৭)
অন্যত্র মহান রাব্বুল আলামীন সতর্ক করে বলেছেন- অর্থ : "অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশমালা ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি প্রদত্ত বিষয়াদি নিয়ে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।"

(সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৪৪)

উপরের আয়াতে কারীমাগুলোর মূল বার্তা হলো, সমাজ বা দেশের বেশির ভাগ মানুষ যখন পাপ, ব্যাভিচার, অন্যায় এবং নিজ প্রভুকে ভুলতে বসে তখনই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তারা শাস্তির সম্মুখিন হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন- অর্থ :
"আর তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই তোমাদের উপর বিপদ নেমে আসে। অথচ তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে থাকেন।"

(সুরা আশ শুরা: ৩০)

১

নিচের হাদীসটি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন:

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

"(১) যখন কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি তারা সেগুলো প্রচার করতে থাকবে, তখন তাদের মধ্যে তাউন (প্লেগ) মহামারি দেখা দেবে এবং এমন সব ব্যাধি ও কষ্ট ছড়িয়ে পড়বে, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। (২) যখন কোনো সম্প্রদায় ওজন ও মাপে কম দেবে তখন তাদের উপর নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ, কঠিন পরিস্থিতি এবং শাসকের জুলুম-অত্যাচার। (৩) যখন কোনো জাতি তাদের সম্পদের জাকাত আদায় করবে না, তখন তাদের প্রতি আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি জন্তু-জানোয়ার না থাকত তাহলে বৃষ্টিপাত আর হতই না। (৪) আর যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তখন আল্লাহ তাদের উপর কোনো বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেবেন। (৫) যখন কোনো সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবে না, আর আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানসমূহের কিছু গ্রহণ করবে আর কিছু ত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তাদেরকে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিবাদে জড়িয়ে দেবেন।"

[হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে... সুনানে ইবনে মাজা (৪০১৯), মুস্তাদরাকে হাকিম (৮৬২৩), বাইহাকী রহ. কৃত শুআবুল ঈমান (৩৩১৫) ও আবু নুয়াইম রহ. কৃত হিলয়াতুল আউলিয়া (৮/৩৩৩) সহ প্রভৃতি গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহে]

এবার একটু মিলিয়ে দেখুন, উপরের কোন অপকর্ম বা অন্যায়টি আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক জীবনে এড়িয়ে চলেছি?

তাহলে কেনো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় রব্বুল আলামীনের আজাব আমাদের উপর পতিত হচ্ছে এ প্রশ্নের সুযোগ কোথায়? তাই আসুন, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আজাবের কারণগুলো নিয়ে একটু ভাবি। কমসেকম নিজস্ব পরিসরে অপরাধগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি।

২

মহামারি থেকে উত্তরণে অস্থায়ী কিছু প্রতিকার!

সামনের আলোচনায় স্থায়ী-অস্থায়ী দুই ধরণের প্রতিকারের কথাই বলা হয়েছে। কারণ কিছু কাজ এমন আছে যেগুলো শুধু এই ভাইরাসের সময়েই আমাদের করতে হবে, ভাইরাসটা চলে যাওয়ার পর সেগুলো না করলেও চলবে। "অস্থায়ী প্রতিকার" বলে তাই বোঝানো হচ্ছে।

একই সাথে কিছু কাজ এমন করতে হবে যেগুলো ভাইরাসটি চলে যাওয়ার পরও মৃত্যু অবধি করে যেতে হবে, যাতে করে পরবর্তীতে আর কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। সেগুলোকে আমরা এখানে "স্থায়ী প্রতিকার" হিসেবে উল্লেখ করছি।

মহান আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন "দারুল আসবাব" অর্থাৎ বস্তু-নির্ভর করে। তাই আগে আমরা বস্তু-নির্ভর; অস্থায়ী প্রতিকারগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে ভাইরাস সম্পর্কে কথাগুলো মনে রাখুন:

(১) ভাইরাসটি কাপড় বা কাপড়ের ছিদ্রে পড়ে থাকলে তিন ঘণ্টা বেঁচে থাকে।
(২) তামার বা কাঠের তৈরি কোনো জিনিসের উপর পড়ে থাকলে চারঘণ্টা বেঁচে থাকে।
(৪) হার্ডবোর্ডের উপর পড়ে থাকলে সর্বোচ্চ একদিন বেঁচে থাকে।
(৫) লৌহ জাতীয় জিনিসের উপর পড়ে থাকলে দুইদিন বেঁচে থাকে।
(৬) আর প্রায় দীর্ঘ তিনদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে প্লাস্টিকের যেকোনো বস্তুর উপর।

তাই উপরোক্ত বস্তুগুলো পরিষ্কারের জন্য যদি Feather/Duster ব্যবহার করেন তাহলে ভাইরাসের কণা বাতাসে ওড়বে এবং প্রায় তিন ঘণ্টা ভাসতে পারে, সাথে শ্বাসের প্রশ্বাসে নাকে-মুখে ঢুকে যেতেও পারে। তা ছাড়া বস্তুগুলোতে আপনি হাত দিলেও আক্রান্ত হতে পারেন। এজন্য ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিলে বস্তুগুলো দস্তানা বা গ্ল্যাবস্ দিয়ে স্পর্শ করুন।

ঠাণ্ডায় এই ভাইরাসের কণা বেশি সুরক্ষিত থাকে। যেমন- ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, বাসা-বাড়ি এবং গাড়িতে এসি ব্যবহারের ফলে। আবার এই ভাইরাস Molecule এবং আর্দ্রতাতেও সুরক্ষিত থাকে। যেমন- অন্ধকার। এজন্য শুকনো, গরম এবং আলোকিত স্থানে এবং ঘরবাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আলো আসতে দিলে এই ভাইরাস সহজে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই বাসাবাড়ি ও গাড়িতে এসি ব্যবহার না করি। বাসাবাড়ি অন্ধকার না রাখি। আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখি। যত বদ্ধ জায়গা তত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই খোলামেলা জায়গায় থাকা ভালো।

মনে রাখবেন, সুস্থ ত্বক (কোনো ক্ষত নেই এমন ত্বক) ভেদ করে ভাইরাস ঢুকতে পারে না। তাই নিজের চামড়ার ত্বক সুরক্ষিত রাখুন। আর যেহেতু তিনটি ইন্দ্রিয় তথা- ১/ নাক, ২/ মুখ, ৩/ চোখ' –এর মতো অঙ্গগুলো দিয়ে জীবাণু সহজেই বাতাসের মাধ্যমে বা নিজের হাতের মাধ্যমে মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে। তাই আসুন, এই তিনটি অঙ্গ স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া ছাড়া ভুলেও কখনো স্পর্শ না করি।

"মহামারি থেকে উত্তরের দশটি অস্থায়ী প্রতিকার"

(১) ঘরেই থাকুক, সেভ থাকুন, বাহিরে প্রয়োজন ছাড়া একদমই বের হবেন না। তবে ঘরের অন্যান্য সদস্যদের সাথেও নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলুন।
(২) প্রয়োজনে বের হতে হলে মাস্ক ব্যবহার করুন, তবে হ্যাঁ, মাস্ক অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে ভাইরাস প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে।এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দিকনির্দেশনাগুলো মেনে চলুন।
(৩) একাধিকবার একই মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, তিন লেয়ারের সার্জিক্যাল মাস্ক "আলট্রাভায়োলেট লাইট" (Ultra violet) দিয়ে পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করা যেতে পারে।
(৪) বাহির থেকে ঘরে ফেরার পর পোশাক ধুয়ে ফেলি বা না ঝেড়ে ঝুলিয়ে রাখি অন্তত চার ঘণ্টা। কারণ, যখন এই ভাইরাস শুধু কাপড়ের উপর পড়ে থাকে বা কাপড়ের ছিদ্রে পড়ে থাকে তখন তা তিন ঘণ্টার মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। তাই আপনি আপনার ব্যবহৃত কাপড়, বেডশিট কখনো ঝাঁকি দেবেন না। নতুবা ভাইরাস বাতাসে উড়ে যাবে। যে কাউকে আক্রান্ত করতে পারে।
(৫) প্লাস্টিকের তৈরি পিপিই একবার ব্যবহারের পর অবশ্যই ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে ধুয়ে, শুকিয়ে, তারপর ব্যবহার করা যেতে পারে।
(৬) কাপড়ের তৈরি পিপিই একাধিকবার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়মে পরিষ্কার করে ব্যবহার করি।
(যদি দ্বিতীয়বার ব্যবহারে বাধ্য হই, কেননা এগুলো একবার ব্যবহারের জন্য তৈরি)।
(৭) চুল সম্পূর্ণ ঢেকে যায়, এমন ক্যাপ ব্যবহার করি। কেননা যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে এই ভাইরাসের কণা বাতাসে উড়ে, আর আপনি তার পাশ দিয়ে যান, তো আপনার মাথায় (চুলে) তা আটকে থাকতে পারে। কারণ এই ভাইরাস প্রায় তিন ঘণ্টা বাতাসে ভাসতে পারে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাকে-মুখে ঢুকে যেতে পারে।
(৮) হাঁচি-কাশি যাদের আছে, তারা সরকার কর্তৃক প্রচারিত সব নিয়ম মেনে চলি। যেমন, হাঁচি দেওয়ার সময় রুমাল বা টিস্যুপেপার নাকে, মুখে চেপে ধরি, না থাকলে কমসেকম নিজের পরনের কাপড় দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে ফেলি।
(৯) এ ছাড়াও খাওয়ার জিনিস, তালা-চাবি, সুইচ, মাউস, রিমোট, মোবাইল-ফোন, ঘড়ি, কম্পিউটার ডেক্স, টিভি প্রভৃতি ধরার আগে এবং বাথরুম ব্যবহারের আগে ও পরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ২০ সেকেন্ড খুব ভালো করে দুই হাত ধুয়ে নিন। যাদের হাত শুকনো থাকে, তারা হাত ধোয়ার পর Moisture ব্যবহার করি। কেননা শুকনো হাতের Crackle (ফাটা অংশ)-এর ফাঁকে এই ভাইরাস থেকে যায়। তবে অতি ক্ষারযুক্ত সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
(১০) সবশেষ সেই পুরাতন উপদেশ। হাত-পায়ের নখ ছোটো করি। নিয়মিত কাটি ও ছোটো রাখি। কেননা নখের নিচেও ভাইরাস লুকিয়ে থাকতে পারে।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার সম্পর্কে দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও লক্ষণীয়

(১) ভোদকা (vodka) মদ-
অনেকে মনে করেন যে, এই মদটি খেলে বা ব্যবহার করলে স্যানিটিইজারের কাজ দেবে। আসলে কথা হলো ৬৫ শতাংশের বেশি মাত্রার অ্যালকোহলই ভাইরাসের চর্বির স্তর ভাঙতে সক্ষম। তাই যারা মনে করেন যে, ভোদকা (vodka) মদ দ্বারা স্যানিটাইজারের কাজ করবেন তাদের ধারণা ভুল! কারণ ভোদকা (vodka) মদ মাত্র ৪০ শতাংশ শক্তিশালী। এই মাত্রার মদ কোনো কাজে আসবে না। খেলেও কাজে আসবে না। অধিকন্তু খাদ্যনালীসহ পেটের সর্বনাশ করবে। এই মদ খাওয়া ভাইরাস চিকিৎসার উপায় না। একইভাবে "স্প্রিট"ও কার্যকরী নয়। এটি কোনো স্যানিটাইজার নয়। তবে অ্যালকোহল দিয়ে স্যানিটিইজার বানানোর যে প্রক্রিয়ার কথা শুনেছেন সেটা আর এটা অনেক ভিন্ন। সেখানে অ্যালকোহলের মাত্রা ৬৫ শতাংশের বেশি হতে হয় যা খাওয়া যায় না। কিন্তু তা হাত বা ত্বক পরিষ্কারে ব্যবহার করা যায়।

(২) ব্লিচিং পাউডার
একভাগ ব্লিচিং পাউডার এবং ৫ ভাগ পানির মিশ্রণ ভাইরাসের প্রোটিন অংশ ভাঙতে পারে। তাই স্যানিটিইজার হিসেবে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করলে পানির পরিমাণ পাউডারের চেয়ে ৫ ভাগ বেশি নেব।

(৩) অক্সিজেনেটেড পানি
এটি সাবান প্রকৃতির পানি। অ্যালকোহল এবং ক্লোরিনের মতোই কার্যকর। কিন্তু পিউর বা বিশুদ্ধ অক্সিজেনেটেড পানি ত্বকের ক্ষতি করে। তাই ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) ব্যাকটেরিয়ানাশক "এন্টিবায়োটিক" (Antibiotic)
করোনা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মতো জীবন্ত অনুজীব নয়। তাই এক্ষেত্রে কোনো এন্টিবায়োটিক কার্যকর নয়।

(৫) আলট্রাভায়োলেট লাইট (Ultra violet):
Ultra violet- লাইট ভাইরাসকে ভাঙতে পারে। কিন্তু এটি ত্বকের ক্ষতি করে। তাই Ultra violet লাইট দিয়ে মাস্ক (Musk) পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এটা ত্বকের জন্য নয়। কেননা এটি ব্যবহারে ত্বকে ভাঁজ পড়তে পারে বা ক্যান্সারও হতে পারে।

৩ মহামারি থেকে হেফাজতে থাকার কিছু স্থায়ী করণীয়!

এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিস্কার করতে পারেননি। তাই সতর্কতা ও সচেতনতার পাশাপাশি, কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আমলগুলো গুরুত্বের সাথে পালন করি। কারণ এ ধরণের বলা-মুসিবাত এবং মহামারি থেকে বেঁচে থাকার জন্য কুরআন-হাদীসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা চাহেন তো দোয়াগুলোর বরকতে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। তাই আমলের সুবিধার্থে দোয়াগুলো ৩ টি শিরোনামে বিন্যাস করা হলো :

(ক) যে দোয়াগুলো সকাল-সন্ধ্যা দুইবার পাঠ করব-[৫ টি]
(খ) যে দোয়াগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর পাঠ করব। [৫ টি]
(গ) যে দোয়াগুলো দিনের যে কোনো সময়ে পাঠ করে নিতে পারি। [৫ টি]

যে দোয়াগুলো সকাল-সন্ধ্যায় দুইবার পাঠ করব-[৫ টি]

১.
সকাল-সন্ধ্যা; ফজর ও মাগরিব নামাজের পর মুআব্বিজ অর্থাৎ কুরআন শরীফের শেষ তিন সুরা, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে শরীরে ফুঁ দেওয়া, বা হাতে ফুঁ দিয়ে পুরো শরীর হাত বুলিয়ে নেওয়া।

২.
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার এই দোয়া পাঠ করবে, সকাল হওয়া পর্যন্ত ওই ব্যক্তির উপর আকস্মিক কোনো বিপদ আসবে না। আর যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এ দোয়া পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোনো বিপদ আসবে না।, দোয়াটি হলো-

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিসসামায়ি, ওয়া হুয়াসসামিউল আলিম।

অর্থ : আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

৩.
প্রতিদিন অন্তত দুইবার সকাল-সন্ধ্যা এই আমলটি করব- সূরা ফাতিহা তিনবার, সূরা ইখলাস তিনবার, এবং নিম্নোক্ত দুআটি ৩১৩ বার পাঠ করব এবং পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করে নিতে পারি।

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

অর্থ : আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনি অতি উত্তম অভিভাবক।

(সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৭৩)

৪.
এ দুর্যোগের সময় সকল মুসলমানের উচিত, কুরআন উপলব্ধি করা। কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদের আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে ফিরিয়ে আনা। আর যেখানে মহা গ্রন্থ আল-কুরআন নিজেই সকল রোগের সুচিকিৎসা সেখানে তা অধ্যয়ন করা ও তার মর্ম উপলব্ধি করা এ করুণ পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে এরশাদ করেন- অর্থ, "আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করিছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।" (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত: ৮২)

৫. একটি পরীক্ষিত আমল

সম্ভব হলে সকাল-বিকেল আর তা না হলে কমসেকম প্রতিদিন একবার যে কোনো সময়ে নিজ পরিবারে সম্মিলিতভাবে সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবের তা'লীম করা। এটি একটি পরীক্ষিত আমল। নিকট অতীতে হিন্দুস্তানে এক মহামারি দেখা দেয়। তখন হযরত আশরাফ আলী থানবি রহ. এ মহামারি থেকে বাঁচার জন্য "নাশরুত তীব" নামে সীরাতগ্রন্থ লেখা শুরু করেন। এ সীরাতের বরকতে আল্লাহ তাআলা মহামারি উঠিয়ে নেন! নির্ভরযোগ্য সীরাতের কিতাব যেমন- সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদবি রহ. রচিত কিতাব 'নবীয়ে রহমাত' (বাংলা), মুফতী শফী রহ. কৃত 'সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া স.' (বাংলা।), সীরাতে মুস্তফা, মাও, ইদ্রীস কন্ধলবি রহ. কৃত, প্রভৃতি সীরাত গ্রন্থ অধ্যায়ন করতে পারেন।

যে দোয়াগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর পাঠ করব। [৫ টি]

(১)
প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি ও সাতবার সুরা ফাতেহা পড়ে নিজের উপর দম করা বা হাতে ফুঁ দিয়ে পুরো শরীর হাত বুলিয়ে নেওয়া। ঘুমানোর সময়ও আয়াতুল কুরসি পড়ে নিজেদের উপর দম করা।

(২)
اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরজু, ফালা তাকিলনি ইলা নাফসি ত্বারফাতা আইনিন, ওয়া আসলিহ লি শানি কুল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।
অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার রহমতেরই প্রত্যাশী আমি। তাই আপনি আমাকে আমার উপর ন্যস্ত করবেন না। আপনি আমার সকল বিষয় পরিশুদ্ধ করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।
(সহীহ হাদীস, আবু দাউদ শরীফ, মুসনাদে আহমাদ)

(৩)
حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.
উচ্চারণ : হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম।
অর্থ : আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর উপরই আমি ভরসা করছি। তিনি মহান আরশের রব।
(সহীহ হাদীস, আবু দাউদ শরীফ)

(৪) আমল-
اَللّٰهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফি দ্বীনি ওয়া দুনইয়ায়ি ওয়া আহলি ওয়া মালি।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাচ্ছি, আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদে।

(৫)
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া, ওয়াল আফিয়াতা ফিদ-দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।,
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্ত প্রার্থনা করছি।

যে দোয়াগুলো দিনের যে কোনো সময়ে পাঠ করে নিতে পারি। [৫ টি]

(১)
لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুবহানাকা ইন্নি কুংতু মিনাজ-জ্বালিমিন।,
অর্থ : (হে আল্লাহ!) আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী
(সূরা আম্বিয়া, ৮৭)

(২)
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযাম, ওয়ামিন সায়্যিইল আসক্বাম।
অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি শ্বেত রোগ থেকে আশ্রয় চাই। মাতাল হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় চাই। কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আর দূরারোগ্য ব্যাধি (যেগুলোর নাম জানিনা) থেকে আপনার আশ্রয় চাই।
(আবু দাউদ, তিরমিজি)

(৩)
اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইরফাআ’ আন্নাল বালা ওয়াল ওয়াবা।
অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর থেকে সকলপ্রকার রোগ, বালা-মুসিবত উঠিয়ে নেন।
।(মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৩০০৪)

(৪)
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَ الْأَعْمَالِ وَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আমালি ওয়াল আহওয়ায়ি, ওয়াল আদওয়ায়ি।,
অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ-বালাই থেকে আশ্রয় চাই।
(তিরমিজি)

(৫)
لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ.
উচ্চারণ : লা হাউলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি, লা মালজাআ ওয়া লা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি।
অর্থ : আল্লাহর তাওফিক ছাড়া পাপ পরিহার করা এবং নেক কাজ করার শক্তি নেই। তাঁর আশ্রয় ব্যতিত তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।
(সহীহ হাদীস, মুসনাদে বাযযার)

আরও লক্ষ্য করুন...

কুরআনের পাতায় পাতায় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা-

এ দুর্যোগে সুযোগ এসেছে কুরআনে কারীমকে উপলব্ধি করে নেওয়ার! এতেই আমাদের মূল প্রতিকার লুকায়িত আছে। মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

অর্থ: হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইরাদা পোষণ করো, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং পদযুগল গিটসহ [ধৌত করো]। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও [-অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল।] আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত: ৬)

এই আয়াতে মুসলমানাদের উপর অজু ফরজ করা হয়েছে, যা দৈনিক প্রয়োজনে পাঁচ করা আবশ্যক। স্ত্রী সহবাস বা বীরযপাত হলে গোসল করা আবশ্যক করা হয়েছে। যাতে আছে পবিত্রতার সাথে পরিচ্ছন্নতাও।

নবীজি স. হাদীস শরীফে কাযকরী হোম কোয়ারেন্টিংয়ের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন।

কোনো এলাকায় বা কোনো দেশে যদি কোনো মহামারি ছড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে মহানবী (স.)-এর নির্দেশ হলো, সেখানকার অধিবাসীরা যেন অন্যত্র না যায়, আর অন্য জায়গার অধিবাসীরা যেন সেখানে প্রবেশ না করে। যেমন হাদীসে পাকে এসেছে মহানবী (স.) বলেছেন- অর্থ : "যখন কোনো এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়ে তখন যদি তোমরা সেখানে থাকো তাহলে সেখান থেকে বের হবে না। আর যদি তোমরা বাইরে থাকো তাহলে তোমরা সেই আক্রান্ত এলাকায় যাবে না,

(বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ)।

তাই আমাদেরকে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কমাসকম ঘর থেকে বের না হই।

[কিন্তু গলদটা আগেই হয়ে গেল। করোনা আবিষ্কার হতে না হতেই প্রত্যেক প্রবাসীকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো]

এখনি সময় অবহেলিত সুন্নাতগুলোর উপর আমল শুরু করার-

সকলেই নামাজের আগে অজু করি, কিন্তু আমরা কি জানি, অজুর মধ্যে কয়টি ফরজ, কয়টি ওয়াজিব আর কয়টি সুন্নাত-মুস্তাহাব আছে? অনেকেই হয়তো জানি না, আর অনেকে জানি কিন্তু আমল করি না!

যথা অজুতে চারটি ফরজ তো আছেই ;মুখ ধোয়া, হাতের কনুই সহ ধোয়া, মাথা মাসেহ করা, দুই পায়ের গিট পযর্ন্ত ধোয়া। কিন্তু মুখ ধোয়ার সময়ে ভালো করে কুলি বা মুখগহ্বর তিনবার ধোয়া সুন্নত। তেমনি তিনবার নাকের নরম হাঁড় পর্যন্ত পানি দিয়ে পরিষ্কার করা এবং নাক ঝাড়া সুন্নত। হাত ধোয়ার সময়ে এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে অন্য হাতের আঙ্গুলের গোড়ায় গোড়ায় মলে নেওয়া সুন্নত। মাথা মাসেহ করার সময়ে কানের ভাঁজগুলোতে আদ্র আঙ্গুল দিয়ে মাসেহ বা পরিষ্কার করে নেওয়া সুন্নত। গর্দান মাসেহ করে নেয়া মুস্তাহাব, পা ধোয়ার সময়ে পায়ের আঙ্গুলগুলোর ফাঁকে হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া সুন্নত। এগুলো সুন্নত- মুস্তাহাব হিসেবে করলে যেমন সাওয়াবের ভাগিদার হওয়া যায়, তেমনি জীবাণু থেকে সুরক্ষাও।

এমনিভাবে খাবার গ্রহণ করার আগে ও পরে দুই হাত যে খুব ভালো করে ধোয়া নবীজি স. এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, তা আমরা কয়জন জানি! অথচ এটা আমরা এখন জীবন বাঁচানোর জন্য জেনে হোক, বা না জেনে, সবাই করছি!

তাই আসুন এখনি সময় "ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ" করার। যে কাজগুলো আমরা বিপদের সময় না জেনেও করছি, সে কাজগুলো বিপদ আসার আগেই জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য করি। এতেই দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র সফলতা নিহিত রয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ, তা হলো-

বেশি বেশি ইস্তেগফার করা তথা আল্লাহর কাছে নিজ গোনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- অর্থ : " (হে নবী!) আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, আপনি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এমনও নন যে, তারা ইস্তিগফারে রত থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন।"

(সূরা আনফাল : আয়াত: ৩৩)

মহান আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন- অর্থ :

"হে নবী! আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, বলোতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

(সূরা আল আনআম, আয়াত: ৪০)

আরও ইরশাদ করেন-

অর্থ, "বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্যে তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূর করে দেন। [কিন্তু তার সাথে] যাদের অংশীদার করছ, তখন তো তাদের ভুলে যাবে।"

(সূরা আল আনআম, আয়াত: ৪১)

অন্যত্র ইরশাদ করেন- অর্থ:

"আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে।"

(সূরা আল আনআম, আয়াত: ৪২)

অন্যত্র আরও ইরশাদ করেন- অর্থ: "অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আজাব এল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুত তাদের অন্তর পাথর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে পাপে তারা লিপ্ত।"

(সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৪৩)

পরিশেষে বলবো, আসুন... এই বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস, আমাদের মহান রাব্বুল আলামীনের দিকে ফিরে আসার একটি বড়ো উপলক্ষ্য হোক! নিজের অতীতের গুনাহগুলো স্বরণ করে বারবার তাওবা করি, এটাই এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আমল, এরপর বেঁচে থাকলেও ফায়দা আর মরে গেলেও ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ উত্তম মাকাম দেবেন।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

এ সময় নিজেকে এবং নিজের পরিবার, স্বজনদের রক্ষা করতে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনার ভূমিকা কী হওয়া উচিত? কীভাবে আপনি পারবেন এই ভাইরাস প্রতিরোধ করতে? "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা" ও সকল সংক্রমিত দেশের সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে কিছু উপদেশ দিচ্ছে। আসুন, জেনে নেওয়া যাক।
তবে হ্যাঁ! ৫% রোগী এমন আছেন যাঁদের অবস্থা মুমুর্ষ এবং ১৫% রোগী এমন আছেন যাঁদের প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট ও জ্বর হয়েছে, এই দুই শ্রেণীর রোগী ছাড়া, ৮০% রোগী যাঁদের মধ্যে করোনার প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে বা মাত্র আক্রান্ত হয়েছেন, এমন রোগীদের জন্যই মূলত এই কয়েকটি টিপস... মহান রাব্বুল আলামীন যদি চান তো এই সতর্কতা ও আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস থাকার কারণে করোনার এই মহা-ছোবল থেকে রক্ষা দান করবেন।

৪ কোনো এলাকা করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেলে সেখানকার অধিবাসীদের জন্য বিশেষ করণীয়সমূহ।

(১) বারবার হাত ধোয়া-
ভালো করে বারবার হাত ধোয়ে নিন। (অন্তত ২০ সেকেন্ড যাবৎ)। কেন?
-এ কথা প্রমাণিত যে সাবান–পানি দিয়ে ভালো করে হাত ধুলে এই ভাইরাসটি হাত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হাতে ময়লা বা নোংরা দেখা না গেলেও বারবার হাত ধুতে পারেন। তবে বিশেষ করে হাত ধোবেন অসুস্থ ব্যক্তির পরিচর্যার পর, হাঁচি–কাশি দেওয়ার পর, খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে, টয়লেট ব্যবহারের পর, পশুপাখির পরিচর্যার পর।

(২) দূরে থাকুন-
এই সময় যেকোনো সর্দি–কাশি, জ্বর বা অসুস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে অন্তত এক মিটার বা ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন। কেন?
-কারণ সব ফ্লুর মতোই এই রোগও কাশির ক্ষুদ্র ড্রপলেট বা কণার মাধ্যমে অন্যকে সংক্রমিত করে। তাই যিনি কাশছেন, তাঁর থেকে দূরে থাকাই ভালো। অসুস্থ পশুপাখি থেকেও দূরে থাকুন।

(৩) নাক–মুখ স্পর্শ নয়-
হাত দিয়ে আমরা সারা দিন নানা কিছু স্পর্শ করি। তো যে কোনো বস্তু থেকে ভাইরাস হাতে লেগে যেতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন। অপরিষ্কার হাত দিয়ে কখনো নাক–মুখ–চোখ স্পর্শ করবেন না।

(৪) কাশির আদবকেতা মেনে চলুন-
নিজে কাশির আদবকেতা বা রেসপিরেটরি হাইজিন মেনে চলুন, অন্যকেও উৎসাহিত করুন। কাশি বা হাঁচি দেওয়ার সময় নাক এবং মুখে রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করুন। কমাসকম কনুই দিয়ে আড় সৃষ্টি করুন, টিস্যু ব্যবহার করে টিস্যুটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন।

(৫) ঘরে থাকুন-
অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন, বাইরে যাওয়া অত্যাবশ্যক হলে (নাক-মুখ ঢাকার জন্য) মাস্ক ব্যবহার করুন।

(৬) খাবারের ক্ষেত্রে সাবধানতা-
কাঁচা মাছ–গোস্ত আর রান্না করা খাবারের জন্য আলাদা চপিং বোর্ড, ছুরি ব্যবহার করুন। কাঁচা মাছ–মাংস ধরার পর ভালো করে সাবান–পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। ভালো করে সেদ্ধ করে রান্না করা খাবার গ্রহণ করুন। অসুস্থ প্রাণী কোনোমতেই খাওয়া যাবে না। সব সময় গরম পানি, গরম দুধ ও গরম চা পান করুন।

(৭) ভ্রমণে সতর্ক থাকুন-
জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং অন্য দেশ থেকে প্রয়োজন ছাড়া দেশে আসতে নিরুৎসাহিত করুন। অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

(৮) অভ্যর্থনায় সতর্কতা-
কারও সঙ্গে হাত মেলানো (হ্যান্ড শেক), কোলাকুলি থেকে বিরত থাকুন। এসময়ে কাউকে দাওয়াত দিবেন না, নিবেনও না।

(৯) স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য নিন-
এ সময়ে কোনো কারণে একটু বেশিই অসুস্থ বোধ করলে, জ্বর হলে, কাশি বা শ্বাসকষ্ট হলে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য নিন। তিনি বিষয়টি গোচরে আনতে ও ভাইরাস ছড়ানো বন্ধে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

(১০) সঠিক তথ্য জানুন-
সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেতে নিজেকে আপডেট রাখুন। গুজবে কান দেবেন না। আপনার স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসকের কাছেই তথ্য জানতে চান। আর খুব বেশি জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, মাংসপেশি ও গাঁটে ব্যথাসহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

করোনা আক্রান্ত মুমিন ভাইয়ের প্রতি...

দেখুন, এই রোগটির ব্যাপারে অভিজ্ঞতায় এটাই জানা যায় যে, এই রোগে আক্রান্ত হলে বাঁচতেও পারে আবার মারাও যেতে পারে! তার মানে আক্রান্ত ব্যক্তি এ সময়ে এমন অবস্থায় থাকেন যে, তার অর্ধেক জীবিত আর অর্ধেক মৃত! প্রিয় নবীজি স. মৃত্যুর আগে মৃত্যুর ভান করে মৃত্যুকে উপলব্ধি করতে বলেছেন। তেমনি এক অবস্থা এটি।
তাই আসুন, মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে দেখি যে, মৃত্যুর উপলব্ধিটা কেমন! আর খুব চেষ্টা করি এই কঠিন সময়ে শয়তানের ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচানোর। কারণ শয়তান একজন মানুষকে তার জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করার পাঁয়তারা করতে থাকে, আর তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশেষ সুযোগ হলো, মানুষের মৃত্যুর আগের সময়টা। কারণ দুনিয়াতে যদি একবার কোনোভাবে সে সফল হতে পারে, তাহলে চিরদিনের জন্য হতে হবে জাহান্নামি! -নায়ুজুবিল্লাহ- তাই বেশি বেশি তাওবা ইস্তিগফার করি। সাথে উপরের মেডেকেল সাবধানতাসমূহ তো মেনে চলবই। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন। আমীন।

নিচের বিষয়গুলো একটু লক্ষ্য করি।

(১) ইসলাম সব বিষয়ই মধ্যপন্থা শিক্ষা দেয়। মহামারির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা হলো, হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছেয যে,- অর্থ : যখন কোনো এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, তখন যদি তোমরা সেখানে থাকো তাহলে সেখান থেকে বের হবে না। আর যদি বাইরে থাকো তাহলে সেই আক্রান্ত এলাকায় যাবে না।, (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)।
এই হলো রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। কারণ না খুঁজে প্রথমে তার নির্দেশ পালন করাই মুসলমানের বৈশিষ্ট। করোনাভাইরাস আক্রান্ত এলাকার মানুষের জন্য এ বিধান। ভাইরাস আক্রান্ত এলাকা থেকে যেমন কেউ পালিয়ে অন্যত্র যাবে না তেমনি বাহির থেকেও আক্রান্ত এলাকায় যাওয়া ঠিক নয়।
ওলামায়ে কেরাম বলেছেন- "যদি মহামারি আক্রান্ত এলাকার লোকজন পলায়ন করে অন্যত্র চলে যায়, তবে যারা মহামারিতে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সেবা-শুশ্রূষা কে করবে? সম্পদশালী ব্যক্তিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও গরিব অসহায় ব্যক্তিরা তো পালাতে সক্ষম হবে না। আবার কেউ যদি নিজে এখনও আক্রান্ত হয়নি ভেবে এলাকা থেকে বের হয়ে অন্য এলাকায় চলে যায়। দেখা যায় যে, তার অজান্তেই সে আক্রান্ত পড়েছিল, এখন যেখানে গেছে সেখানেও ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ল। নিজেতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেই, অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত ফেলল। সূতরাং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের উপর আমল করাই সবার জন্য কল্যাণকর।
(২) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মুহূর্তে উম্মতকে সান্ত্বনা দিতেন।
হাদীসে পাকে এসেছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামারি আল্লাহ তাআলার একটি শাস্তি। তবে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রহমত। (বুখারি শরিফ)
এটি একটি সাত্বনাবাণী। এর অর্থ এই নয় যে, সাবধানতা অবলম্বন করব না। যারা মাহামারির ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করবে, তাদের জন্য এটি আল্লাহর রহমতে পরিণত হবে। কেননা তারা আল্লাহর ফয়সালাকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে।
(৩) কোনো অঞ্চলে মহামারি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে না যেয়ে ধৈর্যধারণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকা। যারা না পালিয়ে ধৈর্যধারণ করে অবস্থান করবে, যদি তারা সেখানে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারাও যায়, এটি হবে তার জন্য শহীদি মৃত্যু।
আর মহামারি এলাকা থেকে যে পালিয়ে আসবে তাকে জিহাদ থেকে পলায়নকারীর মতোই গণ্য করা হবে। যুদ্ধের ময়দান থেকে নিজেদের সঙ্গী-সাথিদের সহযোগিতা না করে পলায়ন করাকে হাদীসে যেমন কবিরা গোনাহ আখ্যা দেয়া হয়েছে তেমনি কুরআনে কারীমে জিহাদ থেকে পলায়নকারীকে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হওয়ার ধমকি শোনানো হয়েছে। তাই মহামারি আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করা জিহাদ থেকে পলায়ন করার মতোই।
(৪) এ বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত মানুষের জীবনে আসবেই। মুসলিম-অমুসলিম সবার জীবনেই আসে। তবে বিপদাপদে মুমিনের শানই আলাদা। হাদীসে পাকে প্রিয় নবী স. সে কথা এভাবে ঘোষণা করেছেন- অর্থ : "মুমিনের অবস্থা বড়ই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর। আর এটি শুধু মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য, অন্য কারো নয়। সুখ-সচ্ছলতায় মুমিন শোকর আদায় করে; যা তার জন্য কল্যাণ হয়। আবার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণ করে। এটিও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।
(মুসলিম শরীফ, সহীহ ইবনে হিব্বান)
(৫) মানুষ যখন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তখন মানুষের অস্থিরতা বেড়ে যায়, সে আর শৃঙ্খলায় থাকতে পারে না। তার হৃদয় তখন হারিয়ে যায় এক অন্ধকার গহ্বরে, অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে তার হৃদয়ের সকল অন্ধকার দূরিভূত হতে থাকে, কারণ তখন সে আলোর কদর বুঝতে পারে, তবে তাকে সেই আতঙ্ক থেকে তো ফেরানো সম্ভব হয় না, কিন্তু এই যে আলোর কদর সে বুঝেছে, এটাকেই কাজে লাগিয়ে, এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে, বেশি জরুরি হলো, আলো-অন্ধকারের সত্তা, রোগ-প্রতিকারের সত্তা, সেই আসমান-জমিনের সত্তা... তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করা । নিজের সকল পাপের জন্য আকুতি-মিনতি করে মাফ চাওয়া। সাথে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা।

বসন্তের আগমনে, মালীর সাথে তার বাগানে...

দারুল উলূম দেওবন্দের ফুল পরিচর্যাকারীদের প্রধান, মালী মুহাম্মাদ ওয়াকীল ভাই। দেখতে একজন সাদামাটা মানুষ। পাঞ্জাবি-পায়জামা ও টুপি-রুমাল তার নিত্য সঙ্গি। দারুল উলূমে ৪/৫টি বড় বাগান রয়েছে। ৩২ জন কর্মচারী সারাদিন বাগানের পরিচর্যা করে যায়। তিনি তাদেরকে মাতিয়ে রাখছেন। দেখাশোনা করছেন। দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। সারাদিন দারুল উলূমের মাঠে বিচরণ করাই তার পেশা ও নেশা। মালী হিসেবে বাগান ও ফুল-পরিচর্যায় তিনি সাধ্যের শেষটুকু ব্যয় করেন। দেখতে সূফী এই ব্যক্তি ভেতরে ভেতরে দারুণ অভিজ্ঞ। বেশ তীক্ষ্ণচোখী। ছাত্রদের দেখেই দিব্যি বলে দিতে পারেন কার হালচাল কেমন? সাথে বড্ড রসিকও। সুফী-সূরত মালির সাথে তারই বাগানে শীতের এক রদ্দুর দুপুরে উলফত আড্ডায় জমে।

ইফতিখারুল হক খাইরের সঞ্চালনায় মালীর আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন উলফত সম্পাদকও।

আড্ডার সম্প্রচার হিসেবে সাক্ষাৎকারের চম্বুকাংশ উলফত বন্ধুদের সমীপে পেশ করা হলো-

বি.দ্র. : উলফতের প্রিন্ট সংস্করণে ফুলগুলো কালো দেখাচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত। উলফতের সামার্থ্য থাকলে অবশ্যই আমরা চার কালারে ছেপে দিতাম। প্রকৃত দৃশ্য উপভোগ করার জন্য অনলাইন সংস্করণ পড়ার অনুরোধ থাকল।

উলফত: আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

মালী: ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

উলফত: আপনার পরিচয়?

মালী: আমার নাম মুহাম্মাদ ওয়াকীল। দেওবন্দের মহল্লা খানকায় আমার নিবাস। দারুল উলূমের বাগান বিভাগের খিদমতে আছি। আপনাদের পত্রিকার নাম?

উলফত: "উলফত"।দারুল উলূমের যেকোনো বাঙালি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেই পত্রিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মালী: আপনাদের পত্রিকা কি বাঙ্গাল থেকেই ছাপে?

উলফত: না, দারুল উলূমের বাঙালী ছাত্রদের পক্ষ থেকে দেওবন্দেই ছাপে। তো, আপনি দারুল উলূমের চমন-বন্দী বিভাগে কখন নিয়োগ পেয়েছেন?

মালী: (একটু হেসে) অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে আমার নিয়োগ হয়নি। তবে আল্লাহর শোকর, আঠারো বছর যাবত খিদমত করে যাচ্ছি। দারুল উলূমও দৈনিক ওযিফা স্বরূপ তিনশ' ষাট রুপি আমার খাতায় যোগ করে যাচ্ছে।

উলফত: আপনার জানা মতে দারুল উলূমে বাগান - বিভাগ কখন থেকে আরম্ভ হয়েছে?

মালী: আমি আসারও বেশ কয়েক বছর আগ থেকে বাগান বিভাগের কার্যক্রম চলে আসছে।

গোল্ডেন বোতল ব্রুস। বাগানের চৌহদ্দিতে ঝুপড়ে থাকে। মৃদু বাতাস সরবরাহ করে

যরবরাহ। দেখো, সূর্যমুখি নয় কিন্তু! অন্য কিসিমের ফুল!

গোলাপের বাহার

উলফত: বর্তমানে কয় প্রকারের ফুল লাগানো আছে?

মালী: প্রায় দশ-বারো প্রকারের ফুল লাগানো আছে। আবার প্রতি একেক প্রকার ফুলের বিভিন্ন ধরণ আছে। যেমন: গোলাপের মধ্যেই ছয়-সাত ধরণের ফুল আছে।

উলফত: এবার একটু বিচরণ করে বিভিন্ন প্রকার ফুলের সাথে পরিচিত হতে চাচ্ছি।

মালি: হাঁ, নিশ্চয়ই। চলুন।

উলফত: প্রত্যেকটির নাম জানতে চাইব। এই যে দেখতে গালিচার মতো ফুলটির নাম কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

মালী: শুদ্ধ ভাষায় এটি "গুলে কুলঘা।" আমাদের ভাষায় এটাকে "মখমলী" বা "মুরগে ওয়ালা" (বাংলায় মখমল) ফুল বলা হয়। তারপাশে দেখছেন সাদা গোলাপ। এটার নাম সদা বাহার। পাশে ছোট ছোট জেন্টস। এরপর গেন্দাফুল তো চেনেনই। এটা হচ্ছে গুলে-দাউদী (চন্দ্রমল্লিকা)। আরেকটু বাঁয়ে আছে যরবরাহ। এরপর আছে বেগল (কাঠগোলাপ)। এখানে বড়ো করে ফুটে আছে লাল গোলাপ। এখানে একসাথে আছে ড্যায়লা ও সূরজমুখী (সূর্যমুখি)। এই যে মাঝখানে ফাইকস। পাশে আছে বেশ কয়েকটা হাইব্রিড কোপি। এটাও গুলে দাউদী (চন্দ্রমল্লিকা) হলুদটা। দেখতে প্রায় সূর্যমুখির মতো।

উলফত: মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটি গাছও দেখতে পাছি। এগুলোও কি ফুলগাছ?

মালী: না, এগুলো গাছই। তবে সৌন্দর্যবর্ধক হিসেবে লাগানো হয়েছে। এই যে এটার নাম গোল্ডেন বোতল ব্রুস। আর ড্রেসিনা দুধরণের হয়, একটা ঘন ও হলদেটে। অপরটি হালকা

তার রূপের শেষ নেই!
১. সাদা গোলাপ, ২. লাল গোলাপ, হলদে গোলাপ, ৪. গোলাপি

ড্যায়লা।চব্বিশ ঘন্টা কেবল হাসে

গুলে কুলঘা বা মখমল।গম্ভীর মুখে মুচকি হাসি।
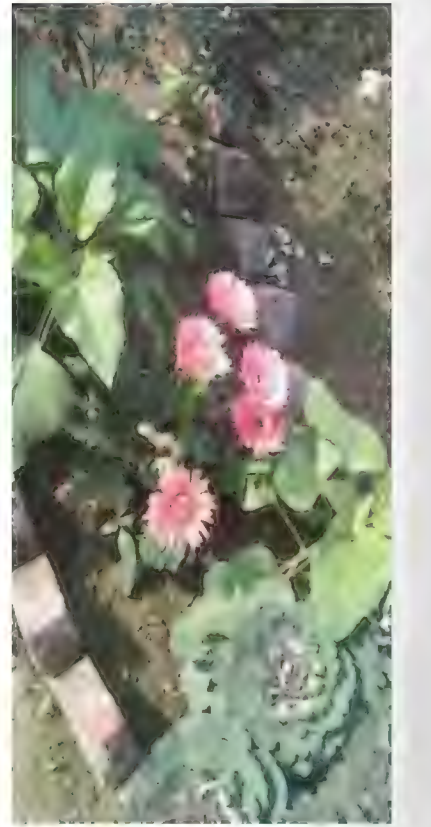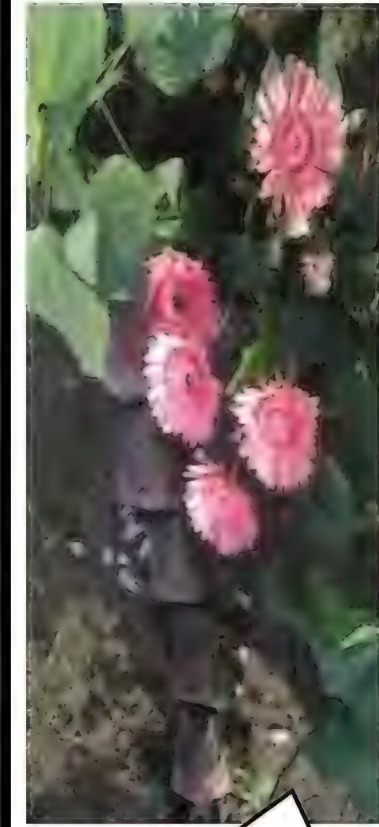
ফাইকস ফুল। দেখতে সূর্যমুখি, তবে রঙে গোলপী!

গুলে দাউদী (চন্দ্রমল্লিকা)
গোলাপের মত নানান রঙের হয়!

জেন্টস।দেখতে ঘাসফুলের মত, কচকচে বেগুণী, কানের দুল হিসেবে ভালো মানাবে।
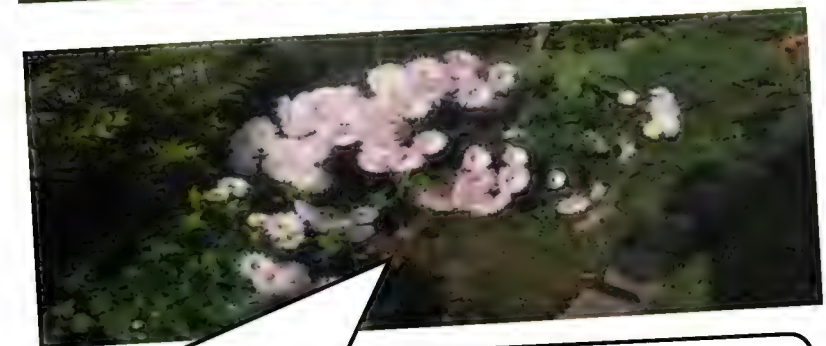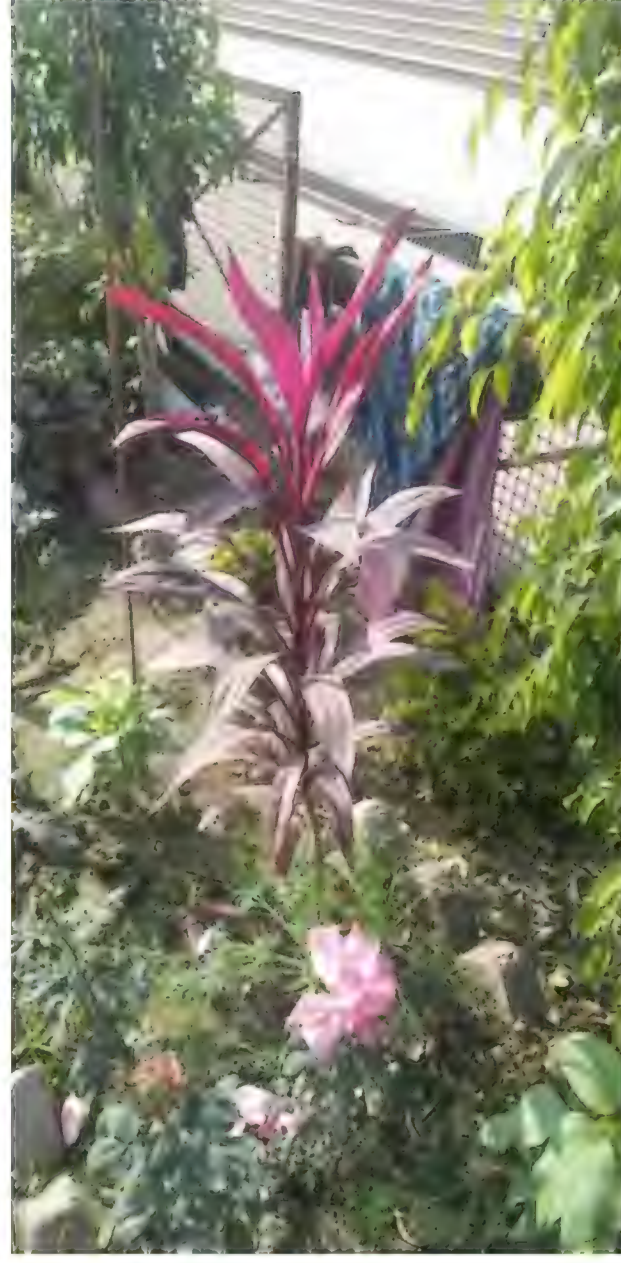
দুজাতের ড্রেসিনা, লাল ও হলদে।গাছটাই যেন একটি ফুল!

উলফত: আপনার আগমনকালে বাগান বিভাগের কী অবস্থা ছিল এবং বর্তমানে কতটুকু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়?

মালী: দারুল উলূমের বাগান বিভাগ আগ থেকেই উন্নত ছিল। কারণ, বাগান বিভাগের দায়িত্বশীলরা সবাই যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। প্রথমে পরিচিতমুখ নাসীম শেখ সাহেবের বড় ছেলে মৌলভী জমির খান সাহেবের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যিনি বর্তমানে শিক্ষা সচিবালয়ে কর্মরত আছেন। দ্বিতীয়ত মৌলভী ওমর ফারুক সাহেবের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনিও ভালোভাবে চালিয়ে গেছেন। বর্তমানে বিভাগটি আমাদের মুনশি আশফাক সাহেবের নিয়ন্ত্রণে আছে। তিনিও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখাশোনা করে যাচ্ছেন, যা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আশা করি, এখন বাগানে বসে আপনারা আরাম পাচ্ছেন।

উলফত: জী, যথেষ্ট আরাম উপভোগ করছি। তো, এখানে রোপনকৃত সব চারা-ই কি দেশীয়? আর চারাগুলো কীভাবে সংগ্রহ করেন?

মালী: হাঁ, এ পর্যন্ত রোপনকৃত সব চারা-ই দেশীয়। আমাদের যখনই কোন সরঞ্জাম বা চারার প্রয়োজন পড়ে, আমরা দারুল উলূমকে লিখিত আকারে তা জানাই। আবার কিছু চারা নিজেরাই জোগাড় করি। দারুল উলূম সবরকম সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে।

উলফত: এই বছর দারুল উলূমের বাগান বিভাগে কয়জন কর্মকর্তা কাজ করে যাচ্ছেন?

মালী: ৩২ জন। তন্মধ্যে অধিকাংশ পরিষ্কারের কাজ করে। কয়েকজন গাছের পাতা কেটে সমান করে। আর আমারা দুজন আছি ফুলের দিকটা দেখাশোনা করি।

উলফত: দারুল উলূমের বাগানের বার্ষিক বাজেট কত? যদি আপনার জানা থাকে...।

মালী: বার্ষিক বাজেট বলতে ফুল গাছের জন্য তো খুব বেশি নয়। পনের থেকে বিশ হাজার রুপি [কর্মাচারী বেতন, উপকরণ, পানিসিঞ্চন ইত্যাদি ভিন্ন খাত তেকে দেওয়া হয়।]

উলফত: বাগান বিভাগের আগামী পরিকল্পনা কী?

মালী: বাগানগুলোতে কিছু চারা রোপণ করেছি। বর্ষাকালে এগুলো থেকে ফুল ফুটবে। আর দারে জাদীদ বাঁয়ের দালানের সামনে বাগান নির্মাণ ও ফুলচারা রোপণের কাজ আজকেই শুরু করলাম। এরপর লাইব্রেরীর সামনেও একটি বৃহৎ বাগান তৈরির ইচ্ছা আছে। বাকি দারুল উলূম যেভাবে কাজ নেয়, আমরা সেভাবেই করতে প্রস্তুত।

উলফত: বর্ষাকালের কথা বলতেই একটা প্রশ্ন মাথায় আসল। কোন মৌসুমে কোন ফুল বেশি হয়?

মালী: শীত ও গ্রীষ্মের ফুল প্রায় বরাবর। তবে গ্রীষ্মের তুলনায় শীতে ফুল একটু বেশি ফোটে। অর্থাৎ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চে। ছাত্ররাও শীতের দুপুরে বাগানে এসে বসে। আমাদেরও কাজ করতে তেমন একটা ক্লেশ পোহাতে হয় না। অন্যদিকে গ্রীষ্মে বাগানের প্রতি ছাত্রদের যেমন অনুভূতি থাকে না, আমরাও প্রশান্তচিত্তে কাজে মন বসাতে পারি না।আর বর্ষায় বিশেষ কিছু ফুল আসে, বর্ষায় অন্য ফুল ধুয়ে গেলেও সেই ফুলগুলোর খাদ্যই বর্ষার বৃষ্টি।

উলফত: আপনার সাথে আড্ডা দিয়ে বেশ ভালো লাগছে। এগুলো স্বর্গরূপি কাজ। আপনাদের কাজ আরও সুদূর এগিয়ে যাক।

মালী: আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন।

উলফত: দীর্ঘক্ষণ সময় দেয়ায় আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিছু মনে না করলে, এতে কিছু রসগোল্লা আছে...এই সামান্য তোহফা...

দুধরণে হাইব্রিট কপি। ফুলের ভূমিকায় বাগানকে বেশ মাতিয়ে রাখে।

বিদায় ২০১৯ ঈসায়ি। ২০২০-এর আগমন করেছে আজ তিন মাস পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে নানান ঝক্কি-ঝামেলায় "পাক্ষিক উলফত" প্রকাশিত হতে পারেনি। কিন্তু **উলফত-ডায়েরি ১৯**-এর এমন কিছু লেখা অপ্রকাশিত থেকে যায়, যেগুলোতে রয়েছে বিজয়ের ভাবনা, প্রাপ্তির উন্মাদনা, আছে আবেগের স্মৃতি, রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তি, স্বপ্ন ও অনুযোগ।

- **দেওবন্দে বেইমেলা, অকল্পনীয় হলেও বাস্তব!**

এক সময়ের সাড়া জাগানো ও বাংলা ইসলামি সাহিত্যে সমীহ আদায়কারী বাংলা একাডেমি এভাবেই ধুঁকে ধুঁকে অন্তিম ক্ষণের দিকে নীরবে অগ্রসর হচ্ছিল। অচিরেই হয়তো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে নবীন প্রজন্মের কাছে বিস্মৃত থেকে যেত সে। এবং বাংলা ইসলামি বইয়ের পাঠকশ্রেণি এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারিয়ে ফেলত। কিন্তু না। উলফাত পরিবারের কল্যাণে একাডেমি আবার নতুন উদ্যম পেল। নতুন ভাবে আবার সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। তার অসম্পূর্ণ কাজকে নিয়ে সে আবার ভাবার সুযোগ পেল।

- **হায়, আমাদের শিক্ষা বিপ্লব!**

ভারতে মুসলমানদের শাসন ছিল আটশ বছর। দুর্ভাগা আমরা। আমাদের পূর্বসূরিগণ উচ্চ শিক্ষার চিন্তা মাথায় আনতে পারেননি। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন তাঁদের গৌরবগাথা। তাঁরা শশব্যস্ত ছিলেন স্থাপত্য প্রতিষ্ঠায়। প্রতিষ্ঠা করেছেন তাজমহল, লালকেল্লা, কুতুব মিনার, আগ্রা ফোর্ট আরও কত কিছু। যা গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে বটে। দিক দিগন্তের মানুষ জড়ো হয় এখানে মজা নিতে। নষ্টামি করতে। অভিনয় করতে। ভারতবাসী এসব আশ্চর্য স্থাপত্য নিয়ে গর্বিত ও গৌরবান্বিত।
এসবের পরিবর্তে যদি বিশ্বমানের শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করত । তাহলে বিশ্ব সভ্য সমাজের বাহবাও কুড়াত।

- **স্মৃতি রোমন্থন ২০১৯**

তবে বিশেষ কিছু স্মৃতির তালিকায় রয়েছে দারুল ইফতার দরস, প্রিয় শাইখ হযরতুল ওস্তাদ মুফতি মুসআব কাসিমি দা. বা. এর স্নেহময়ী আচরণ, দারুল উলূমের সু-সজ্জিত ও বিন্যস্ত মাকতাবা পরিদর্শন এবং তথ্য সংগ্রহ, মাকতাবায় সংরক্ষিত পান্ডুলিপি চর্চা, প্রিয় শায়খ পালনপুরী সাহেবের ইলমি মজলিস, পাক্ষিক উলফত, উলফত সাহিত্যাসর, উলফত বইমেলা, আরও কত কিছু...

- **আমার বাসনা পূর্ণ হলো**

প্রথমত: এই উর্দু মহলে আসার পর মনে হলো যে, কেউ যেনো আমার একটি মূল্যবান বস্তু ছিনতাই করে নিচ্ছে । আর সেটি ছিল মাতৃভাষা। **দ্বিতীয়ত:** অনেক বাঙালিকে এই উর্দু মহলে নিজের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার করুন পরিস্থিতি আমাকে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হতে প্রেরণা যুগিয়েছে, তো সাহিত্য চর্চার বহু দিনের তৃষ্ণা মেটাতে একা একা ভাবতাম।উপায় খোঁজতে থাকতাম। দীর্ঘ চার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আল্লাহর কি লীলা! একেবারে শেষ বর্ষে, দীর্ঘ দিনের মনঃবাসনা পূর্ণতার পথ খোঁজে পেল।

- **মেরি মাম্মি, মেরি মাম্মি...**

কথাগুলো মনে পড়ছিল। হঠাৎ কানে ভাসে ক্রন্দন মিশ্রিত নীচু আওয়াজের খিচিমিচি এক চিৎকার। "মেরি মাম্মি, মেরি মাম্মি...।" চেয়ে দেখি, একটি ছেলে মা-কে জড়িয়ে ধরে আনন্দে লাফিয়ে উঠছে। আর অন্যজনের চোখ থেকে ঈর্শা ও ক্রোধ মিশ্রিত অশ্রু ঝরছে। ক্ষণিকের জন্য মায়ের আঁচল তার উপর ছিল না বলে। দৃশ্যটি দেখে কী যে ভালো লাগল; বলে বোঝাবার নয়। সব শিশুরাই মা-বাবাকে এমনই চায়। কিন্তু বড়ো হয়ে....!! বড়ো হয়ে অনেকের ক্ষেত্রে কেন চিত্রটি বদলে যায়?

দেওবন্দে বেইমেলা, অকল্পনীয় হলেও বাস্তব!

দেওবন্দে বাংলা বই মেলা! অত্যাশ্চর্য, অকল্পনীয় বা অসম্ভব মনে হলেও এখন এটাই বাস্তব। আর এই অকল্পনীয় বা অসম্ভব বিষয়টাকে বাস্তব ও সম্ভব করে তুলেছে উলফত পরিবার। নিঃসন্দেহে এটি একটি মাইলফলক। উর্দু-হিন্দির পরিমণ্ডলে বাঙালি পাঠকবৃন্দের জন্য এক মহা আশীর্বাদ। দেওবন্দের বুকে অনুষ্ঠিত প্রথম বাংলা বইমেলা যে, এতটা সফল হবে তা সকলেরই কল্পনাতীত ছিল। মেলাকে কেন্দ্র করে বইপ্রেমীদের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। স্বল্প পরিসরে আয়োজিত দু' দিনের এই বইমেলায় ক্রেতাদের ভিড় অনেক আশার গল্প শুনিয়ে গেল।

দেওবন্দে বাঙালি পাঠকের সংখ্যা অনায়াসে দু ' হাজার ছাড়িয়ে যাবে। বাংলা ইসলামিক একাডেমি নামে এখানে প্রায় চার দশকের একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী একজন আদ্যোপান্ত অবাঙালি হলেও বাংলা ভাষার প্রতি তার একটা আলাদা টান আছে। সে কারণেই লক্ষ লক্ষ টাকার বাংলা বইয়ের উপর পুরু ধুলা জমতে থাকলেও তিনি কখনও এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার কথা ভাবেননি। নিকট অতীতে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু স্মরণীয় কার্যকলাপ আঞ্জাম দিয়েছে উর্দু-হিন্দি বলয়ে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমি। মাআরিফুল কুরআনের মতো বিস্তৃত কলেবরের গ্রন্থের মৌলিক অনুবাদের মতো কাজ সে সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছে। একাডেমির সদস্য সংখ্যা ষোলো হাজারেরও বেশি। একাডেমির অধীনে একটি সম্পাদনা ও অনুবাদ পরিষদও ছিল। সবাই এখনও জীবিত ও কর্মক্ষম থাকলেও একাডেমি তার আগের সেই সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল। সাংগঠনিক ও আর্থিক পরিকাঠামো দুর্বল হওয়াই হয়তো এর মূল কারণ।

এক সময়ের সাড়া জাগানো ও বাংলা ইসলামি সাহিত্যে সমীহ আদায়কারী বাংলা একাডেমি এভাবেই ধুঁকে ধুঁকে অন্তিম ক্ষণের দিকে নীরবে অগ্রসর হচ্ছিল। অচিরেই হয়তো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে নবীন প্রজন্মের কাছে বিস্মৃত থেকে যেত সে। এবং বাংলা ইসলামি বইয়ের পাঠকশ্রেণি এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারিয়ে ফেলত। কিন্তু না। উলফাত পরিবারের কল্যাণে একাডেমি আবার নতুন উদ্যম পেল। নতুন ভাবে আবার সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। তার অসম্পূর্ণ কাজকে নিয়ে সে আবার ভাবার সুযোগ পেল। সবকিছু সম্ভব হল শুধু দু'দিনের এই সফল বইমেলাকে কেন্দ্র করে। হাতের কাছেই নিজেদের পছন্দের বইগুলির বিপুল সম্ভারের খোঁজ পেয়ে এখানকার বাঙালি পাঠকরাও প্রচণ্ড আপ্লুত।

একাডেমির স্বত্বাধিকারী দানিশ খান ভাইয়ের সাথে দু'দিন দীর্ঘ সময় আলোচনা চলল। উলফত, দারুল উলূম দেওবন্দের বিভিন্ন বাংলা ভাষা কেন্দ্রিক সংগঠনের সাথে যোগসূত্র বাড়ানো এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূমিতে বাঙালি পাঠক শ্রেণির একটি চ্যানেল তৈরি ও তাদের চাহিদা মতো ইসলামি বইপত্র অনুবাদ ও প্রকাশনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় উঠে আসল। আপাতত আগামী দিনের একাডেমির কাজের একটি রূপরেখা স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকলের মিলিত এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

-কাজী মনজুর আলম
০০:৪৩
০৭/১২/২০১৯

হায়, আমাদের শিক্ষা বিপ্লব!

রশীদ আহমদ চাদপুরি

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির উন্নয়ন কল্পনাতীত। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে। নিজের অধিকার সম্পর্কে অবগত করে। শিক্ষিত-সমাজই গড়ে তুলতে পারে একটি আদর্শ জাতি, একটি সুশৃঙ্খল সমাজ, একটি উন্নত দেশ।

ইসলাম পৃথিবীর একমাত্র ব্যতিক্রমী ধর্ম, যার শুভারম্ভ হয়েছে শিক্ষার জানান দিয়ে। শিক্ষার্জনে উৎসাহিত করতে মহানবী সা. অসংখ্য কালজয়ী বাণী রেখে গেছেন।

এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিমিষ্ট সাধনায়। তাঁরা গোটা বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরব তাঁরাই অর্জন করেছিলেন। তাঁদের জ্ঞান চর্চা এতটা উচ্চাঙ্গের ছিল যে, বিজ্ঞান ও গণিতের বহু তত্ত্ব নতুন করে আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। যার জন্য আজও তারা স্মরণীয় ও বরণীয়। তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আলজাবিরের বীজ গণিত বিশ্বায়নের যুগেও গুরুত্ব হারায়নি। ইতিহাস চর্চায় মুসলমানরা ছিল অগ্রগামী। তাঁদের রচিত ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। হজরত ইবনে খালদুন বিরচিত ইতিহাস আজও বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করে। মুসলমানদের রিজাল শাস্ত্র ইতিহাসবিদদের আজও বিস্ময়াভিভূত করে। তাঁরা অকুণ্ঠ নেত্রে ওল্টাতে থাকে একেকটি পাতা।

কালের আবর্তনে সুশিক্ষিত এই জাতিটি আজ অশিক্ষার অতল গহ্বরে। মুসলমানদের মধ্যে আজ নিরক্ষরতার হার বেশি। যারা একসময় বিশ্বসমাজকে পথ দেখাল তারা আজ দিশেহারা। তাঁরা আজ আদর্শচ্যুত,কক্ষহারা। তাঁদের নেই নিখুঁত কোনো চিন্তা-চেতনা। নেই কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। যেন মৃত জাতির তকমা আঁটার অপেক্ষায় তাঁরা।

আজ গোটা বিশ্বে কোথাও মুসলমানদের নেই উচ্চমানের কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়। নেই কোনো ভালো প্রতিষ্ঠান। চিত্রটি কেমন করুণ ও বেদনাদায়ক। কতটা বিস্ময়কর এবং লোমহর্ষক! এখনকার মুসলমান অনেকটা উদাসীন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের বিচরণ একেবারেই নগণ্য। যার জীবন্ত উদাহরণ সাচার কমিটির রিপোর্ট।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কারিগরি বিদ্যায় তাদের উপস্থিতি প্রায় শূন্যের কোঠায়। ফলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে।

এই পিছিয়ে পড়া জাতির ঘুরে দাঁড়ানোর একমাত্র উপায় উচ্চ শিক্ষা অর্জন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতাযমূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। উন্নত শিক্ষার পূর্ব শর্ত হলো উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে তারা পাঠ নেবে প্রকৃত শিক্ষা ও মূল্যবোধের। গবেষণার যাবতীয় সুযোগ লাভ করবে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ভর্তি হয়ে জ্ঞান চর্চা করতে পারবে।

ভারতে মুসলমানদের শাসন ছিল আটশ বছর। দুর্ভাগা আমরা। আমাদের পূর্বসূরিগণ উচ্চ শিক্ষার চিন্তা মাথায় আনতে পারেননি। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন তাঁদের গৌরবগাথা। তাঁরা শশব্যস্ত ছিলেন স্থাপত্য প্রতিষ্ঠায়। প্রতিষ্ঠা করেছেন তাজমহল, লালকেল্লা, কুতুব মিনার,আগ্রা ফোর্ট আরও কত কিছু। যা গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে বটে। দিক দিগন্তের মানুষ জড়ো হয় এখানে মজা নিতে। নষ্টামি করতে। অভিনয় করতে। ভারতবাসী এসব আশ্চর্য স্থাপত্য নিয়ে গর্বিত ও গৌরবান্বিত।

এসবের পরিবর্তে যদি বিশ্বমানের শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করত । তাহলে বিশ্ব সমাজের বাহবা কুড়াত। দেশ বিদেশের মানুষ সমবেত হত এখানে মজা নিতে নয় জ্ঞান অর্জন করতে। নষ্টামি করতে নয়; জ্ঞান চর্চা করতে। অভিনয় করতে নয়; গবেষণা করতে। তাছাড়া পৃথিবীর শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল স্থান লাভ করত। এই পিছিয়ে পড়া অশিক্ষিত জাতিটা শিক্ষিত সমাজের শিরোপা নিয়ে বিশ্ব সভায় শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারত।

মুসলিম শাসকবৃন্দ যে পথে হাঁটা দিয়েছিলেন সেই একই পথের পথিক আজকের ওলামায়ে কেরাম। এক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে তারা ততটা আগ্রহী নন। নন চিন্তিতও। দুর্ভাগ্য আমাদের। স্থুল চিন্তা মনীষীদের । নেই কোন সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও চিন্তাধারা। তাঁরা আজ নিয়ে ভাবতে পারে। পারে না কাল-পরশু নিয়ে।

আজ আমাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক সংগঠন রয়েছে প্রচুর, রয়েছে বহু মতাদর্শ। জাতি আজ বিভিন্ন সংগঠন ও মতাদর্শে বিভক্ত। আর মুরব্বিগণ আখের গোছাতে ব্যস্ত। জাতির প্রকৃত উন্নতি কোথায় তা খোঁজে বের করার সময় তাদের কোথায়? পীর মুরীদি আর ভক্ত তালিকা দীর্ঘ করাই তাদের উদ্দেশ্য। কেবল নিজেদের সংগঠন বাঁচিয়ে রাখতেই তারা চিন্তিত।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সম্মেলন করে। খানকা গড়ে। আরও কতকিছু। কিন্তু পারে না স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে। গড়ার পরিকল্পনা নিতে। প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে । না এমন হবে না। আজও, না কালও। কেননা জাতি জেগে উঠলে তাদের বাজার যে বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁদের ইশারায় এই উঠা এই বসা করবে না।

দুর্ভাগ্য, কেবল দুর্ভাগ্য আমাদের। সমাজে ওদের একদল ভক্ত বাস করে। যারা এতটা অন্ধ মুরিদ। সত্যমিথ্যা যাচাই-বাছাইয়ের যোগ্যতাও রাখে না। তাঁরা শুধু পীরের জয়গান গাইতে জানে।

আজম খান জওহর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ওয়াইসি পারেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি স্থাপন করতে । এম হক পারেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে । পারেন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তবে পারেন না (তথাকথিত) মনীষীগণ। যারা কয়েক বিলিয়ন ভক্তদের কথা বলেন বুক ফুলিয়ে। যারা বিভিন্ন সম্মেলনের নামে খরছ করেন লক্ষ কোটি অযুথ-নিযুথ। জাতির রক্ত পানি করা টাকা নিয়ে লম্বা লম্বা ভাষণ বক্তৃতা করেন। যারা খানকায় শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বসে জিকির আজকারে ব্যস্ত থাকেন। জাতির এমন নায়কদের জবাবদিহি করতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে। সচেতন থাকতে হবে। নইলে এ জাতির উন্নতি কবে হবে ।

ফিরতি মেইল : বন্ধুবর রশীদ আহমদ ভাইয়ের তারুণ্য-চেতনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তার ক্ষুরধার লিখনী জাতীয় চেতনা জাগরণে উৎসর্গ হোক। তবে বন্ধু হিসেবে একটি অনুযোগও করছি যে, কেবল আবেগ-তাড়িত ব্যঙ্গত্যক সমালোচনা কোনো কাজে আসে না। যতটুকু পারা যায় নিজে কাজ করে দেখিয়ে দেওয়াই সর্বোত্তম পন্থা।আর যদি কারও সমালোচনা করতেই হয়, তাহলে এমন ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক, যাতে ওই বিষয়টি নিয়ে সে ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। নতুবা ব্যঙ্গত্যক সমালোচনা শব্দের হিড়িক বৈ কিছুই নয়। -সম্পাদক

তবে বিশেষ কিছু স্মৃতির তালিকায় রয়েছে দারুল ইফতার দরস, প্রিয় শাইখ হযরতুল ওস্তাদ মুফতি মুসআব কাসেমি দা. বা. এর স্নেহময়ী আচরণ, দারুল উলূমের সু-সজ্জিত ও বিন্যস্ত মাকতাবা পরিদর্শন এবং তথ্য সংগ্রহ, মাকতাবায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি চর্চা, প্রিয় শায়খ পালনপুরি সাহেবের ইলমি মজলিস, পাক্ষিক উলফত, উলফত সাহিত্যাসর, উলফত বইমেলা, আরও কত কিছু....

স্মৃতি রোমন্থন ২০১৯

প্রথমে স্মৃতির স্মৃতি

সাহিত্যের পরম বন্ধু প্রিয় আলহুদা ভাই একদিন আড্ডার প্রাক্কালে বলে উঠলেন আব্দুল্লাহ ভাই উলফতের বর্ষপূর্তি সংখ্যা বের হতে যাচ্ছে আপনি আপনার ২০১৯ এর সেরা স্মৃতিখানি লিখে ফেলুন। এবারের আয়োজনে সাহিত্য প্রেমীদের স্মৃতিগুলো দিয়ে আমাদের উলফত সাজবে । কিন্তু ছাগল দিয়ে কি আর হাল চাষ হয়! কখনো রোজনামচা লিখার অভ্যাস ছিল না, পর্যাপ্ত পড়াশোনা নেই, নেই কোন শব্দ ভান্ডার, শব্দচয়ন ও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে একদম অপরিপক্ক সেখানে আবার দীর্ঘ এক বছরের সেরা স্মৃতি লিখব।
আবার ওজরেরও শেষ নেই যে, ইফতার পড়াশোনা অন্যদিকে মুফতি সাহেবের পক্ষ থেকে দেওয়া তাহকীকুত তোরাস-এর বিশেষ দায়িত্ব পালন, আবার ব্যক্তিগত রচনাবলির চাপ; সব মিলিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করার জন্য ডায়েরি নিয়ে লিখতে বসা একেবারে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও ভাবলাম প্রিয় ভাইটির আদেশ কিভাবে উপেক্ষা করি; আমি তো শুধু লিখেই দিয়ে দেব, ব্যস । এরপর তিনি নির্ঘুম রাত কাটিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার লিখিত স্মৃতির পাতায় সাহিত্যের রং মাখবেন । সাহিত্য রস দিয়ে তিনি আমার লেখাটিকে পরিবেশন করবেন সাহিত্যপ্রেমীদের টেবিলে । আমার লেখা পাঠোপযোগী করার জন্য তিনি কত সময় ও সাহিত্যশ্রম দিবেন; সে সম্পর্কে কারও জানা না থাকলেও, পাশে থাকার দরুন আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা তো আছেই। ভাবলাম তিনি যেহেতু এত কষ্ট করবেন তাই আমি দু'কলম না লিখলে বড্ড অন্যায় হবে । নির্দেশ অমান্যের দোষে দোষী সাব্যস্ত হব । তাই কলম নিয়ে ডায়েরি হাতে...।

স্মৃতিময় কয়েকটি আখ্যান

মক্কা মদিনা এবং ফিলিস্তিনের পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস-এর পর আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো, প্রাণের বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ। দেওবন্দের পূণ্যভূমিতে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট আমার জীবন-ডায়েরির সেরা স্মৃতি হিসেবে জ্বলজ্বল করবে।শিক্ষার এই উর্বর ভূমির প্রতিটি স্মৃতি আমার জন্য জীবনের মাইল পলক। স্মৃতিগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল বর্নিল ও স্বপ্নের। দারুল উলূমের এ স্মৃতিগুলো আমার জন্য কেবল ২০১৯-এর নয়, বরং আমার জীবনের অবিস্মরণীয় সোনালি অধ্যায়, এই দারুল উলূম; আমার অস্তিত্বের শেকড় ,বেঁচে থাকার প্রেরণা, হৃদয়ের লালিত স্বপ্ন, শেষ ভরসাস্থল, এখানের কোন্ স্মৃতিটি সেরা বলব, হিসেব মিলাতে পারছি না।তবে বিশেষ কিছু স্মৃতির তালিকায় রয়েছে দারুল ইফতার দরস, প্রিয় শাইখ হযরতুল ওস্তাদ মুফতি মুসআব কাসেমি দা. বা. এর স্নেহময়ী আচরণ, দারুল উলূমের সু-সজ্জিত মাকতাবা পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ, মাকতাবায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির চর্চা, প্রিয় শায়খ পালনপুরি সাহেবের ইলমি মাজলিস, পাক্ষিক উলফত, উলফত সাহিত্যাসর, উলফত বইমেলা, আরও কত কিছু, বুঝতেই তো পারলেন আমার বিশেষ স্মৃতি গুলোর বৃহদাংশ প্রাণের উলফত ঘিরে, ২০১৯ সালের আমার স্মৃতির পাতায় সেরাদের সেরা হলো স্বপ্নের উলফত; সেই পাঠশালা, পাক্ষিক পত্রিকা, বইমেলা তিনটিই। উলফত এর সাথে জড়িয়ে আছে ভোজন, আপ্যায়ন, সাহিত্যগল্পের আড্ডাসহ আরও কত মধুময় মুহূর্ত।

দেওবন্দে এসে সাহিত্য সাধনার স্বপ্নপূরণের এমন একটি প্লাটফর্ম পাব কখনও ভাবিনি, উর্দুর অঙ্গনে বাংলা সাহিত্য চর্চা; তাও আবার সুসংগঠিত উলফত নামে। এই তো স্রোতের বিপরীত নৌকা বেয়ে নদী পার হওয়ার মতোই। যাই হোক, সেদিনের শুরু হওয়া উলফত সাহিত্যাসর, আজ সকল বাংলাভাষী ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় একটি নাম। প্রশংসিত একটি উদ্যোগ। সময়ের চাওয়া। সময়োপযোগী পদক্ষেপ, সাহিত্য সাধকদের জন্য স্বপ্নপূরণের হাতছানি। বছর শেষে আমার কাছে সেরা স্মৃতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে উলফতের সাথে যাপিত দিনগুলো দিনগুলো। তার মাঝে ওই দিনটির কথা মনে পড়লে আমার হৃদয় সাগর আন্দোলিত হয়, যেদিনের সোনালি প্রভাতে আমি দারুল উলূমের পাঠরত বাংলাভাষী বন্ধুদের সামনে মাতৃভাষায় বাংলা ভাষার ফরিয়াদ শোনাতে পেরেছি। সেদিন উপস্থাপনার সাজ ছিল সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানা; মাথায় গামছা, পরনে লুঙ্গি, আর গায় পাঞ্জাবি; দীর্ঘদিন যাবত শুনে আসছি দারুল উলূমের সরজমিনে নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেওয়া যায় না, অথচ সেদিন কেবল বাঙালি পরিচয় নয় , বাঙালি সাজ নিয়ে বাংলা ভাষার ফরিয়াদ ও বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্ব আর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করে ফেলেছি নির্ভয়ে, অবশ্য দারুল উলূমের মাটিতে নিজেকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে উলফত-এর অসামান্য অবদান অকুণ্ঠচিত্তে, উদার মনে স্বীকার করতে হবে। সেদিনের বাঙালিয়ানা সাজের বিউটিশিয়ান ছিলেন কিন্তু আলহুদা ভাই। সেদিন আমার বাংলাভাষার ফরিয়াদকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন উপস্থিত সকলে। আমাকে ভর্ৎসনা না দিয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন অনেক হিতাকাঙ্খী ভাই-বন্ধু। যা আমার সাহিত্য সাধনায় স্পৃহা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই দিনটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে হৃদয়ে।
দেওবন্দের লাল বিল্ডিং-এর মাথার যে মুকুট। আমরা দারুত তাফসীর হিসেবে চিনি যাকে। সেখানে সমবেত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরা বা বাংলার সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুরা। সেখানেই নিয়মিত উলফত সাহিত্যাসর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, ছোটোবেলা থেকে হৃদয়ের লালিত স্বপ্ন ছিল দেওবন্দ পড়াশোনা করব। আল্লাহ স্বপ্ন পূরণ করেছেন, শুকরান লিল্লাহ। তবে দেওবন্দ পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনার এ সুযোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কৃপা ছাড়া কিছুই নয় । আলহুদা, ইবনে লুৎফ, ইফতেখার, গোফরান, ফারুক, জাহিদ, তরিক, বড়ো ভাইদের মাঝে আছেন কাজী মনজুর আলম, খালিদ, জুবায়েল, মনিরসহ অনেকে। এই অমায়িক মানুষগুলোর সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আমার স্মৃতির আকাশে রংধনু এঁকে দিয়েছে, এঁরা ছিল রংধনুর সাত রং এর মতো, কত ভালোবাসা শ্রদ্ধা স্নেহ পেয়েছি এদের তরফ থেকে। সত্যি, এগুলো কখনো ভুলবার নয়। জীবনের প্রতিটি বছরই যেন ২০১৯-এর মতই কাটে এই প্রত্যাশায়...। আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখুন । নতুন বছরকে জীবন পরিবর্তনের বর্ষ বানিয়ে দিন

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইউসুফ
তাকমীল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

মেরি মাম্মি, মেরি মাম্মি...

(প্রিয়সী মাকে নিয়ে...)

প্রায়শ কানে ভেসে আসে, হৃদয়ে আঘাত করা কিছু কথা। না, তীরের আঘাত সহ্য করা গেলেও এসব কিন্তু সোয়া যায় না।যথা:
কখনো কখনো খবরের কাগজের রেড়-লাইন –
ছেলে মা-কে স্টেশনে ফেলে চলে গেল। যোগ্য সন্তানের পিতা হয়েও বৃদ্ধ বাবা গ্রামে বেগার খেটে মানবেতর জীবনপাত করছেন।
সন্তানদের অযত্নে বয়সের কাছে হেরে যাওয়া পিতামাতা বৃদ্ধাশ্রমে ধুকে ধুকে মরছে। ইত্যাদি ইত্যাদি বিবেক জ্বালানো কিছু আখ্যান।

এক.

গত বৃহস্পতিবার। দেওবন্দ থেকে 'গঙ্গোহ' যাচ্ছিলাম আমরা পাঁচ বন্ধু। একসাথে বাসে চড়লাম। বাস ভর্তি যাত্রী। যেন পা রাখার জায়গা নেই। এরই মধ্যে বাসে চড়লেন মধ্যবয়সী এক মা। সাথে ফুলের পাপড়ির মতো মায়াবী চেহারা ও চাঁদের জ্যোছনার মতো নিষ্পাপ দুটি ছোট্ট খোকা। তাদের বয়স ৫ বছরের বেশি হবে না। হয়তো তারা যুগ্ম ভাই! চেহারায় ভারি মিল!
কন্ডাক্টর টিকেট সংগ্রহ করতে তার সিট ত্যাগ করলেন। আমি ঐ সিটের পাশেই দাঁড়ানো। ছেলে দুটি মা-কে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের বোধহয় কষ্ট হচ্ছে। তবে বসবেন কোথায়? কোথাও যে জায়গা নেই। এমন কষ্টে ক্ষণিকের আরামও বুঝি তার কাছে স্বর্গীয় সুধা পান থেকে কম নয়। এজন্য কন্ডাক্টরের সিট ছাড়তেই ছেলেদের বসতে বললেন। কিন্তু তাদের কেউ যে বসতে রাজি নয়। মা বাধ্য হয়ে তাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।
আমি চেয়ে আছি বাইরের দিকে...
'নানোতা ' পৌঁছতে এখনও অনেক বাকি। গঙ্গোহ তো আরও দূর। পাশের সবুজ বৃক্ষলতা ও মাথা তোলে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো গাড়ির চেয়ে বেশি বেগে আমাকে অতিক্রম করছিল।
মনে আছে, একদিন গাড়ি করে আব্বার কোলে বসে কোথাও যাচ্ছিলাম। তখন বাইরে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলাম। আব্বা, গাড়ি যখন চলে, গাছগুলোও তখন দৌঁড়ায়। আবার গাড়ির সাথে তারাও বন্ধ করে দেয় দৌঁড়ঝাপ! এমন কেন? আব্বা মুচকি হেসে তখন আমাকে কিছু বুঝিয়েছিলেন।
শিশুমনের অবুঝ প্রশ্ন!
হয়তো আব্বার ভালোই লেগেছিল! বাইরের দৃশ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা, বাল্যকালের সে অভ্যাস এখনও সঙ্গ ছাড়েনি। সাইনবোর্ড দেখে স্থান ও জায়গার নাম জানার পদ্ধতিও কিন্তু আব্বার শেখানো।
কখনও ভাবি, এ ক্ষুদ্র জীবনের এই যে পাঠগুলো; সবই তো আম্মা-আব্বার দান, না হয় শিক্ষক-শিক্ষিকার অবদান। এ জীবনে আমার ভূমিকাটাই বা কী?
কথাগুলো মনে পড়ছিল। হঠাৎ কানে ভাসে ক্রন্দন মিশ্রিত নীচু আওয়াজের খিচিমিচি এক চিৎকার। "মেরি মাম্মি, মেরি মাম্মি... ।"
চেয়ে দেখি, একটি ছেলে মা-কে জড়িয়ে ধরে আনন্দে লাফিয়ে ওঠছে। আর অন্যজনের চোখ থেকে ঈর্শা ও ক্রোধ মিশ্রিত অশ্রু ঝরছে। ক্ষণিকের জন্য মায়ের আঁচল তার উপর ছিল না বলে।
দৃশ্যটি দেখে কী-যে ভালো লাগল; বলে বোঝাবার নয়। সব শিশুরাই মা-বাবাকে এমনই চায়। কিন্তু বড়ো হয়ে....!! বড়ো হয়ে অনেকের ক্ষেত্রে কেন চিত্রটি বদলে যায়?

দুই.

প্রিয় পাঠক, মা-বাবার স্নেহ-মমতা ও প্রেম-ভালোবাসার কি কোনো সীমা থাকে? কেউ কি মেপে দেখেছে সন্তানের প্রতি থাকা তাদের প্রেমের ভাস্বর ও স্নেহে খনির গভীরতা? কনকনে শীতের রাতে তুমি প্রস্রাব করে বিছানা ভেজাতে! আবার কখনো মায়ের গায়ে প্রস্রাব করেই রাতের ঘুম নষ্ট করতে! তোমার কান্নার চাপা সুর কানে আসতেই মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন। বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে দুটো চকলেট তোমাকে বেশি দিতেন! উৎসব-পার্বণে বাবা নতুন জামা কিনে না দিলেও মা যে জোর করে একজোড়া কাপড় ঘরে আনতেন!
এসব তুমি কীভাবে ভুলতে পার?
সারা দিন পরিশ্রম করে বাবা ঘরে আসেন। ক্লান্ত বদনে সামান্য আরাম চাইতেন। কিন্তু তোমার খুশির জন্য সকল যন্ত্রণা ভুলে যতসব দুষ্টুমি হাসিমুখে সহ্য করতেন। হরেক রকম দাবি পূরণে থাকতেন সদা সচেষ্ট। নিজের উপভোগগুলো একে একে বিসর্জন দিয়েছেন তোমার জন্য। একটু মনে পড়ে না? ভাবার সময় হয় না?
ছোটোবেলায় কেউ কৌতুক করে আমার আম্মু-আব্বুকে তার দাবি করে যদি বলত: "আমার আম্মু, আমার আব্বু", তখন তাদের হারিয়ে ফেলার ভয়ে যেমন তাদের গলা জড়িয়ে ধরতাম। বড়ো হয়ে কি তেমন করতে পারি না? কেন পারব না? না পারার কী আছে?
কেবল আমাদেরকে একটুখানি নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার। কুরআনের মর্মগুলো সামান্য বুঝতে হবে। তবেই ইনশাআল্লাহ, তাদের দোয়া-ই আমাদের জান্নাতের দুয়ার খুলে দেবে।
আপনি জানেন, প্রিয় নবী(সা.) মা-বাবাকে নিয়ে কী বলেছেন?
আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত।"
"বাবা হচ্ছেন জান্নাতের দ্বার।"

মুস্তাফা ইউসুফ জামিল
কাছাড়, আসাম
দাওরা হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ

আমার বাসনা পূর্ণ হলো

মানুষের চিন্তাভাবনা যে কি অদ্ভুত ও শক্তিশালী তার একটি জলন্ত প্রমাণ আজ দারুল উলূমের দেওবন্দের উলফত সাহিত্যাসর । আমাকে এমন কেন বলতে হচ্ছে? কারণ আজকের এই সাহিত্যাসর দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাভাবনার সফল বাস্তবায়ন।

জাতে আমি একজন সাহিত্যপ্রেমী। দারুল উলূম দেওবন্দে আসার পূর্বে বাংলা ভাষার সাথে সম্পর্ক তেমন নিবিড় না থাকলেও ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল অসাধারণ টান ও আন্তরিক ভালোবাসা। কিন্তু তখন ভাষা ও সাহিত্যে নিজেকে নিবিষ্ট করার কোনও পাথেয় কিংবা উপায় আমার সামনে ছিল না। আমার কাছে না ছিল বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোনো বই, না ছিল সাহিত্যপ্রেমী কোন সাথী। অবশেষে আল্লাহর অশেষ করুণা ও দয়ায় উলূমে নবুওয়াতের তৃষ্ণা মেটাতে সুদূর দারুল উলূম দেওবন্দে আগমন হলো। যেখানের সম্পূর্ণ কিতাবাদি উর্দু ভাষায় পড়ানো হয় বলে আমার হাতে ভাষাচর্চার কোনও উপায় থাকল না। কিন্তু একজন বাঙালি হিসেবে নিজের ভাষাকে এই উর্দু ও হিন্দি পরিমণ্ডলেও কোনোভাবেই ভোলাতে পারলাম না। বরং এখানে ভাষা সাহিত্যের প্রতি প্রেম অনেক বেশি অনুধাবন হতে লাগলো। এর বিশেষ কারণও রয়েছে।

প্রথমত: এই উর্দু মহলে আসার পর মনে হলো যে, কেউ যেনো আমার একটি মূল্যবান বস্তু ছিনতাই করে নিচ্ছে। আর সেটি ছিল মাতৃভাষা।

দ্বিতীয়ত: অনেক বাঙালিকে এই উর্দু মহলে নিজের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার করুণ পরিস্থিতি আমাকে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হতে প্রেরণা যুগিয়েছে, তো সাহিত্য চর্চার বহু দিনের তৃষ্ণা মেটাতে একা একা ভাবতাম।উপায় খোঁজতে থাকতাম।

দীর্ঘ চার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আল্লাহর কি লীলা! একেবারে শেষ বর্ষে, দীর্ঘদিনের মনঃবাসনা পূর্ণতার পথ খোঁজে পেল। চলতি বছরের প্রারম্ভে হঠাৎ একদিন আমার সহপাঠী বড়ো ভাই মাওলানা মুনিরুল হকের মধ্যস্থতায় এক ভাষাপ্রেমিকের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল, যিনি সত্যিকারের একজন ভাষাসৈনিক। যার ভাষা প্রেমের জয়-জয়কার আজ দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠরত বাঙালি ছাত্র মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। বলছিলাম সাহিত্যেপ্রেমী হুসাইন আলহুদা ভাইয়ের কথা। যার নেতৃত্বে দীর্ঘদিনের মনের বাসনা পূরণ হতে লাগল। উন্মেষ ঘটল বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে উলফত সাহিত্যাসরের এবং সাথে সাহিত্যপ্রেমীদের মুখপত্র উলফত নামের পাক্ষিক পত্রিকাও।
অতি অল্প সময়েই যা বিজ্ঞ মহলে স্থান করে নিল।
আল্লাহর কাছে সাহিত্যাসর এবং উলফত পরিবারের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আবুল কাছিম মো. খালিদ
ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষ, ডি বি ডি

উলফত প্রতিভার খোঁজে

“ পাণ্ডুলিপি বিজয়ীদের সাক্ষাৎকার ”

উলফত পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতা ২০২০ ঈ.। দারুল উলূম দেওবন্দের বাংলা সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য ছিল এক আবিনব আয়োজন। প্রতিযোগিতাটি যেমন ছিল চিত্তাকর্ষক, তেমনি চ্যালেঞ্জেরও। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লিখতে হবে। তাও কেবল নবীনরাই অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিষয়গুলো ছিল হাঁড় কাঁপানো। প্রয়োজন ছিল প্রচুর অধ্যয়নের। কিন্তু বিপত্তি সেখানেও; পর্যাপ্ত বই নেই এখানে। উর্দু-হিন্দির এলাকা। একেকটি বাংলা বই বহন করে আনতে হয় সদূর বাংলা থেকে। উলফত পরিবার ঘোষণা দিলো একটু বাহারি করে;
“অংশগ্রহণ করলেই পুরস্কার। প্রথম পুরস্কার ১৩ খণ্ডের বিশাল আকাবির সিরিজ, দ্বিতীয় পুরস্কার ১১খণ্ডের কাসাসুল কুরআন। তৃতীয় পুরস্কার; ৭ খণ্ডের সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস। বাকি সবার জন্য সাত্বনা পুরস্কার হিসেবে থাকবে একটি করে ‘পুষ্পসমগ্র’। বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রথস্থান অধিকারীর পাণ্ডুলিপিটি বই আকারে ছাপা হবে। পুরস্কার দেওয়া হবে হজরত মাও. মুফতী উসমান গনী সাহেব দা. বা. [অধ্যাপক, ফিকহ ও তাফসীর, উলূম উলূম দেওবন্দ ও অভিভাবক, “উলফত সাহিত্যাসর”]-এর হাতে। তবে লেখতে হবে মাত্র বিশ দিনে।”
ঘোষণা দেখে সাহিত্যপ্রেমীরা অনেক উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ফরম সংগ্রহ করলেন অনেকে। কিন্তু লেখতে বসে খেই হারিয়ে ফেলার উপক্রম। এত কঠিন বিষয়ে লেখতে হবে। তাও পুঁজিবিহীনে...[বই ছাড়া]। উলফত পরিবারও পড়ল বিপাকে। কী করা যায়? প্রশ্ন বাতিল করবে, না সময় বাড়াবে, না লেখা কমিয়ে দেবে। ভাবতে ভাবতে নির্দিষ্ট সময়ে পার হয়ে গেল। সাহিত্যপ্রেমীরা অসম্ভবকে সম্ভব করে ১৩ টি বড়ো বড়ো পাণ্ডুলিপি ‘হাওলা’ করে গেল। বাহ, এত চমৎকার তারা লেখতে পারবে, কেউ ভাবতে পারেনি। এবার প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয়স্থান নির্ণয় করার পালা। কত ভালো হতো, যদি এই বিভাজন না করে সবাইকে সমান পুরস্কার দেওয়া যেত। কিন্তু না উলফতের এই সামর্থ্য আছে, না প্রতিযোগীরা তা মানবে। শেষে দুটি সুক্ষ্ম পর্ব নির্ধারণ করা হলো।
১. বিষয়বস্তু কার লেখায় কত বেশি ফোটে ওঠেছে। ২. বানানভুল ।
প্রথম পর্বে তেরো জন থেকে পাঁচ জন নির্বাচিত হলো। এঁরা হারে নব্বই পার্সেন্টের উপর বিষয়বস্তু সাজাতে পেরেছে। এরপর বানানভুল-পর্ব। এখানে এসে চূড়ান্ত মান নির্ণয় করা গেল।
আসলে প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে এই দুটি জিনিসই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তু হতে হবে সব ধরণের পাঠকের বোধগাম্য করে সহজ উপস্থাপনায়। দ্বিতীয়ত বানানভুল এক অমার্জনীয় অপরাধ। শুদ্ধ করে না লিখতে পারলে তুমি লেখতে বসেছ কেন!
তাই সাহিত্যপ্রেমীদের এই দুটি অধ্যায়েই মেহনত বা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
পাক্ষিক উলফতের “প্রতিভার খোঁজে” বিভাগের এবারের আয়োজন; “পাণ্ডুলিপি বিজয়ীদের সাক্ষাৎকার।” সাহিত্যে তাদের পথচলা, আগামীর ভাবনা, ও বিজয়ের অনুভতি জানতে ‘উলফত’ তাদের মুখোমুখি হলো। তবে যারা অনেক ভালো লেখেও সাময়িক কোনো কারণে ‘তিনকের’ ভেতরে আসতে পারেননি; তাদের জন্য থাকলো সববেদনা। ইনশাআল্লাহ, আগামীর সাহিত্য-নেতৃত্ব তোমাদের..., এই প্রত্যাশায়।

বিজয়ীদের নিয়ে...

বিজয়ী হওয়ার জন্য অবশ্যই তাদের একান্ত আন্তরিকতা ছিল। সাথে প্রচেষ্টা তো ছিলই। কারণ এতগুলো গিরিপথ পাড়ি দিয়ে বিজয়-কেতন উড়াতে পারা ছাট্টিখানি কথা নয়। লিখিয়ে মিলনমেলার আগের দিন রাত বারোটা ছুঁই ছুঁই; উলফতের রাজ্যীয় অভিবাকদের বৈঠক চলছে বিজয়ীদের ফলাফল নিয়ে। প্রত্যেক প্রতিযোগীর প্রপ্ত নম্বর, পার্সেন্ট ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনার পর সবার ঐক্য মতে চূড়ান্ত ফিরিস্তি বেরিয়ে এল। আল্লাহ পাকের বিশেষ করুণা ওই দিন সত্যিই অনুভব করেছি। বেশ কাকতালীয় ফলাফলই বেরিয়ে এল। তারা হলেন: ইফতিখারুর হক খাইর; ফেনী, প্রথমস্থান অধিকারী। ওয়ায়েস কুরণী; মুর্শিদাবাদ, দ্বিতীয়স্থান অধিকারী। মু. ইসলাম উদ্দিন, হাইলাকান্দী [আসাম], তৃতীয়স্থান অধিকারী। তাদের ক্ষুরধার লিখনী জাতীর জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখুক, এই কামনা রইল।

-সম্পাদক

একদিন বিকেলে বাড়ির কথা মনে পড়ল। বিষণ্ন মনে খাতায় ছোট্ট করে লিখলাম 'মাতৃভূমি,ভালো আছো তো?'...। কোনও কাজে হুসাইন ভাইয়ের কামরায় খাতাটা নিয়ে গেলে সেখানেই থেকে গেল। এক সময় তিনি খাতাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। পরে বললেন, আপনার লেখাটা পড়েছি। ভালো লিখেছেন। রোজনামচা লেখার অভ্যাস করলে লেখা আরও চমৎকার হয়ে ওঠবে। সেই প্রেরণায় আরও দুয়েকদিন নিজের মতো করে লিখেছি...।

-ইফতিখারুল হক খাইর

ইফতিখারুল হক খাইর। প্রতিভায় টইটম্বুর এক তরুণ। যাকে বলে সম্ভাবনাময়ী। তাকে আমি আহ্বাও করব বিশেষ কোনো লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার। ইনশাআল্লাহ, সফলতা তোমরই।

আসলে এই প্রতিভাগুলো জাতীর অমূল্য সম্পদ। ইসলামের আমানত। জাতির ভবিষ্যত বিনির্মাণের জন্য প্রতি যুগেই আল্লাহ তাআলা যোগ্য লোক তৈরি করবেন। এটি তাঁর দ্বীন হিফাজতের এক কারিশমা। হ্যাঁ, ওই যুগ দুর্ভাগা, যে যুগ এদের মূল্যায়ন করতে পারে না; বিপর্যয় ওই যুগেই হয়। ইতিপূর্বে ইফতিখারের আরেকটি সাক্ষাৎকার ছেপেছে উলফতে। তার ছোট্ট মেধায় তৈরি করে ফেলেছিল চমৎকার এক 'উলফত ওয়েবসাইট'। ইফতিখার একজন 'শাইর'ও [উর্দু কবি]। তার শা'য়িরানা কৃর্তির কথা অন্যদিন বলব। বাংলা সাহিত্যে তার পদচারণা বেশি দিনের না হলেও দুয়েক-কদমে সে যতটুকু পথ মাড়ি দিয়েছে, তা যে কাউকেই বিস্মিত করবে। উলফত পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় সেরা পাণ্ডলিপি হিসেবে বিচারকরা তার রচনাকেই নির্বাচন করেছে। যেমন বিষয়বস্তু সাজাতে পেরেছে, বানানভুলও নগন্য। প্রথম পুরস্কার অর্জন করার পর অনুষ্ঠানে আগত অনেক দর্শককে তার সাথে হাত মেলাতে দেখেছি। হতে পারে অনেক পাঠকও তার সাক্ষাৎ প্রত্যাশী, তাদের জন্যই উলফতের এই আয়োজন।

-সম্পাদক

ভাষাচর্চায় কার কাছ থেকে উৎসাহ পেলেন?

ভাষা কতটুকু চর্চা করেছি, বলা মুশকিল। তবে এর পেছনে কয়েক রকমের উৎসাহ কাজ করেছে। প্রথম উৎসাহ পেয়েছি বড়োভাই ইহতিশামুল হকের কাছ থেকে। ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগের উৎসাহ পেয়েছি উলফতের সম্মানিত সম্পাদক হুসাইন আলহুদা ভাই থেকে এবং ভাষাচর্চা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ পেয়েছি উলফত বন্ধুমহলের কাছ থেকে। আর আমি এই উৎসাহ তাদের কথা অপেক্ষায় কাজ থেকেই বেশি কুড়িয়ে নিয়েছি।

সাহিত্যচর্চায় আপনার পথচলা সম্পর্কে যদি বলতেন!

একদম শিশুকাল থেকে বলা শুরু করি। আব্বু-আম্মু শিক্ষিত হওয়ায় শৈশবকাল থেকে বইটই হাতের নাগালেই ছিল। প্রথম শ্রেণি পড়ে বর্ণ পরিচয় পাওয়ার পর চলতি পথের কোনও সাইনবোর্ড, মাহফিলের পোস্টার ও দোকানের নেমপ্লেট আমার কাছ থেকে মুক্তি পেত না। বাসে উঠার পর থেকে গন্তব্যে যাওয়া পর্যন্ত সব দোকানের নাম পড়া ছিল আমার বাতিক। যখন হিফজ শুরু করি, তখন থেকেই আম্মুর মাসিক আদর্শ নারী ও বড়োভাইয়ার 'লিখনী', নকীব ও বিশ্ব-বিচিত্রাসহ অন্যান্য মাসিক/সাপ্তাহিক পত্রিকা খাটের উপর, সোফায় ও মেঝেতে এলোমেলো ছড়িয়ে থাকত। আদর্শ নারী'তে নাসির গাজীর ঝুলি, ধাঁধা ও ছড়া-কবিতা পড়ার জন্য মাঝেমধ্যে পত্রিকাও গুম করে দিতাম। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে আপুর ধার করে আনা 'হাত কাটা রবিন' গল্পের বইটা একদিনে শেষ করে দিয়েছি। ভাত খাবার জন্য ডাকতে ডাকতে আম্মুর গলা শুকিয়ে গেলেও তিনি অবশ্য আনন্দিতই ছিলেন, সারাদিন ডেস্কটপ নিয়ে পড়ে থাকা ছেলেটাকে বইয়ের ঝোঁকে পেয়েছে বলে।

তারপর কিতাব বিভাগে আসার পর বাংলার ঝোঁকটা কমে গেছে। ধীরে ধীরে উর্দু শেখা এবং উর্দু সাহিত্যে মনোনিবেশ। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকাতে বড়োভাইয়ার লিখনী দেখতাম। তিনি কয়েক বার আমাকে বলে ফেলেছেন, তোর কি বাংলা-টাংলা শিখতে হবে না? আম্মু বলতেন, থাক, ওকে কিছু বলিস নে। আমার ছেলে পাকিস্তান যাবে। তাই ঐ সময়ে তিন-চারদিন একটু করে লিখেছিলমি। পরে এক-দুমাসে ফেইসবুকে তিন-চার লাইন লিখতাম। এক সময় বাংলাটা ফেইসবুকের পোস্ট পড়া এবং কমেন্ট বক্সে মন্তব্য লেখাতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। চাহারুমে এসে খানেকটা আরবি শেখা শুরু করেছি। অমনি গত বছর দারুল উলূমে আসার পর সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তবে মাতৃভূমির প্রতি ভেতরে ভেতরে একটা ভালোবাসা ও মায়া জন্মেছে। সেই আবেগাময় মুহূর্তে ইউটিউব আমার সঙ্গ দিয়েছে। ইউটিউব থেকেই আঞ্চলিকতা কাটিয়ে প্রমিত উচ্চারণ শেখার চেষ্টা করেছি, এখনও করি। গত বছর সাজ্জাদ লাইব্রেরি কর্তৃক আয়োজিত ষান্মাসিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভীষণ ভালো লেগেছে। তখন হুসাইন আলহুদা ভাইয়ের কামরায় খানা খেতাম। তিনি সাজ্জাদ লাইব্রেরির প্রতিভূ তরুণদের প্রতি কিছু উৎসাহ বাণী লিখেছেন।

আমাকে বললেন উর্দূ অনুবাদ করে দিতে। উনার সেই লেখা পড়ে নতুন করে বাংলা শেখার আগ্রহ জেগেছে। একদিন বিকেলে বাড়ির কথা মনে পড়ল। বিষণ্ন মন নিয়ে খাতার পাতায় ছোট্ট করে এক পৃষ্ঠা লিখলাম 'মাতৃভূমি,ভালো আছো তো?' শিরোনামে। কোনও কাজে হুসাইন ভাইয়ের কামরায় খাতাটা নিয়ে গেলে সেখানেই থেকে গেল। এক সময় তিনি খাতাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। পরে অন্য সময় বললেন, আপনার লেখাটা পড়েছি। ভালো লিখেছেন। রোজনামচা লেখার অভ্যাস করলে লেখা আরও চমৎকার হয়ে ওঠবে। সেই প্রেরণায় আরও দুয়েকদিন নিজের মতো করে লিখেছি। ইতিমধ্যে গোফরান ভাইসহ আমাদের তিনজনের একটা **ভোজন সূচি** প্রণিত হয়। নাম দেওয়া হয় "মাজমাউল উলফাতি লি-সালাসাতি আফইদাহ"। পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসার দরুণ কিছুদিনের জন্য রোজনামচা স্থগিত থাকে। পরীক্ষার পরদিন ভেবেচিন্তে বিশাল করে 'যৌথাহার' শিরোনামের লেখাটি লিখেছি। হুসাইন ভাই দেখে ভীষণ আপ্লুত হলেন। পুরোটা পড়ে বিভিন্ন যায়গায় শুধরে দিলেন। এর সাথে আরও একটি প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও বই পর্যালোচনা যোগ করে প্রকাশিত হয় আমাদের প্রথম **উল্ফত**। তখন থেকে ইচ্ছাধীন একটু-আধটু করে শেখা হচ্ছিল। আর এ বছর উলফত বড়ো আঙ্গিকে সমাদৃত হওয়ার পর উলফত বন্ধুমহলের কারণে দায়বদ্ধতার শিকার হয়ে শিখতে হচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই, হুসাইন আলহুদা ভাইয়ের শৈল্পিক ভাবনার নির্যাস ও মনজুর ভাইসহ অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শের ফসলের একটা বিশাল অধ্যায় আমার অর্জিত হয়েছে, আলহমদুলিল্লাহ।

আগামীতে কোন বিষয়ে লিখতে চান?

এখনও কোনও বিষয় নির্দিষ্ট করিনি। আল্লাহ তাওফিক দিলে উম্মাহর প্রয়োজন অনুসারে লিখব।

আপনার প্রিয় লেখক?

আলেমদের মধ্য হযরত মাওলানা আবু তাহির মিছবাহ, মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ, মাওলানা আতিকুল্লাহ ও মুহিব খান।
আর সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদসহ কয়েকজন ডানপন্থি লেখক।

সাহিত্য সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য কী কী বই পড়েলেন?

সাহিত্য সম্বলিত বই পড়া হলেও সাহিত্য সংশ্লিষ্ট কোনও বই পরিপূর্ণ পড়া হয়নি। 'এসো কলম মেরামত করি' সেই গত বছর শুরু করেছি, এখনও শেষ হয়নি। পড়া শুরু করলেই দুদিন পর পরীক্ষা এসে উপস্থিত হয়। আর কি পড়া যায়! গত রমজানে হিমু সিরিজের দশটার মতো গল্পের বই পড়া হয়েছে। পুষ্প সমগ্রে ছোটদের জন্য লেখা (রোজনামচার পাতা, কচি ও কাঁচা, রসের কলমদানি, তোমাদের লেখা/ আমাদের দেখা, কিশোর পাতার মতো) বিভাগগুলো পুরো পড়া শেষ। আতিকুল্লাহ সাহেবের বইগুলো পড়ে শব্দচয়ন ও বাক্যের কারুকাজের পাশাপাশি অঢেল চেতনা পেয়েছি। একজন মোল্লা এত্তটা রোমান্টিক হতে পারে -তা এই সাধকের বই পড়া ছাড়া বুঝা মুশকিল। 'সকালের মিষ্টি রোদ' পড়ে লেখার তাল-লয় খুঁজে পেয়েছি। ফেইসবুক, প্রতিলিপি, প্রথম আলোর পাঁচমিশালিসহ অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকেও মোটামুটি পড়া হয়েছে।

'উলফত' থেকে কী পেলেন?

উলফত থেকে কী পাইনি!? সাহিত্য সংশ্লিষ্ট আর কোনও খোরাক বাকি নেই। সাপ্তাহিক সাহিত্যাসর, পাক্ষিক উলফত, বইমেলা, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক বিশেষ অনুষ্ঠান, পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতা ও মাঝেমধ্যে খাবার পার্টি! আরও কতো কী!! অযোগ্যতা সত্বেও ব্যক্তিগতভাবে কাজের সাথে জুড়ে থাকায় অন্যদের তুলনায় একটু বেশি অর্জন করেছি বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে 'উলফত ব্যাকরণ ও বানান পাঠশালা' আমার লেখার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছে। সর্বপরি আল্লাহর তা'আলার শোকর ও উলফতের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যখন হিফজ শুরু করি, তখন থেকেই আম্মুর মাসিক আদর্শ নারী ও বড়োভাইয়ার 'লিখনী', নকীব ও বিশ্ব-বিচিত্রাসহ অন্যান্য মাসিক/সাপ্তাহিক পত্রিকা খাটের উপর, সোফায় ও মেঝেতে এলোমেলো ছড়িয়ে থাকত। আদর্শ নারী'তে নাসির গাজীর ঝুলি, ধাঁধা ও ছড়া-কবিতা পড়ার জন্য মাঝে-মধ্যে পত্রিকাও গুম করে ফেলতাম।

আগামীতে এমন বিষয়ে লিখতে চাই, যা মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের কল্যাণকামী সবার উপকারে আসে।
-ওয়ায়েস ক্বরণী

ওয়ায়েস ক্বরণী। লাজুক একটা ছেলে। তাকে দেখলে মনে হয় না যে, সে একজন সৃজনশীল প্রতিভূ। মুর্শিদাবাদের ছেলে বটে, সিরাজুদ্দৌলার দেশের মানুষ, কিছু একটা তো হবেই। দারুল উলূম দেওবন্দে আরবি দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে। কেউ হয়তো ভাবেনি তৃতীয় সারির কেউ এসে পাণ্ডুলিপি-প্রধান হতে যাচ্ছে। উলফত পাণ্ডুলিপি অবশ্যই একটি সাড়া জাগিয়েছে। প্রথম পুরস্কার কে পাচ্ছে, এ কৌতূহল যেন দমিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। আরবি সপ্তম এবং দাওরা হাদীসের অনেক লিখিয়ে মহোদয়ও ফরম নিয়েছেন। অপেক্ষকৃত ছোটোরা এ ভয়ে 'ফরম' নিচ্ছিল না। সবাই তো ভালো লেখেছেন। কিন্তু ভালোর চেয়ে ভালো লেখে ফেলল ওয়ায়েস ক্বরণী। যেমন তার উপস্থাপনা, তেমন সাবলীল শব্দচয়ন এবং গোছালো আলোচনা, বিচারকরা তার গুণ গাইতে শুরু করে ছাড়তে চাচ্ছেন না। কি আর করা, বাস্তবতা মেনে তাকেই যথাযোগ্য পুরস্কার অর্পণ করা হলো।
ওয়ায়েস ক্বরণী তার সাক্ষাৎকারে বলেছে, সে এমন বিষয় লিখতে চায়, যা উম্মাহর তো উপকারে আসবেই, সাথে যারা ইসলামকে ভালোবাসতে চায়, তারাও যেন পথের দিশা পায়। হ্যাঁ, ওয়ায়েস ক্বরণী তোমাকেই জাতির হাতছানি। হিম্মত করে কেবল এগিয়ে যাও। তোমার সুস্থতা, সফলতা, এবং কামিয়াবি কামনা করছি।
-সম্পাদক

ভাষাচর্চায় কার কাছ থেকে উৎসাহ পেলেন?

ভাষাচর্চা সম্বন্ধীয় কোনো প্রশ্নের সম্মখীন হওয়ার যোগ্যতা মনে হয় আমার নেই। তবে যতটুকু শিখেছি, তাতে সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য, যিনি পরম দাতা, পরম করুণাময়। তারপর কৃতজ্ঞতা সেই মহান ব্যক্তিদের জন্য, যাদের অবলম্বন করে নেমে আসে আসমানের দয়া ও দান। এখানে হাবীবুর রহমান ভাইয়ের কথা উল্ল্যেখ না করলে বড়োই কৃপণতা হবে। আল্লাহ তাকে উত্তম থেকে উত্তম বদলা দান করুন। কেননা, তার কাছ থেকেই সর্বপ্রথম ভাষাচর্চার উৎসাহ পেয়েছি। তারপর হুসাইন আলহুদা ভাইয়ের কথা কী আর বলবো? তার কথা তো সকলেরই জানা। সব থেকে বড়ো কথা তিনি আমাদের মনে লুকিয়ে থাকা "মেসবাহি সাহিত্যের" চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। (আমিন)।

সাহিত্যচর্চায় আপনার পথচলা সম্পর্কে যদি বলতেন!

প্রথম প্রথম তো 'বিস্মিত'কে 'বিসমিতো' এবং এছাড়াও এরকম অনেক শব্দকে ভুল উচ্চারণ করতাম। শুরু থেকে 'ইতোমধ্যে'কে 'ইতিমধ্যে' ব্যবহার করে আসছি। জানি না কতদিন 'ভূল' লিখেছি, টেরও পাইনে যে বানান ভুল হচ্ছে। এছাড়াও কত অগণিত ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে আল্লাহ মা'লুম। সময়ই হলো সব থেকে বড়ো ঔষধ। সময় পেরিয়ে ধীরে ধীরে চলে এল সে শুভ দিনটি অর্থ্যাৎ আমার সাহিত্যাসরের প্রথম দিন। হাবীব ভাই হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই শুরু হল সাহিত্যাসরের প্রত্যেকটা মজলিসে সাধ্যমতো অংশগ্রহণ এবং পাঠাশালার সাপ্তাহিক পাঠ গ্রহণ। আর সমাপনী সভার পূর্বে "লিখিয়ে মিলনমেলায়" অংশগ্রহণ।

আগামীতে কোন বিষয়ে লিখতে চান?

আগামীতে এমন বিষয়ে লিখতে চাই, যা মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের কল্যানকামী সবার উপকারে আসে।

আপনার প্রিয় লেখক?

হযরত আবু তাহের মিসবাহ সাহেব (দা.বা.)।(শিক্ষক, আরবিভাষা ও সাহিত্য মাদরাসাতুল মাদীনাহ, ঢাকা।)
যদি প্রশ্ন করেন কেন? জানি না।

সাহিত্য সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য কী কী বই পড়লেন?

উল্লেখযোগ্য বই বলতে যেমন, পুষ্প সমগ্র প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশনা, বাইতুল্লাহর মুসাফির, বাইতুল্লাহর ছায়ায়, তুরস্কে তুর্কিস্তানের সন্ধানে, ইসলামকে জানতে হলে ইত্যাদি। এছাড়াও সাহিত্যের ক্লাস, বানান চর্চা ও বিভিন্ন উপন্যাস।

উলফত থেকে কী পেলেন?

আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সত্যি বলতে কি, আমি উলফত সম্পর্কিত কিছু বলার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম। আর আপনি সেই সুযোগটাই আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু....। আসলে বলার তো অনেক কিছুই আছে। কিন্তু কোনটা বলি আর কোনটা রাখি বুঝে উঠতে পারছি না।
উলফত শুধু ভাষাচর্চা করতে উৎসাহ দেয়নি বরং সে তো আমাদের মনে মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষা চর্চার প্রেরণা দিয়েছে। তার কাছ থেক জেনেছি, সে এমন একদল বিপ্লবী এবং কলমসৈনিক তৈরি করতে চায়, যারা হবে আগামী প্রজন্মের নীতি নির্ধারক এবং জাতির রাহবার। সে আমার হাত ধরে আগ বাড়িয়ে দিতে চায়। আমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে এসেছি। উলফত আমাকে স্বপ্নের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে শিখিয়েছে, আমি শুধু স্বপ্ন দেখার আনন্দে বিভোর থাকতাম। উলফত আমাকে স্বপ্ন পূরণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে শিখিয়েছে। হায়! যদি, মনের সব কথা প্রকাশ করা বা ব্যাক্ত করা সম্ভব হতো!!

যেহেতু দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে আপন জীবন উৎসর্গ করতে চাই, তাই আমার যোগ্যতা, মেধা ও চিন্তাভাবনা বা যাবতীয় কার্যকলাপ এ পথেই ব্যয় করার দৃঢ় সংকল্প করেছি।

-ইসলাম উদ্দিন, হাইলাকান্দি, আসাম

ইসলাম উদ্দিন ভাই, যাকে দেখলে আমি আনন্দে মেতে ওঠি। কেন?
-জানিনে। একটু মনে করার চেষ্টা করলে বলব: তাকে নিয়ে আমি অনেক আশাবাদি। তার লেখায় যেন কিছু খুঁজে পাই। একটু আবেগ মেখে বলতে চাই; "ভাই, তোমাকে জাতির নেতৃত্বে দেখতে চাই। তুমি লেখো, দেখবে, জাতি জেগে ওঠছে। হিম্মত তো আছে তোমার, কেবল এগিয়ে যাও।"

কিছুদিন আগে ইসলাম ভাই আমার কাছে একটি বার্তা পাঠালেন যে, "বানান-বিপাকে ভুগছি।উত্তরণের পথ চাই।"
হ্যাঁ, তা কেটে যাবে। পাণ্ডুলিপিতে অনেক চমৎকার লেখেও বানান-পর্বে তিনি একটু পিছিয়ে গেছেন। তৃতীয়স্থানে আসার এই মূল হেতু। তবে আমি বলব না যে, বানানভুল না হলে তিনি প্রথস্থান অধিকারী হতেন, কেন? বানান ভুল হবে, আবার বিজয়ের শখ! বাহ! যাগগে, তবে ইসলাম ভাই তুমি অনেক ভালো লেখ। লিখে যাও। আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছি। দেখা হবে বিজয়ের আরও বড়ো মঞ্চে। [ইলাল্লেকা...]

-সম্পাদক

"ভাষাচর্চায়" কার কাছ থেকে উৎসাহ পেলেন?

প্রথমে বলে রাখি, সাক্ষাৎকার দেওয়ার মত যোগ্যতা আমার নেই। তবুও বিনয়ের সাথে বলছি, উলফত পত্রিকায় লেখনী বা সাক্ষাৎকার ছাপা হবে এটা শুধু আমার না, বরং যেকোনো সাহিত্যপ্রেমীর জন্য গৌরবের বিষয়।
বাল্যকালে দৈনিক পত্রিকায় চোখ রাখতাম। তবে আমার দৃষ্টি নিমগ্ন থাকত খেলার পাতায়। পড়তাম পড়া-শেখার নিয়তে নয়। খেলার প্রতি অজানা আকর্ষণ ছিল বলে। আর এটাই আমার অন্তরে মাতৃভাষার মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছে। ২০১৭ তে যখন দেওবন্দে পা রাখলাম, সম্পূর্ণ উর্দু-হিন্দির পরিবেশে; অন্তরে মাতৃভাষার অংকুরটি পেখম মেলার আগেই বিনষ্ট হতে চলছিল। এমন সময় সাক্ষাৎ হয় তাঁর সাথে, সাহিত্যের ময়দানে যার আছে অনেক অবদান, আছে অবাধ সফল বিচরণ। ক্ষুরধার কলম সৈনিক, সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় রশিদ আহমেদ সাহেব। তার উৎসাহ প্রদানে ভাষাচর্চায় সামান্য মনোযোগ দেই। আগে কলম সীমাবদ্ধ ছিল ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ পর্যন্ত। তার উৎসাহে পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পর্যন্ত সীমা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ময়দানে তাকে আমার হাতেখড়ি বলতেই পারি।

সাহিত্যচর্চায় আপনার পথচলা?

সত্যি বললে এখন পর্যন্ত সাহিত্যচর্চায় তেমন সময় দেইনি বা সুযোগ পাইনি। প্রথমত উর্দু-আরবি বলয়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন মুশকিল ব্যাপার। তার উপর নেই পর্যাপ্ত পরিমাণ বই সমাহার। সাহিত্যচর্চার তেমন আগ্রহও ছিল না। তাই এই পথচলা নিয়ে নেই কোনো বিশেষ আলোচনা। এ সফরে দেওবন্দে ভাষা ও সাহিত্যের নবজাগরণ সৃষ্টিকারী উলফতই আমাকে যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা।

আগামীতে কোন বিষয়ে লিখতে চান?

প্রতিটি জিনিসের একটা লক্ষ্য থাকা দরকার। তেমনি দরকার লেখকের কলমেরও। যাতে কোথাও অমার্জনীয় বেপরোয়া আচরণ না করে। যেহেতু দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে আপন জীবন উৎসর্গ করতে চাই, তাই আমার যোগ্যতা, মেধা ও চিন্তাভাবনা বা যাবতীয় কার্যকলাপ এ পথেই ব্যয় করার দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। (আল্লাহ যেন তৌফিক দেন)

আপনার প্রিয় লেখক?

সাহিত্যের কথা বললে আবু তাহের মিছবাহ সাহেব প্রিয়দের তালিকায় শীর্ষে। তাঁর লেখনীশৈলী, শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন যেকোনো পাঠককে করতে পারে মুগ্ধ, মোহিত ও আত্মহারা।

সাহিত্য সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য কী কী বই পড়লেন?

আমার বই অধ্যয়নের তালিকা যৎসামান্য। হাতেগোনা ক'জন সাহিত্যিকের মুষ্টিমেয় কয়েকটি বই পড়েছি।
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলতে মিছবাহ সাহেবেরই কয়েকটি বই। "এসো, কলম মেরামত করি", "তুরস্কে তুরকিস্তানের সন্ধানে", "তোমাকে ভালোবাসি, হে নবী", " বাইতুল্লাহর মুসাফির"। সাথে আছে মিছবাহ সাহেবের প্রিয় শাগরেদ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদবি সাহেবেরও দুটি অমূল্য অনুবাদ গ্রন্থ। যেমন: "তুমি সেই রাজা, তুমি সেই রাণী", " গল্পে আঁকা খাদিজা"।

উলফত থেকে কি পেলেন?

উলফত আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। শুধু আমাকে কেন, দেওবন্দে থাকা বঙ্গবাসী ছাত্রদের দিয়েছে সাহিত্যচর্চার অনুপ্রেরণা। ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়েছে। আক্ষেপের সাথে বলতে বাধ্য যে, উলফত আমাকে যতটুকু দিয়েছে, ততটুকু আমি গ্রহণ করতে পারিনি। বছরের প্রথমে নিস্পৃহা, আর শেষে ব্যস্ততা। আমার বিশ্বাস, উলফতের এ নবজাগরণ দেওবন্দের মাটিতে বাঙালি ছাত্রদের ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় নতুন করে উদ্যোমী করে তুলবে।

- হাজার বছরের দেওবন্দ।
- অস্তিত্বের উনিশ্ শতক ও পুণ্যভূমি দেওবন্দ।
- চাঁদাবিপ্লব ও আবেদের ঝুলি।
- দারুল উলূম ও ইমাম কাসিম নানোতুবী।
- শুভ উদ্বোধন।
- সফলতার প্রথম বর্ষ।
- শিক্ষা বিপ্লব,বিশ্ব জয়ের অখ্যান।
- পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।

শেকড় থেকে শিখরে

পুন্যভূমি দেওবন্দ

-হুসাইন আলহুদা

'তখন কয়েকজন আহলুল্লাহ, বুজুর্গানে দ্বীন -যারা নিজেরাও এ রক্তের হলিখেলায় নিশানা বনে ছিলেন- হিন্দুস্তানের অসহায় মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান হিফাজত করার ফিকর করছিলেন। তাঁদের হারানো অধিকার ফিরিয়ে আনার কোনো অবলম্বন খুঁজছিলেন। ভাগ্যলীলা বলা হোক কিংবা তাকদীরে ইলাহী; ফিকরের মজমাটি বসত দেওবন্দ নামের এই বস্তিতে, ছাত্তা মসজিদেরে জীর্ণ কুঠিরে...'

হাজার বছরের দেওবন্দ

দেওবন্দ আর দারুল উলূম; যেন জমজ দুটি শব্দ। পৃথিবীর যেখানেই দারুল উলূমের জিকির (আলোচনা) হয়, 'দেওবন্দ' সেখানে অবিচ্ছেদ্য থাকে। ইতিহাসবিদরা হাজার বছরের ইতি টেনে দেওবন্দের বসতি সাব্যস্ত করেছেন। বলা হয়: দেওবন্দ 'দেবী-বন' থেকে এসেছে। 'দেবীকুণ্ড' নামে একটি মন্দির ছিল, আর সেটি বনে ছিল। সেখান থেকে বলা হত 'দেবীবন'। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 'দী-বন' লিখা পাওয়া যায়। তো আঞ্চলিকতায় সেটি দেওবন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

রেলপথে রাজধানী দিল্লি থেকে ১৪৪ কিলোমিটার দূরে, গঙ্গা-যমুনার দূরত্বে সবুজ-শ্যামল ভুখণ্ডের একটি উর্বর জনবসতি এটি। বর্তমান এটি ভারতের উত্তরপ্রদেশ (ইউ.পি.)-এর সাহারানপুর জেলার একটি বড়ো তাহসীল। মোগল সম্রাজ্যেও তার এমনই অবস্থান ছিল। তবে এক ইতিহাসবিদ কিছুটা বাস্তবই বলেছেন: দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা না হলে দেওবন্দকে পৃথিবীর কেউ চিনত না। দারুল উলূম নিজের সাথে তার এই মেজবানকেও পৃথিবীতে চমকিয়ে দিয়েছে। নিজের সাথে দেওবন্দকেও আসীন করেছে শেকড় থেকে শিখরে।

অস্তিত্বের উনিশশতক ও পুণ্যভূমি দেওবন্দ

হিন্দুস্তানে ইলমে দ্বীনের চর্চা হিজরী ২য় শতাব্দিতে, সিন্দু বিজয়ের প্রেক্ষাপটে চালু হয়েছিল। এক্ষেত্রে 'মাদীনাতুল ইলম' বা 'জ্ঞানের শহর' ধরা হয় 'মুলতানকে'। ওলামায়ে কেরাম এই ভূখণ্ডকে ইলমের আলোয় আলোকিত করেছেন। এর পর গজনি সম্রাজ্যের আমলে এর কেন্দ্রায়ন দখল করে নেয় তখনকার প্রসিদ্ধ শহর 'লাহোর'। ফের সপ্তম শতাব্দিতে এই 'জ্ঞান-সূরুজ' উদয় হয় দিল্লির সচ্ছাকাশে। দিল্লীর আলোকছটায় আবাদ হয় 'জৌনপুর'। জৌনপুরের আলোয় আলোকিত হয় 'লখনৌ'। লখনৌ হয়ে এই রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে পুবের প্রতিটি আবাদ বস্তিতে। বলগ্রাম, খাইরাবাদ, বিহার হয়ে বাঙ্গাল...। তো দিল্লী উপমহাদেশের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হওয়াতে,ইলম পিপাসুরা নিজেদের তৃষ্ণা মেটাতে এখানে ভিড় জমাতে। মোগল সম্রাজ্যের শেষের দিকে এই পুণ্যভূমিতে আগমন ঘটে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. (১১৭২হি./১৭০৬ ঈ.) এর মত মনীষীর। যার নিরঝরনি থেকে এশিয়ার অধিকাংশ এলাকা আজও সজিবতা গ্রহণ করছে। এ সময়ে ইলমে দ্বীনের যতগুলো শাখা-প্রশাখা বিশেষত: হাদীস ও তাফসীরের যতগুলো সিলসিলা চলমান রয়েছে, সবের প্রারম্ভ এ 'খান্দানে ওয়ালিউল্লাহর' অবদানে। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ. এক ভিনদেশি আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন: "হিন্দুস্তানের যেখানেই বিচরণ করেছি, এমন কোনো আলিম খুঁজে পাইনি, যে শাহ্ আব্দুল আজিজ রহ. (ওফাত: ১২৩৯হি./১৮২৩ ঈ.) এর মধ্যস্থতায় শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর শাগরেদ নয়!"

উনিশ শতকের শেষোর্ধে, হিন্দুস্তানের মুসলিম কর্তৃত্ব হটাৎ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। যার টাল সামলানো আর সম্ভব হয়নি। চতুর ইংরেজ বেনিয়ারা দেড়'শ বছরের লাগাতার ষড়যন্ত্রে ১৮৫৭ সালে দিল্লীর লালকেল্লা পর্যন্ত দখল করে নেয়। অন্যদিকে ইংরেজ-বদমাশদের প্রধান টার্গেট ছিল হিন্দুস্তান থেকে মুসলিম সংস্কৃতি মিটিয়ে দেবে। মুসলিম প্রজন্মকে মুর্খ আর দরিদ্র বানিয়ে তাদের ধর্মীয় চেতনা কেড়ে নেবে। তাই তারা চতুর্মুখি ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। ১৮৫৩ ঈসায়িতে তারা হিন্দুস্তানের জন্য ব্রিটিশ-শিক্ষা-সিলেবাস তৈরি করে। এর মূল হোতা লর্ড মীকালের মৌলিক ইস্যু ছিল: এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করা হবে, যারা বংশে হিন্দুস্তানি হবে, কিন্তু চিন্তা-চেতনা আর কর্মে খ্রিস্টান হবে। সাথে সাথে তারা ভারতের প্রচলিত প্রায় সকল ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে; বিতরণ করতে থাকে। লক্ষ লক্ষ পাদ্রী এনে গ্রাম-গঞ্জে, বাজার-হাটে ছেড়ে দেয়। তারা যেখানে সেখানে ইসলামকে তাচ্ছিল্য করতে থাকে। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করতে থাকে। সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে চলে। এই পরিস্থিতিতে মিরাঠ থেকে সিপাহি বিপ্লবের হুংকার ওঠে। মিরাঠের সেনাচৌকিতে মুসলিম সৈনিকরা ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করে। এরপর নির্বাসিত আখেরি মুগল সম্রাট 'বাহাদুর শাহের' নামে শ্লোগান তোলে দিল্লি অভিমুখে ছোটে। প্রথমে তো ইংরেজদের অস্তিত্ব তোপের মুখে পড়ে। কিন্তু আখের মুসলমানরা পরাজিত হয়। এতে ইংরেজরা তাদের অন্তরে চেপে রাখা মুসলিম বিদ্বেষ পুরোদমে প্রকাশ করে। মুসলিম দমন পীড়নে সর্বশক্তি ব্যয় করে। এতে যেমন লক্ষ লক্ষ মুসলিম নেতৃবর্গ, ওলামায়ে কেরাম ফাঁসির কাষ্ঠে বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন। অন্যদিকে বাকি জ্ঞানীগুণীরা মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং হিজরত করেন।

তো দিল্লী; যা মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তা একেবারে বীরাণ হয়ে পড়ে। হিন্দুস্তানি মুসলমানরা একেবারে এতিম হয়ে পড়ে। এমন কোনো উৎস বাকি ছিল না; যেখান থেকে তারা আশা বাঁধবে। এমন কোনো ব্যক্তি বাকি ছিলেন না, যে তাদেরকে সাহস জোগাবে, সান্ত্বনা দেবে, স্বপ্ন দেখাবে।

প্রতিষ্ঠাকালীন মুহতামিমগণ:

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার চারদিনের মাথায় পরিচালনা কমিটির পক্ষে একটি আবেদন পত্র বিলি করা হয়। সেখানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়, সাথে আম জনতা সমীপে চাঁদার আবেদনও করা হয় । শেষে 'নামে মুহতামিমান' শিরোনামে কয়েকজন মনীষীর নাম পেশ করা হয়: হাজী আবিদ হুসাইন, মৌলবি মুহাম্মদ কাসিম নানোতবি, মৌলবি মাহতাব আলী, মৌলবি জুলফিকার আলী, মৌলবি ফজলে হক, শাইখ নিহাল আহমদ।

[মাওলানা কাসিম নানুতুবী হালত অ্যাওর কারনামে পৃ:১৩১ ।]

১. হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসিম নানোতবি রহ.[১২৪৮-১২৯৭হি.]

হজরত মাওলানা কাসিম নানোতবি রাহ. ছিলেন দারুল উলূমের মূল স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রথম পৃষ্ঠপোষক। ওলামায়ে দেওবন্দের মূল চেতনা ও মহান সিফাহসালার। তিনি একাধারে যেমন ছিলেন 'উলূমে আকলী' [যুক্তিবিদ্যা] এবং 'উলূমমে নাকলী [কুরআন সুন্নাত থেকে নির্গত প্রজ্ঞা]- এর মাহা পণ্ডিত, তেমনি ছিলেন হিন্দুস্তানের ওলামাদের উস্তাদ ও মুরব্বি।

১২৪৮হিজরিতে সাহারানপুর জেলার 'নানোতা' নামক গ্রামে হজরতের শুভজন্ম।এলাকাটি ঐতিহাসিকভাবেই যুগশ্রেষ্ঠ মহা মনীষীদের পুন্যময়ী মাতৃভূমি। নিজ এলাকাতেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। মক্তবের শিক্ষা শেষ হলে তাকে দেওবন্দ এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে কিছুদিন এলাকার জমিদার শাইখ কারমত আলীর 'কাঁচারিতে' মৌলবি মাহতাব আলী সাহেবের কাছে পড়াশোনা করেন। এরপর হযরতের নানা মৌলবি ওয়াজীহুদ্দিন সাহেবের কাছে সাহারানপুর চলে যান; তাঁর নানা সাহারনপুর কোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে সারফ-নাহুসহ আরবি সিলিবাসের প্রাথমিক কিতাবগুলো পড়েন। শেষে নানোতার আরেক মনীষী মাওলানা মামলুকুল আলী সাহেব রহ.-এর সাথে দিল্লি চলে যান। যিনি দিল্লি অ্যারাবিক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আল্লামা কাসিম নানোতবি রহ.ও অ্যারাবিক কলেজে ভর্তি নেন। তবে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নিতেন না। হয়তো ইংরেজদের সার্টিফিকেট নিতে রাজি ছিলেন না। একই সময় দিল্লি কলেজে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.ও পড়তেন। তাই উভয়জন এই সূত্রে =

তখন কয়েকজন 'আহলুল্লাহ', বুজুর্গানে দ্বীন - যারা নিজেরাও এ রক্তের হলিখেলায় নিশানা বনে ছিলেন- হিন্দুস্তানের অসহায় মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান হিফাজত করার ফিক্র করছিলেন। তাদের হারানো অধিকার ফিরিয়ে আনার কোনো অবলম্বন খুঁজছিলেন। ভাগ্যলীলা বলা হোক কিংবা 'তাকদীরে ইলাহী'; এই ফিক্রের এই মজমা বসত দেওবন্দ নামের এই বস্তিতে, ছাত্তা মসজিদেরে জীর্ণ কুঠিরে।

[তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ:পৃ :১৪৯]

চাঁদা বিপ্লব ও 'আবেদের' ঝুলি....

মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান হিফাজত করার জন্য যেন 'ইলহামী'-ভাবে ছাত্তা মসজিদের এই বুজুর্গগণ একমত হলেন যে, 'একটি মাদ্রাসা কায়েম করা হবে'। পরামর্শ সভায় কেউ বললেন: আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান হিফাজত করার জন্য একটি মাদরাসা কয়েম করা দরকার। কেউ বললেন: একথাটি আমার কছে কাশফ হয়েছে। কেউ বললেন: আমার অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত হলো যে, 'মুসলমানদের দ্বীন রক্ষার বিকল্প অবলম্বন হিসেবে একটি মদ্রাসা কয়েম করা হবে'। [দারুল উলূম দেওবন্দ কী জামে' অ্যাওর মুখতাসার তারীখ: ৫৯]

কিন্তু অর্থায়ন কোত্থেকে হবে? এযাবৎকাল তেরো'শ বছরের ইসলামের ইতিহাসে মদ্রাসার কিয়াম, খরচাদি, কিতাবাদির সরবরাহ, সবকিছু রাজা-বাদশাহদের পক্ষ থেকে হত। হ্যাঁ, হিন্দুস্তানের জমিদাররাও নিজ নিজ এলাকায় মাজসিদ, মাকতাব এবং প্রাথমিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের পর, একদিকে যেমন; মুসলমানদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হয়, অন্যদিকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা নবাব জমিদারদের কোনো-না-কোনোভাবে ফাঁসির কণ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে ইসলামি শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে থমকে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে বিকল্পধারা আবিষ্কার করা ছিলো সময়ের অপরিহার্য দাবি। আজ থেকে দেড়'শ বছর আগে কারও কল্পনায়ও ছিল না যে, ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা শেষ হয়েছে, তবে গরীবদের পৃষ্ঠপোষকতা এখনও বাকি আছে। হাজারো-লাখো মুসলমান মিলে একটি মাদ্রাসার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারে। (এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করাই ছিলো সময়ের শ্রেষ্ঠ চাহিদা।)

সর্বপ্রথম এই বিপ্লবের দানা রোপন করেন; হাজি সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন রহ.। সাওয়ানিহে কসিমি গ্রন্থ থেকে চিত্রটি তোলে ধরা হলো:

> একদিন ইশরাকের সময়ে, হজরত হাজি সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন রহ. সাদা রুমালের ঝুলি বানালেন, নিজের পক্ষ থেকে তিন রুপি রাখলেন। ছাত্তা মাসজিদের নির্জন অধিবাসী মৌলবি মাহতাব আলী রাহ-এর কাছে তাশরীফ নিলেন। মৌলবি সাহেব আনন্দচিত্তে ছয় রুপি দান করলেন এবং দোয়া দিলেন। বারো রুপি দান করলেন মৌলবি ফজলুর রহমান সাহেব। অধম [সাওয়ানেহে মাখতুতা লেখক হাজি ফজলে হক সাহেব] পেশ করেছে ছয় রুপি। সেখান থেকে উঠে মৌলবি জুলফিকার আলী 'সাল্লামাহুর' কাছে গেলেন। মৌলবি সাহেবও মাশাআল্লাহ জ্ঞানপ্রেমী, সাথে সাথে বারো রুপি দান করলেন। কাকতালীয়ভাবে সেখানে সাইয়্যেদ জুলফিকার আলী সানি দেওবন্দি রহ. উপস্থিত ছিলেন। তার পক্ষ থেকে এল বারো রুপি। সেখান থেকে দরবেশ-বেশি, বাদশাহগুণের এই মনীষীটি (দেওবন্দের) মহল্লা 'আবুল বরাকাত' পৌঁছলেন...। দু'শ রুপি একাট্টা হয়ে গেল। বিকাল পর্যন্ত সংগ্রহ হলো তিন'শ রুপি। পরে আরও চর্চা হলো । শেষের আখ্যান তো সবার সামনে...। এই ঘটনাটি ২রা যিলক'দা ১২৮২হিজরি [মুতাবিক: মার্চ ১৮৬৬ ঈ.]
>
> [সাওয়ানিহে কসিমি, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী রহ. কৃত। [সাওয়ানেহে মাখতুতার উদ্ধৃতিতে] : সৌজন্যে, তারীখে দেওবন্দ, পৃ.১৫১]

প্রতিষ্ঠাকালীন মুহতামিমগণ:

=সহপাঠিও। তাঁরা মাধ্যমিক স্তরের কিতাবগুলো মাওলানা মামলুক আলী রাহ এর কাছে পড়েন। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. এর মসনদে স্থলাভিষিক্ত ছিলেন মুসনাদে ওলামায়ে দেওবন্দি, শাহ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদি রহ.। হাদীস পড়ার জন্য কাসিম নানোতবি রাহ. তাঁর কাছে গমন করেন। আল্লামা কাসিম নানোতবি রহ. এর জীবনের অধিকাংশ সময় সংগ্রাম, বিপ্লব, মুনাজারা এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় কেটেছে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মজীবন বলতে তেমন কিছু হযরতের জীবনীতে খোঁজ পাওয়া যায় না। আবশ্য মাঝে অনেক বছর কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) কিতাব সম্পাদনা করতেন। অবসর সময়ে হাদীসের দারস দিতেনঅবসর সময়ে হাদীসের দারস দিতেন। দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা মূলত হযরতের ফিকরেই অস্তিত্বে এসেছে। বাহ্যত হাজি সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন রহ.কাজ শুরু করেছেন, তবে পেছন থেকে পূর্ণ তত্ত্বাবধান হজরতই করেছেন, তাঁর পরিকল্পনাতেই দারুল উলূম আজ বিশ্বজয়ী। ৪র্থ জামাদিউল উলা, ১২৯৭হি.-১৫এপ্রিল ১৮৮০ঈ. হজরতের ওফাত হয়।

২. হাজি সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন সাহিব রহ.[১২৫০-১৩১৩হি.]

হাজি সাহেব রহ.ছিলেন দেওবন্দ এলাকার একজন মান্যবর, প্রভাবশালী ও ছূফি ব্যক্তিত্ব। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম মুহতামিম এবং চাঁদা বিপ্লবের পুরধাব্যাক্তি। ছিলেন চিশতীয়া সাবেরিয়া সিলসিলার একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব । লাগাতার ষাট বছর পর্যন্ত ছাত্তা মসজিদে [নফল] ইতেকাফ করেছেন। প্রসিদ্ধি আছে যে,ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁর 'তাকবিরে উলা' ছুটেনি। তাহাজ্জুদের এত ইহতিমাম করতেন যে, কাজা করার সুযোগই আসেনি। কুরআনে কারীম ও ফার্সীর সিলিবাস শেষ করে দ্বীনী শিক্ষা আর্জন করেন দিল্লী থেকে। তাসাওউফে তিনি মিয়াজী করীম বখশ সাবেরি রহ.এর খলীফা ছিলেন। এছাড়াও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.এর হাতেও বাইয়াত হয়েছেন। কেউ কেউ তাঁর থেকে খিলাফত লাভের কথাও বলেছেন। অত্যন্ত কর্মঠ ও উদ্যোগী ছিলেন। দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার মূল চেতনা আল্লামা কাসিম নানোতবি রহ.এর হলেও বাস্তবায়ন কিন্তু হাজী সাহেবের হাতেই সম্পাদিত হয়। পর পর তিনবার মুহতামিমের দায়িত্ব তার কাঁধেই ন্যস্ত হয়। এছাড়াও =

প্রিয় পাঠক,আজ 'নবাবি' [বাদশা-জমিদারদের] যুগ কল্পকথায় রূপ নিয়েছে। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু কাশ্মির থেকে আসাম (পুরো উপমহাদেশে) রাষ্ট্রীয় ছত্র-ছায়া ছাড়াই লক্ষাধিক মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। সত্যি ইতিপূর্বে তা কল্পনা বহির্ভূত ছিলে। তাহরীকে খিলাফত উপলক্ষ্যে, মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার রাহ. [যিনি স্যার সাইয়্যেদ আহমদ ঘরণার চেতনাধারী ছিলেন, মানে সরকারের তাবেদারি করে কোনোভাবে মুসলিম অস্তিত্ব রক্ষা করা।]- দারুল উলূমে এসেছিলেন। তখন উসূলে 'হাশতেগানা' [দারুল উলূমের মৌলিক আটটি নীতিমালা; যা মূলত এই চাঁদা বিপ্লবেরই সংবিধান ছিল] পড়তে গিয়ে কেঁদে পেলেন এবং বলেন: এই উসুলগুলোর [নীতিগুলোর] সাথে মানবিক 'আকলের' [চিন্তা-বুদ্ধির] কোথায় সম্পর্ক? [নিশ্চয় এগুলো ইলহামি] শত বছরের ধাক্কা খেয়ে আমরা আজ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি- হয়রান হতে হয়, ওই বুযুর্গগুলো বহু আগেই তা আবিষ্কার করে রেখেছেন।

দারুল উলূম ও ইমাম কাসিম নানোতবি

১৮৫৭ সনের সিপাহি বিপ্লবের পর থেকে ১৮৬৬ ঈ. পর্যন্ত ৯/১০বছর পর্যন্ত কোথাও কোনো খালেস দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ছিল না। অন্যদিকে ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম নেতৃবর্গের উপর চলছিল কঠিন দমন-পীড়ন। কাসিম নানোতবি রাহ. থানা ভবন থেকে ওঠা জিহাদের কমান্ডার-অফ-চিফ ছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কঠিন গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হয়। মুজাহিদীনদের মাঝে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (আমীর); মুক্কা মুকাররমা হিজরত করেন। হাফেয জামিন শহীদ রাহ. (প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়); শহীদ হন। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. (বিচারপতি); গ্রেফতার হন।

কাসিম নানোতবি রহ. আত্মগোপন করে দেওবন্দে এসে আবস্থান করেন। এর আগে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা এখানেই আর্জন করেছিলেন। পরববর্তীতে এই এলাকায় তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কও কায়েম হয়। তো ইংরেজদের দমন-পীড়ন রুখতে ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষায়, বিকল্পধারা আবলম্বলের লক্ষ্যে, দেওবন্দের ছাত্তা মাসজিদে যে মাজমা অনষ্ঠিত হত;তার প্রাণকেন্দ্র ছিলেন হজরত নানোতবি রহ.। চার বছর পর্যন্ত হজরত আত্মোগোপনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করেন। মাঝে হজ্জের সফরে বের হন। চার বছর পর পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলে, হজরত পূবেয্র কর্মস্থলে (মাতবা'য়ে তাসহীহে কুতুবে/ছাপাখানার কিতাব সম্পাদনায়) ফিরে যান। আর অবসর স য়ে কুতুবে সিত্তার দরস দিতেন। এদিকে হাজি সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন রহ. যিনি কাসিম নানোতবি রহ. এর ফিক্‌রে, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার গভীর ভাবনায় মগ্ন ছিলেন। একদিন তিনি স্ব-উদ্যোগে একটি পন্থা আবিষ্কার করেন এবং ঝুলি নিয়ে বের হন। যা অত্যন্ত ফলপ্রসু সাব্যস্ত হয়। তাই সাথে সাথে মূল স্বপ্নদ্রষ্টা; কাসিম নানোতবি রহ.-এর কাছে চিঠি লিখেন:
আল্লামা ইব্রাহীম বালয়াবি রহ.এর বর্ণনায় চিঠির বাক্যগুলো এমন ছিল:

> ...ওই যে, আপনার সাথে আমাদের বিভিন্ন মজলিসে পর্যালোচনা হত; একটি মাদ্রাসা কায়েম হওয়া চাই। কেননা, একটা মাসাআলা জিজ্ঞেস করার জন্য সাহারানপুর লোক পাঠাতে হয়। ফকিরের (অধমের) অন্তরে [মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে] আত্মবিশ্বাস জমে গেল। তাই চাঁদার জন্য বেরিয়ে গেলাম। কাল আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত তিনশ রুপি জমা হয়ে গেল...। আপনি পড়ানোর জন্য দেওবন্দ তাশরীফ নিয়ে আসুন। অধম এই পন্থাটি (চাঁদা পদ্ধতি) গ্রহণ করেছি।
>
> [সাওয়ানিহে কাসিমী: ২খ.,২৫০পৃ., মাওলানা কাসিম নানোতবি; হালত অ্যওর কারনামে- এর উদ্ধৃতিতে :১২৭]

তার মানে কাসিম নানোতবি রহ. এরও ফিকির ছিলো একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কিন্তু পরিস্থিতি তাঁকে সিমাবদ্ধ করে রেখেছিল। এদিকে তা আল্লাহ তাআলার মঞ্জুরি ছিল। তাই হাজি সাহেবের হাতে তা অস্তিত্বে আসে। জবাবপত্রে কাসিম নানোতবি রহ. লিখেন:

> "শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, আল্লাহ তা'য়ালা কল্যাণ করুন। মৌলবি মাহমূদ সাহেবকে 'পনেরো রুপি' মাসিক বেতনে নিয়োগ দিয়ে প্রেরণ করছি, সে পড়াবে। আমি মাদ্রাসাটির সহযোগী হিসেবে থাকব।" [তাযকিরাতুল আবিদীন পৃ:৬৯]

প্রতিষ্ঠাকালীন মুহতামিমগণ:

= দেওবন্দের আলীশান *জামে মাসজিদের নির্মাণও* তাঁর উদ্যোগ এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়। হাজি সাহেব রহ.এর ইন্তিকাল দারুল উলূমের পরিচালনার জন্য ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। যেন তিনি না হলে চলবে না। এই ক্ষনজন্মা মহা মনীষী ২৭যিলহজ্জা ১৩৩৩ হি মুতা. ২৭ নভেম্বর ১৯১৩ ঈসায়িতে ৮১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৩. হজরত মাওলানা মাহতাব আলি দেওবন্দি রহ. [১২৯৩হি., ১৮৭২ঈসায়ি]

হজরত মাওলানা মাহতাব আলী সাহেব রহ.দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাদের একজন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মজলিসে শূরার রুকন ছিলেন। তিনি শাইখুল হিন্দ রাহ.এর জ্যাঠা [বড়ো চাচা] হতেন। মানে মাও. জুফিকার আলী সাহেবের বড়ো ভাই ছিলেন। ইলম-আমলে তিনি দেওবন্দ এলাকার শ্রেষ্ঠ ওলামাদের একজন ছিলেন। হজরত কাসিম নানোতবি রাহ.আরবি সিলিবাসের প্রাথমিক কিতাবগুলো তাঁর কাছেই পড়েছেন। দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা, এবং এটির অগ্রগামিতায় তিনি হাজী আবিদ হুসাইন সাহেবের কাছের সহযোগী এবং পরামর্শদাতা ছিলেন।

দিল্লি অ্যারাবিক কলেজে তিনিও মাওলানা মামলুকল আলী সাহেবের কাছে পড়েছেন। ফারেগ হওয়ার দেওবন্দে ফিরে এসে যেহেতু পারিবারে প্রচুর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। তাই কোথাও চাকরি না করে ইলমের খিদমতে পড়াতে বসে যান। শাইখ কারামাত আলী সাহেবের কাচাঁরিতে তিনি আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে পড়াতেন। হজরত কাসিম নানোতবি রহ. তাঁর কাছে এখানেই পড়েছেন।

দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় আর্থিক উৎস খোঁজতে গিয়ে সাধারণ চাঁদা প্রথা চালু করা হচ্ছিল; হাজী আবিদ সাহেব রহ.তাঁর মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। সর্বপ্রথম তাঁর চাঁদাই ঝুলিতে জমা হয়েছে। কেবল এতটুকুই নয়, তিনি দারুল উলূমের সকল কার্যক্রমে উদ্যমী কর্মী হিসেবে অবতীর্ণ হতেন। দারুল উলূমের উদ্বোধনের চার দিন পর চাঁদার আবেদন করে যে প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়, তাতে হাজি সাহেব এবং আল্লামা কাসিম নানোতবি রহ.এর পরই তাঁর নাম তৃতীয়স্থানে নাম রাখা হয়। দারুল উলূমের বার্ষিক পরীক্ষা বাহির থেকে এসে অধিকাংশ সময় তিনিই নিতেন। ১২৯৩ হিজরি-১৮৭২ঈসায়িতে এই মনীষী ইহকাল ত্যাগ করেন। =

দেওবন্দ এলাকার উলামা, সুলাহা, মাশায়িখে কিরাম এবং সামাজিক নেতৃবর্গ ছাত্তা মসজিদে জমায়েত হলেন

শুভ উদ্বোধন

হাজি সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন রহ.এঁর রাত-দিনের একাকার মেহনতে তিন শতাধিক রুপির অর্থ জমা হয়। এ দিকে মাদ্রাসা মূল স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা কাসিম নানোতবি রহ.-কে মিরাঠ পানে চিঠি লেখে মাদ্রাসা উদ্ধোধনের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়। তিনি মোল্লা মাহমূদকে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। আর প্রাথমিক অবস্থায় মাদরাসার জন্য ভবনের প্রয়োজন ছিল না। ছাত্তা মাসজিদের পাশের দুয়েকটা কামরাই যথেষ্ঠ ছিলো। দেওবন্দ এলাকার উলামা, সুলাহা, মাশায়িখে কিরাম এবং সামাজিক নেতৃবর্গ ছাত্তা মসজিদে জমায়েত হলেন। মোল্লা মাহমূদ দেওবন্দি উস্তাদের আসনে বসলেন, শাগরিদ হিসেবে তার সামনে কিতাব খোলে বসলেন নও-জোয়ান; মাহমূদ হাসান বিন জুলফিকার আলী দেওবন্দি। দিনটি ছিলোঃ বৃহ.বার, ১৫ই মোহররম ১২৮৩হি.-৩১শে মে, ১৮৬৬ ঈ.।

[তারীখে দেওবন্দ:খ:১,পৃ:১৫৫, মাওলানা কাসিম নানোতবি; হালত অ্যাওর কারনামে পৃ:১২৮।]

উল্লেখ্য যে, শাইখুল হিন্দ রাহ. ইতিপূর্বে ‘কুদূরী কিতাব’ পর্যন্ত পড়ে নিয়েছিলেন। বাকি কিতাবগুলো মোল্লা মাহমূদ সাহেব রহ.এর কাছে শুরু করেছিলেন। দাওরা হাদীসের কিতাবগুলো পড়েছেন মিরাটে হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসিম নানোতবি রাহ. এর কাছে। আর দারুল উলূমের ‘এক উস্তাদ এক শাগরীদ’ এই চিত্রটি হয়তো উড্ডধনী অনুষ্ঠানের। নতুবা দারুল উলূমের রো-দাদ (দৈনিক কার্যবিবরণী) থেকে জানা যায়, প্রথম থেকে মাদ্রাসা ছাত্র সংখ্যা ২১জন ছিল। [তারীখে দেওবন্দ:খ:১,পৃ:১৫৭]

সফলতার প্রথম বর্ষ:

দারুল উলূম দেওবন্দের পথচলা একেবারে রিক্তহস্তে শুরু হয়েছিল। না শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত বসার জায়গা ছিল। না থাকা-খাওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে তা উন্নায়নের পথে দূর্বার গতিতে পা বাড়িয়েছে। নিকট অতীত ছাড়াও দূর-দুরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে এল। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে একটি গতানুগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্ষশেষে রো-দাদ নামে যে কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়; সেখান থেকে দুয়েকটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হল:

একটি আবেদন পত্র:

*“মুহতারাম,
১২৮৩ হিজরীতে ছাত্র সংখ্যা ছিলো ২১জন। বছরের শেষ পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮জনে। এর মধ্যে ৫৮জন বইরের এলাকা (বেনারস, পাঞ্জাব, আফগানিস্তান) থেকে এসেছে। তাদের মাঝে ৫২জনের খোর-পোষ দেওবন্দবাসী সরবরাহ করে থাকে। বাকী ৬জন নিজের পক্ষ থেকে খানা খায়...।”*

“শিক্ষা-কার্যক্রম সবমিলিয়ে প্রশংসাযোগ্য। শিক্ষক মহোদয়দের প্রচেষ্টায় ফলাফল অনেক উন্নত। কিছু শিক্ষার্থী মিজান পড়ত; তারা কাফিয়া পড়ছে। কিছু মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপন করতে যাচ্ছে...।”

[রো-দাদ সালে আওয়াল: পৃষ্ঠা: ১-২]

মাদ্রাসার উদ্বোধন এক উস্তাদ দিয়ে হলেও, মধ্য বছরে প্রয়োজন বশত আরও চার জন উস্তাদ নিয়োগ দেওয়া হয়। মাওলানা ইয়াকুব নানোতবি রহ.;যিনি সাহারনপুর,বেনারস,আজমগড়সহ কয়েকটি বড়ো বড়ো জেলার শিক্ষা ডিপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন, তাঁকে সাদরুল মুদাররিসীন [প্রধান শিক্ষক] হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়াও আরও কয়েকজনকে বিভিন্ন বিভাগের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। রো-দাদ [কার্যবিবরণী] থেকে:

‘মৌলবি মুহাম্মদ ইয়াকুব নানোতবি রহ.-মুদাররেসে নানোতবি-এবং মোল্লা মাহমূদ দেওবন্দি রহ.-দ্বয়ের কৃজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের উপর ওয়াজিব; তাদের প্রচেষ্টায় সল্প সময়ে, ছাত্রসংখ্যা এবং ছাত্রদের যোগ্যতায় অস্বাভাবিক উন্নয়ন ঘটেছে। এবং অন্যান্য উস্তাদবৃন্দ; মৌলবি মোহাম্মদ ফাজিল, মৌলবি মীর বাজ খান, মৌলবি ফাত্হ মোহাম্মদ ও হাফিজ আহমদ হাসান প্রমূখ সাহেবরাও উদ্যমতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব আদায় করেছেন’।

[রোদাদ সালে আওয়াল:৩]

প্রতিষ্ঠাকালীন মুহতামিমগণ:

= ৪. মাওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দি রহ.[১৩২২হি./১৯০৪ঈ.]

মাওলানা জুলফিকার আলি দেওবন্দি রহ.ও দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। দারুল উলূমের প্রথম মাজলিসে শূরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। একজন জায়্যেদ [প্রাজ্ঞ] আলেমেদীন ও আরবি ভাষার অনেক বড়ো আদীব [সাহিত্য বিশারদ] ও ছিলেন । এছাড়াও তার মর্যদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ যে, তিনি দারুল উলূমের প্রথম তালিবে ইলম [শিক্ষার্থী],পরবর্তি পৃথিবীর শাইখুল হিন্দ ;মাহমূদ হাসান দেওবন্দি রাহ,এর গর্বিত পিতা।
দিল্লি অ্যারাবিক কলেজে মাওলানা মামলুকুল আলী নানোতবি রহ.(১২৬৭হি.)-এর কাছে ইলম অর্জন করেছেন, এবং তাঁর খাছ শাগরিদদের একজন। শিক্ষাগত যোগ্যাতা বলে তাড়াতাড়ি উন্নতি সাধন করেছেন। ফারেগ হওয়ার পর [পড়ালেখা সম্পন্ন করার পর] বেরলবি কলেজে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ হন। কিছুদিন পর ডিপুটি ইন্সপেক্টর,পরে ‘ইন্সপেক্টর অফ ইবতিদায়ী মাদারিস’ পদে আসীন হন। তিনি আরবি-উর্দু-ফারসির সমানতালে সাহিত্যিক ছিলেন। আরবিভাষায় তার ‘আদব’ [আরবি সাহিত্য], ‘মাআনী’ [ভাষাতত্ত্ব],বালাগাত [আরবি বাক্যশৈলি], ইলমুল হিসাব [অংক] ইত্যাদি শাস্ত্রে তিনি কিছু দুর্লভ কিতাব রচনা করেছেন। ‘তাসহীলুল মাআনী শারহে দেওয়ানে মুতানাব্বিহ’,‘আত্ তা‘লিকাত আ‘লাস সাবয়িল মুআল্লিকাত’,‘ইতরিল ওয়ারদা’, ‘মি‘য়ারুল বালাগাহ’, ‘আল হাদিয়াতুস সানিয়্যাহ ফী জিকরিল মাদরাসাতিল ইসলামিয়াতিল দিয়োবান্দিয়্যাহ’, ‘তাসহীলুল হিসাব’ ইত্যাদি। হকীম আব্দুল হাই হাসানী রাহ. ‘নুযহাতুল খাওয়াতিরে’ লিখেন: ‘আদব শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ওলামাদের একজন।’
১৩২২হিজরি মুতাবেক ১৯০৪ ঈসায়িতে দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন। ‘মাজারে কাসিমি’তে আল্লামা কাসিম নানুতুবী রাহ.এর পূর্ব কোণে তার কবর অবস্থিত। =

প্রথমবর্ষ বার্ষিক পরীক্ষা:

প্রথম বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় ৭৮জন থেকে ৭৩জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষা নিতে আসেন মিরাট থেকে মাওলানা কাসিম নানোতবি আর দেওবন্দ থেকে মাওলানা মাহতাব আলি ও মাওলানা জুলফিকার আলী সাহেব। তো পরীক্ষা শেষে রো-দাদে [কার্যবিবরণীতে] তারা নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে লেখেন:

"আমরা কয়েকদিন যাবত প্রতিটি স্তরের [শ্রেণির] বিস্তারিত পরীক্ষা নিয়েছি। প্রশ্ন কঠিন স্থান থেকে নির্বাচন করেছি। প্রত্যেক কিতাবের আলাদা আলাদা নম্বর লাগিয়েছি। মাদ্রাসার সার্বিক অবস্থান প্রশংসাযোগ্য । পরীক্ষার ফলাফল উন্নত; যা শিক্ষকদের প্রচেষ্টা আর ছাত্রদের মেহনতের এক জ্বলন্ত ভাস্বর।..."

শিক্ষা বিপ্লব; বিশ্বজয়ের আখ্যান...

হিজরি তেরো শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, হিন্দুস্তানের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা তথা: মাদ্রাসা-মাকতাবাগুলো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। দুয়েকটি মাদ্রাসা কোনো রকম গা ঠেলে দাঁড়িয়ে থাকলেও; তা নিজ এলাকায় অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জে নিভুনিভু করছিল । এ ছাড়াও আগের শিক্ষা-সিলেবাসে মানতিক ফালসাফার জোর ছিলো সর্বাঙ্গে। হাদীস-তাফসীরের কিঞ্চিৎ আঁচ খুঁজে পাওয়া যেত মাত্র। বিপরীতে দারুল উলূমের চিন্তা চেতনা ছিল 'ওয়ালিউল্লাহি কর্মদ্বারায়' প্রভাবিত। তাই এর সিলিবাসে, একদিকে যেমন হাদীস ও তাফসীরের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বেশি। অন্যদিকে (প্রয়োজনীয়) জাগতিক সিলেবাসের অন্তরভুক্তিও ছিলো বেশ। তো প্রথমত দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা, সাথে তার সর্ব-সমন্বিত শিক্ষা সিলেবাস; উভয়দৃষ্টিকোণ থেকেই তা কেন্দ্রায়নের পুরোপুরি উপযুক্ত ছিল। ঘটেছেও তাই । দারুল উলূমের পর, উপমহাদেশে যত মাদরাসাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; সবগুলোতে দারুল উলূমের কর্মদ্বারাই অনুসৃত হয়েছে ।

যথা: দারুল উলূমের ছয় মাস পর প্রতিষ্ঠিত হয় সাহারানপুরের 'মাযাহিরে উলূম'। তাতেও দারুল উলূমের সিলেবাসই অন্তরভুক্ত করা হয়। একইভাবে 'মাদরাসায়ে থানাভবন'। মাদরাসায়ে আরাবী মিরাঠ'। 'মাদরাসায়ে ইসলামী গোলাওঠী'। মাদরাসায়ে ইসলামী দানপুর'। 'মাদরাসায়ে ইসলামী মুরাদাবাদ' , ইত্যাদি মাদরাসাগুলোও, ওই সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এবং দারুল উলূমের সাথে নিজেদের কেন্দ্রায়ন স্থাপন করে নেয় । তো দ্বিতীয় বছরের -১২৮৫হিজরীর-কার্যবিবরণী বা রো-দাদে এই প্রসঙ্গে লেখা হয়:

"আমরা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করছি যে, কতিপয় সাহসী উদ্যেগী মহোদয়, 'মাদরাসায়ে আরাবী দেওবন্দের' [দারুল উলূমের পূর্বনাম] সম্প্রসারণের সু-উদ্যোগে, ভিবিন্ন জায়গায়; দিল্লি, মিরাঠ, খোরজা, বুলন্দশহর, সাহারানপুর, ইত্যাদি-স্থানে এই শিক্ষাধারা চালু করেছেন। এছাড়াও আলীগড়সহ আরও কয়েকটি জায়গায় পরিকল্পনা চলছে"

[রো-দাদ,১২৮৫হিজরী;পৃষ্ঠা:৭০]

এর ১২/১২৩বছর পর, ১২৯৭হিজরীর রো-দাদে লেখা হয়:

"আমারা আনন্দভরে (শুভানুধ্যায়ীদের) জানাচ্ছি যে, নেআমত-দাতা সেই মহান সত্বার একান্ত কৃপা ও তার কৃতজ্ঞতা যে, এ বছর মিরাট, গালাওঠি, দানপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি নতুন ইসলামি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এবং সেগুলোর কেন্দ্রায়ন এই মাদরাসা [দারুল উলূম]-এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে"।

[া-দাদ,১২৯৭হিজরি;পৃষ্ঠা:২১]

সেই পথধরে, দেওবন্দের সরে জমিনে উদয় হওয়া এই জ্ঞানরশ্মি আলোকিত করে চলছে পুরো বিশ্বকে। দেড়'শ বছরের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসেও, বর্তমানে কেবল হিন্দ-পাক-বাংলাদেশেই; এই ধারায় লক্ষাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব মাদরাসা থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোটি পেরুবে। যার দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে বিশ্ব ইতিহাসও অপর্যাপ্ত ঠেকবে।

হিন্দ-পাক-বাংলাদেশ ছাড়াও পুবের বার্মায়, উত্তরের নেপালে, পশ্চিমের আফগানিস্থান-ইরানে, দিক্ষিণের শ্রিলংকাতেও একই ধাঁচের হাজারো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রতিবছর সেসব মাদরাসা থেকে হাজার হাজার উলামা তৈরি হয়ে, সমাজে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

[জামে' ওয়া মুখতাসার তারীখ:২৬৫]

আরবে...

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর, ১৫ ই শাবান, ১২৯০ হিজরিতে, মক্কা মুকাররমায় প্রসিদ্ধ আলিমেদ্বীন মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবি রাহ. 'মাদ্রাসায়ে সূলতিয়্যাহ' প্রতিষ্ঠা করেন । দারুল উলূমের 'নকশে কদমে'ই মাদ্রাসাটির ভিত্তি রাখা হয়। মাওলানা ইসহাক আমরাত্সারী রহ.-ও মক্কা মুকররমায়, আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যিনি দারুল উলূমের ফয়েযে ধন্য ছিলেন। একইভাবে মাদিনা মুনাওয়ারায়ও শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রাহ.এর বড়ো ভাই; মাওলানা সাইয়েদ আহমদ ফয়েজাবাদি রহ. ১৩৪০হিজরি-১৯১২ঈসায়িতে 'মাদ্রাসায়ে উলূমে শারইয়্যাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি মাদিনাবাসীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য: মক্কা-মদীনার উভয় মাদ্রাসা উভয় হারামের স্বন্যিকটে ছিল। আজ-কাল 'হারামাইন শরীফাইন' সম্প্রসারণের ফলে তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠাকালীন মুহতামিমগণ:

= ৫. হাজি সাইয়্যেদ ফজলে হক দেওবন্দি রহ.[১৩১৫হি./১৮৯৮ঈ.]

হাজি মুন্সি ফজলে হক বিন সাইফ আলী দেওবন্দি রহ.,'খান্দানে রিজবিয়্যাহর' সরদারদের একজন। দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠায় শুরু থেকেই শামিল ছিলেন। হজরত কাসিম নানোতবি রহ.এর হাতে যে কজনের বাইয়াত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো, তিনিও তাদের একজন। শুরু থেকেই দারুল উলূমের মাজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন।
দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা হলে তাকে দাফতারিক কর্যাদির জিম্মাদারি অর্পণ করা হয়। ১৩১০হিজরি মুতাবেক ১৮৯৩ ঈসায়িতে হাজি আবিদ হুসাইন সাহেব রহ. নিজের অ-স্বাভাবিক ব্যস্ততার কারণে মুহতামিম পদ থেকে ইস্তিফা দিলে তাকে মুহতামিম বানিয়ে দেওয়া হয়। বছর খানেক জিম্মাদারি আদায় করার পর তিনিও ইস্তেফা দিয়ে দেন।
লেখা-লেখির ভালো যোগ্যতার সাথে সাথে পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল। দারুল উলূমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে সাহারনপুরের সরকারি শিক্ষা বিভাগেও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছিলেন।
হাজি ফজলে হক সাহেব রহ.হজরত নানোতবি রহ.এর একটি বিস্তারিত জীবনী লিখেছিলেন। কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। হজরত মানাযির হাসান গিলানি রহ. 'সাওয়ানিহে কাসিমীতে' বিভিন্ন জায়গায় 'মাখতূতাহ' নামে এখান থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছিলেন। 'সাওয়ানিহে কাসিমী' সংকলনকালে এটিকে অনুসন্ধান করা হয়েছিল।তো হাজী সাহেবের কাগজের স্তূপে অবহেলিত পড়ে ছিল। এবং শুরু শেষের কিছু পৃষ্ঠা নেই। [হায়াত অ্যাওর কারনামে:১৩২]
এটি ১৩৮৫হিজরি পর্যন্ত দারুল উলূমের খাজানায়ে সংরক্ষিত ছিল। রাজিস্থান প্রদেশে ১৩১৫ হিজরি মুতাবেক ১৮৯৮ঈসায়িতে ইন্তিকাল করেন।

[কাসিমুল উলূম মাওলানা মুহা.কাসিম নানোতবি রহ.:আহওয়াল ওয়া আছার ,বাকীয়্যাত ওয়া মুতাআল্লিকাত। মাও. নূরুল হাসান রাশেদ কান্দলবি কৃত:৩৩৮]

আফ্রিকায়...

আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে; বিশেষত সাউথ আফ্রিকায়, দারুল উলূমের ধাঁচে ছোটো-বড়ো অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে পুরো আফ্রিকা-ইউরোপ-আমিরিকার শিক্ষার্থীরা এসে শিক্ষার্জন করছে। সাউথ আফ্রিকার মাদরাসাগুলোর মাঝে: 'দারুল উলূম জাকারিয়্যা, লেনেশিয়া-জুহান্সবার্গ'। 'মাদ্রাসা ইন'আমিয়া কিম্প্রডাউন।' 'দারুল উলূম আজাদবেল'। 'দারুল উলূম নিউক্রেস'। 'দারুল উলূম আবুবকর, পোর্ট এলিজাবেথ'। 'দারুল উলূম, ইস্পেংগাবীস'। 'জামিয়া মাহমূদিয়া, ইস্প্রিন্গস'। 'দারুল উলূম কীপটাউন'। 'মাদরাসা জামিউল উলূম, জুহান্সবার্গ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

[জামে' ওয়া মুখতাসার তারীখ: ২৬৫]

ইউরোপে...

ইউরোপ মাহাদেশের ইংল্যান্ডেও কয়েকটি বড়ো বড়ো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেগুলোতে দারুল উলূমের সিলোবাস অনুযায়ী উন্নতমনের শিক্ষা প্রদান করা হয়। সেগুলোর মধ্যে : 'দারুল উলূম বারী'। 'দারুল উলূম, লন্ডন'। দারুল উলূম বার্মিংহাম'। 'দারুল উলূম, লিস্টার'। 'দারুল উলূম বোল্টান' ইত্যাদী উল্লেখযোগ্য।

.[জামে' ওয়া মুখতাসার তারীখ:২৬৫]

আমরিকায়...

আট্লান্টিক সাগর পেরিয়ে,ওপারের দুনিয়া; যুক্তরাষ্ট্র,কানাডা,ওয়েস্ট্যান্ডিজেও, দারুল উলূমের আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে (আমেরিকায়) 'দারুল উলূম, নিউওয়ার্ক'। 'দারুল উলূম আল মানানিয়্যাহ,বফীলো'। 'দারুল উলূম, টোরেন্টু'। 'দারুল উলূম, শিকাগো'। এমনিভাবে কানাডায়; 'দারুল উলূম ওন্টারীভ' ইত্যাদি উল্যেখযোগ্য [জামে' ওয়া মুখতাসার তারীখ:২৬৫]
পূর্বের অস্ট্রলিয়া, ফীজী, নিউজিল্যান্ডেও দারুল উলূমের ধাঁচে অনেকগুলো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এক কথায়...

ইংরেজদের সু-পরিকল্পিত শিক্ষা আগ্রাসনের মোকাবেলায় দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা ছিলো, সময়ের শ্রেষ্ঠ ইসালামি শিক্ষা বিপ্লব। প্রত্যক্ষদর্শী আল্লামা ইকবালের মুখে-ই শুনুন:
"যদি এই মোল্লা-দরবেশরা না থাকে, জানো,তাহলে কী হবে? যা হওয়ার; তা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। যদি হিন্দুস্তানের মুসলমানরা এই মাদরাসাগুলোর ছত্র-ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়। তাহলে তাই ঘটবে; যা স্পেনে আট'শ বছরের মুসলিম শাসনের পরও ঘটেছে। আজ গ্রানাডা আর কোর্ডভায়; মুসলিম সংস্কৃতির খন্ডর আর আল-হামরা প্রাসাধ ছাড়া আর কিছুই খোঁজে পাওয়া যায় না। হিন্দুস্তানেও আগরার 'তাজমহল', আর দিল্লির 'লালকেল্লা' ছাড়া, আটশ বছরের মুসলিম কর্তৃত্বের কোনো নিশান খোঁজে পাওয়া যাবে না।"

সেই পথধরে, দেওবন্দের সরে জমিনে উদয় হওয়া এই জ্ঞানরশ্মি আলোকিত করে চলছে পুরো বিশ্বকে। দেড়'শ বছরের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে, বর্তমানে কেবল হিন্দ-পাক-বাংলাদেশেই; এই ধারার লক্ষাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব মাদরাসা থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোটি পেরুবে। যার দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে বিশ্ব ইতিহাসও অপর্যাপ্ত ঠেকবে।

প্রতিষ্ঠাকালীন মুহতামিমগণ:

= ৬. শাইখ নিহাল আহমদ দেওবন্দি রহ.

হজরত শাইখ নিহাল আহমদ দেওবন্দি রহ. ছিলেন দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাকালীন সহযোগী ও পরামর্শদাতা। হাজি সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন সাহেব রহ. যাদের থেকে সর্বপ্রথম চাঁদা নিয়েছেন, সেখানে তার নামও পাওয়া যায়। দারুল উলূমের উদ্ভোধনের চার দিন পর চাঁদার আবেদন করে প্রথম যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, সেখানে সাতজনের মাঝে তার নামও রয়েছে।
শাইখ নিহাল আহমদ রহ. দেওবন্দের রয়ীস/জমিদার শাইখ কারামত আলী রাহ.-এর সাহেবজাদা। আর কাসিম নানোতবি রহ.শাইখ কারামাত আলী রহ.এর কন্য বিবাহ করেছেন। সেই সুত্রে তিনি কাসিম নানোতবি রহ.এর শ্যালক হবেন।
পড়া-লেখা মাওলানা মাহতাব আলী সাহেবের দরসগায় । যিনি তাদের কাচাঁরিতেই পড়াতেন। এখানে হজরত কাসিম নানোতবি রহ.ও প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন।
তিনি যেমন অনেক বড়ো রয়ীস বা সরদার ছিলেন, তেমনি ছিলেন বড়ো দানশীল ও উদার হৃদয়ের। হজরত কাসিম নানোতবি রহ.এর নামে যখন গ্রেফতারি পওয়ানা জারি হয়, তখন তিনি তাঁকে বাঁচানোর যথেষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।
রেকর্ড মোতাবেক দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা থেকে নিয়ে ১৩০৪ হিজরি মোতাবেক ১৮৯৮ঈসায়ি পর্যন্ত মাজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। হতে পারে ওই বছরেই তার ওফাত হয়।

পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার চারদিনের মাথায় পরিচালনা কমিটির পক্ষে একটি আবেদন পত্র বিলি করা হয়। সেখানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়, সাথে আমজনতা সমীপে চাঁদার আবেদনও করা হয় । শেষে 'নামে মুহতামিমান' শিরোনামে কয়েকজন মনীষীর নাম পেশ করা হয়: হাজী আবিদ হুসাইন, মৌলবি মুহাম্মদ কাসিম নানোতবি, মৌলবি মাহতাব আলী, মৌলবি জুলফিকার আলী, মৌলবি ফজলে হক, শাইখ নিহাল আহমদ। [মাওলানা কাসিম নানুতুবী হালত অ্যাওর কারনামে পৃ:১৩১ ।]

তো এতে বোঝা যাচ্ছে যে, শুরু থেকেই দারুল উলূমমের পরিচালনা 'মাজলিস-শূরার' ভিত্তিতে চলে আসছে, এবং মাজলিসেশূরার দিক-নির্দিশনায় একজনকে হিসেব-নিকেশ ও কর্ম বিন্যাসের জিম্মাদারি প্রধান করা হয়। পরবর্তীতে এই দায়িত্ব-পদটি 'মুহতামিম' নামে পরিচিতি লাভ করে । ইতিহাসবিদরা দারুল উলূমমের বেড়ে ওঠা ও উন্নয়নের ক্রমবিকাশকে সামনে রেখে দেড়শ বছরের পরিচালনা ইতিহাসকে চারটি যুগে বিন্যাস করেছেন:

প্রাথমিক যুগ : ১২৮৩-১৩১৩ হিজরি মুতা. ১৮৬৬-১৮৯৫ ঈসায়ি [৩০বছর]

এই যুগে মোট চারজন মুহতামিম অতিবাহিত হন :

১.হাজি সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন দেওবন্দি রহ. [তিনবারে ১০বছর] ক.১২৮৩-৮৪হি. খ.১২৮৬-৮৮হি. গ.১৩০৬-১০হি.	২.মাওলানা রফী'উদ্দীন দেওবন্দি রহ. [২বারে ৯ বছর] ক.শাবান, ১২৮৪-১২৮৫হি. খ.যুলক'দা, ১২৮৮-১৩০৬হি.
৩. হাজি ফজলে হক দেওবন্দি রহ. [একবছর] শাবান,১৩১০-যুলক'দা, ১৩১১ হিজরি	৪.মাওলানা মুহা.মনির নানোতবি রহ. [দেড় বছর] যুলহজ্জা, ১৩১১-জামাদিউল উলা, ১৩১৩ হিজরি

প্রথম যুগের উন্নয়নধারা

এই ত্রিশবছরে দারুল উলূমের চারজন মুহতামিমের সাথে, তিনজন মনীষী সাদরে মুদাররিসীন [প্রধান শিক্ষক] হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১.হজরত মাওলানা ইয়াকুব নানোতবি রহ.,২.হজরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ দেহলবি,৩.শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ.। এই সময়ে দারুল উলূম- মোট ২৬৬জন ফুজালা (মাওলানা) তৈরি করেছে। যাদেরকে দারুল উলূমের মূল আস্তিন ও মনীষী হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদেরই দ্বীনী প্রচেষ্টা ও সামাজিক উৎকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের সু-ফল হিসেবে দারুল উলূমের আজকের এই প্রসিদ্ধি।

ত্রিশ বছরের মাথায় ছাত্র সংখ্যা গড়ে তিন'শ জনে দাঁড়ায়। উস্তাদদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২/১৩ জনে। বাজেট পরিমাণ ৩৯৩ রুপি থেকে বেড়ে ৬ হাজার রুপি ছাড়িয়ে যায়। এই সময়ে দারুল উলূমের মূল ভবন 'নো-দারা' ও তার আশপাশের কামরাগুলো নির্মাণ করা হয়, এবং দারুল উলূমের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ; দারুল ইফতা চালু করা হয়।

[তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ:১৫৫-২০৩, জামে অ্যাওর মুখতাসার তারীখ:৭১]

দ্বিতীয় যুগ:১৩১৩-১৩৪৮ হিজরি মুতা. ১৮৯৫-১৯৩০ঈসায়ি [৩৬বছর]

এই যুগে দুইজন মুহতামিম অতিবাহিত হন:

১.হজরত মাও.হাফেজ মুহা. আহমদ রহ. [৩৪বছর] জমাদিউস্ সানী,১৩১৩হি.-জমাদিউল উলা,১৩৪৭হি.	২.হজরত মাও.হাবিবুর রহমান উসমানি রহ. [সোয়া বছর] জমাদিউস্ সানী, ১৩৪৭-রজব, ১৩৪৮হিজরি

দ্বিতীয় যুগের উন্নয়নধারা

এই যুগটিকে দারুল উলূমের যৌবনকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। যা হজরত আহমদ সাহেবের পরিচালনায় শুরু হয়েছিল। প্রায় ৩৬ বছরব্যাপী এই যুগে দারুল উলূমের শিক্ষা-ব্যবস্থা, পরিচালনা বিভাগ এবং অর্থনীতিসহ সবদিক থেকে সু-সংহত ছিল।'মাদরাসা আরাবী' বাস্তবিক অর্থে দারুল উলূমে পরিণত হয়। ছাত্রসংখ্যা নয়'শ ছাড়িয়ে যায়। উস্তাদ সংখ্যা ৩০ জন পেরিয়ে যায়। বাজেট পরিমাণ ছয় হাজার রুপি থেকে ৫৫ হাজারে পৌঁছে। এই সময়ে সাদরে মুদাররিসীন বা প্রধান শিক্ষক হিসেবে: ১. হজরত শাইখুল হিন্দ রাহ.এর যুগ শেষ হয়ে ২.হজরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.এর যুগ শুরু হয়। ৩. শেষে হজরত শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.এর সোনালি যুগ শুরু হয়।

এই সময়ে দারুল উলূমে জৌলুসপূর্ণ কয়েকটি ভবন নির্মিত হয়: ছাত্রাবাস ও তার সাথে কয়েকটি আলিশান গেইট, মেহমান খানা ইত্যাদি ছাড়াও 'দারুল হাদীস' নামের মহিমান্বিত ভবনটিও এই সময়ে নির্মিত হয়। দারুল উলূমের মসজিদ (মাসজিদে কাদীম), স্টেশন মসজিদ, কুতুবখানা, দারেজদীদ, এমনিভাবে মাতবাখ(ম্যাচ), দাওয়াত ও তাবলীগ বিভাগ, মাসিক আল-কাসিম, মাসিক আর-রশীদ ইত্যাদি এই যুগেরই আবদান। [তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ: ২০৩-২৭৮, জামে অ্যাওর মুখতাসার তারীখ:৮২]

তৃতীয় যুগ:
১৩৪৮-১৪০১হিজরি মুতা.১৯৩০-১৯৮১ঈসায়ি [৫২বছর]

এই যুগে একজন সফল মুহতামিম অতিবাহিত হয়েছেন:

১.হাকীমুল ইসলাম হজরত মাওলানা কারী তায়্যেব সাহেব রাহ. [৫২বছর] ১৩৪৮-১৪০১হিজরি/১৯৩০-১৯৮১ঈসায়ি

তৃতীয় যুগের উন্নয়নধারা

এই যুগটিতে দারুল উলূম সর্বাধিক উন্নতি সাধন করেছে। বাস্তবিক অর্থে এটি একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শাইখুল ইসলাম সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.এর সাদরে মুদাররিসীন ও শাইখুল হাদীসের দীর্ঘ-যুগটিও এই সময়ে অতিবাহিত হয়। কেবল তাঁর যুগের ফারেগীনদের [শিক্ষা সমাপনকারীদের] সংখ্যাই হল: ৪৪৮৩জন। এছাড়াও এই যুগে আরও যারা সাদরে মুদাররিসীন [প্রধান শিক্ষক] হয়েছেন: ২.হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম বালয়াবি রহ., ৩.হজরত মাওলানা সাইয়্যেদ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদি রহ.৪.হজরত মাওলানা সাইয়্যেদ ফখরুল হাসান মুরাদাবদি রহ.। ১৩৪৮হিজরিতে যখন হজরত কারী সাহেব রহ. মাদরাসার বাগডোর হাতে নেন। তখন মাদ্রাসার পরিচালনা বিভগ ৮টি ছিল। ১৪০০হিজরি [হজরত কারী সাহেবের 'ইহতিমাম' [প্রিন্সিপালি] শেষ হতে হতে] এর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩টিতে। দারুল উলূমের বাজেট পরিমাণও পঞ্চাশ হাজার

দারুল উলূমে কর্মচারী সংখ্যা ৪৫জন থেকে বেড়ে ২০০জন ছাড়িয়ে যায়। উস্তাদ সংখ্যা ১৮জন থেকে ৬০জন পেরোয়। ছাত্র সংখ্যা ৮৪০জন থেকে ২০০০ (দু-হাজারে) পৌঁছে।

বাহ্যিক উন্নতিও চোখে পড়ার মতো। যথেষ্ঠ পরিমাণ ভবন নির্মিত হয়। দারে জাদীদ, দারুত্তাফসীর, দারুল ইফতা, দারুল কুরআন [কাদীম], দাওরায়ে হাদীস ফাওকানী, বাবুয যাহির, জামিয়া তিব্বীয়া, মেহমান খানা, কুতুবখানা, দারুল ইকামাহ-আফ্রিকি মাঞ্জিল ইত্যাদি ভবনগুলোও এই যুগের আবদান।

অন্যদিকে কারী তায়্যিব সাহেব রাহ.-উপমহাদেশ, এশিয়া, আমিরিকা, ইউরোপ এবং আফ্রিকার কোণে-কোণে, গ্রাম-গঞ্জ-শহর পেরিয়ে -বাজার হাট পর্যন্ত এত সফর করেছেন, হিন্দুস্তানের অল্প ক'জন আলেমের ভাগ্যেই এই পরিমাণ সফরের সুযোগ মিলে থাকবে। তাঁর এই ভ্রমণ, সভা-সমাবেশ, এবং আম-খাছ সাক্ষাতে দারুল উলূমকে দুনিয়ার কাছে পরিচয় করিয়েছেন।
[তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ:-২৭৮-৪২৩, জামে অ্যাওর মুখতাসার তারীখ: ৯৭]

চলমান যুগ:

১৪০১-১৪৪১হিজরি মুতা. ১৯৮১-২০২০ঈসায়ি [৪১বছর]

এই যুগের চারজন মুহতামিম :

১.হজরত মাও.মারগূবুর রহমান রহ.[ত্রিশ বছর] ১৪০২-১৪৩২হিজরি, ১৯৮২-২০১০ঈসায়ি	২.হজরত মাও. গোলাম রসূল খামুশ [৭বছর, ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম] ১৪২৪-১৪৩১হিজরি, ২০০৪-২০০৯ঈসায়ি
৩.হজরত মাও. গোলাম বুস্তানবি দা.বা.[সাত মাস] সফর, ১৪৩২-শা'বান, ১৪৩২হিজরি	৪.হজরত মাও.মুফতী আবুল কাসিম নু'মানি [চলমান] শাবান ১৪৩২------হিজরি /...২০১১------------ঈসায়ী

চলমান যুগের উন্নয়নধারা

এই যুগটি 'ইজলাসে সদ-সালা'র [শতবর্ষ সম্মেলনের] পর থেকে শুরু হয়। সদ-সালার পর পরই দারুল উলূম হঠাৎ এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আখের আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ কৃপায় পূর্বের সোনালি যুগ ফিরে আসে। এই যুগের উন্নয়ন পরিক্রমা পেছনের শত বছরের দ্বি-গুণ থেকেও অধিক। এই সময়ে বিশ্ব মেডিয়ায় দারুল উলূমের প্রসিদ্ধি পৃথিবীকে তাক লাগিয়েছে।

এই যুগের তিনজন সাদরে মুদাররিসীনের মাধ্যে ছিলেন; ১.হজরত মাওলানা মি'রাজুল হক দেওবন্দি রহ.২.মাওলানা নাসীর আহমাদ খান বুলন্দশহরি রহ.৩.বর্তমানে- উস্তাদে মুহতারাম- হজরত মাও. মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরি দা. বা. এর মতো ব্যক্তিরা। সাদরে মুফতীদের মাধ্যে ছিলেন ফকীহুল উম্মত মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহি রহ.ও হজরত মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দীন আ'জমি রহ.এর মতো ব্যক্তিরা। হাদীস বিশারদ ও সর্বশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে আল্লামা নেআমতুল্লাহ আ'জমি এই যুগেরই। রুকনে শুরায় ছিলেন; হজরত মাও.মানযুর নো'মানি রহ.,মুফাক্কেরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবি রহ., হজরত মাওলানা আব্দুর হালীম জৌনপুরি রহ., ফিদায়ে মিল্লাত সাইয়্যেদ আস'আদ মাদানি রহ.এর মতো জাতীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা।এই সুনালি যুগটিতে প্রায় বিশ সহস্রাধিক ফুজালা তৈরি হয়। ছাত্র সংখ্যা দুহাজার থেকে বেড়ে পাঁচ হাজারে পৌঁছে। বাজেট পরিমাণ ২৬লাখ থেকে ৩৫ ত্রিশকোটি পেরোয়। প্রটিতি বিভাগে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়। পূর্ণাঙ্গ সিলিবাস ছাড়াও স্নাতকোত্তর বিভাগ হিসেবে আগে 'তাকমীলে ইফতা','তাকমীলে আদব','তাকমীলে তাফসীর' ও 'তাকমীলে দ্বীনিয়্যাত' নামে চারটি বিভগ ছিলো। এই যুগে 'তাকমীলে 'উলূম' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ সংযোজন

করা হয়। এ ছাড়াও' তাখাসসুল ফিল হাদীস' [উচ্চতর হাদীস গবেষনা বিভগ] নামে একটি মহিমান্বিত বিভাগ সংযোজন এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট।

এছাড়াও সম-সাময়িক ফেতনাগুলোর মোকাবেলায় ১.'কুল-হিন্দ মাজলিসে খাতমে নবুয়্যাত'। ২. মোহাজারাতে 'ইলমিয়্যাহ' ৩.'শু'বায়ে রাদ্দে ঈসাইয়্যাত'। ৪.গাইরে মুকাল্লিদদের জবাবে'তাহাফফুজে সুন্নাত'-সহ বিবিদ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ চালু করা হয়।

এমনিভাবে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে,নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'শাইখুল হিন্দ একাডেমি' নামে সাংবাদিকতা বিভগ, কম্পিউটার বিভাগ, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইন্টারনেট বিভাগ-সহ আধুনিক বিভাগগুলো সংযোজন করা হয়।

হিন্দুস্থানের দ্বীনী মাদরাসাগুলোকে এক প্লটফার্মে এনে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করার লক্ষে 'কুলহিন্দ রাবেতায়ে মাদারেসে আরাবীয়া ইসলামিয়া' নামে ঐতিহাকি একটি সংস্থা গঠন করা হয়। যা মাদ্রাসাগুলোর বিশেষ বিপর্যয়ে পাশে দাঁড়াবে। এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে সু-সংহত করবে।

এছাড়াও এই যুগে দারুল উলূমের কয়েকটি জৌলুসপূর্ণ ভবন নির্মিত হয়। এর মাঝে মাদরাসায়ে সানাবিয়্যা [মাধ্যমিক শ্রেণিকক্ষ],দারুল মুদাররিসীন [শিক্ষক কোয়ার্টার], আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে 'রাওয়াকে খালিদ','শাইখুল হিন্দ মাঞ্জিল','শাইখুল ইসলাম মাঞ্জিল','হাকীমুল উম্মত মাঞ্জিল' (তাহফীজুল কুরআন মাঞ্জিল) ইত্যাদি..এবং মরমর পাথরে তৈরি জৌলুসপূর্ণ 'মাসজিদে রশীদ'-এর নির্মাণ এই যুগের ঐতিহাসিক দাস্তান। বর্তমানে দারে জাদীদের পূণ:নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মোটকথা এই যুগটি দারুল উলূমের শিক্ষা-সংস্কৃতি আর আয়-উন্নতিতে বিশ্বায়নের যুগ। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম উম্মার আমানত হিসেবে এই ইলমের নিরঝনিকে কেয়ামত পর্যন্ত সজিব ও সিক্ত রাখুন। [জামে অ্যাওর মুখতাসার তারীখ:১১৮]

পাঠশালা মনীষী জীবন চরিত

দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠরত বাংলা তিন রাজ্য; পশ্চিমবঙ্গ, আসমা ও ত্রিপুরার শিক্ষার্থীদের সমন্বিত সাহিত্য সংসদ "উলফত সাহিত্যাসর"- এর প্রতি শুক্রবার আয়োজিত 'সাপ্তাহিক সাহিত্যাসর'-এর সদস্য সংখ্যা আধিক্য বিবেচনায় আসরটি আটটি পাঠশালায় বিন্যস্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আটটি পাঠশালাকে বাংলার আটজন মুসলিম মনীষীর নামে উৎসর্গ করা হয়; যারা বাংলাভাষা বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁরা হলেন, ভাষা সৈনিক শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল জলীল চৌধুরি রহ. আসাম। তাঁর নামে "জলীল পাঠশালা।" মাওলানা তাহির সাহেব রহ., কলকাতা। তাঁর নামে "তাহির পাঠশালা।" আমীরে শরিআত মাওলানা তৈয়ীবুর রহমান বড়ভুইয়াঁ রহ., আসাম। তাঁর নামে" তৈয়ব পাঠশালা।" মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা.বা., ঢাকা। তাঁর নামে "আল মিছবাহ পাঠশালা।" বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে "নজরুল পাঠশালা।" ভাষাবিদ ড. শহীদুল্লাহ রহ. এর নামে "শহীদুল্লাহ পাঠশালা।" প্রয়াত কবি আল মাহমুদের নামে "আল মহমুদ পাঠশালা।" জাগ্রত কবি মুহিব খানের নামে "মুহিব পাঠশালা।" ইতিপূর্বে 'পাক্ষিক উলফতে' পাঠশলা মনীষীদের পরিচিতিমূলক 'বরেণ্য-জীবন' পাতায় ভাষা সৈনিক আব্দুল জলীল সাহেব রহ. ও আমীরে শরিআত আল্লামা তৈয়ীবুর রহমান রহ.এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপানো হয়েছে, সেই ধারাবাহিকতায় ভাষা সংখ্যায় থাকছে আরও তিনজনের পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী : ড. শহীদুল্লাহ, আল মাহমুদ ও মহিব খান। আগামী সংখ্যায় থাকবে আল্লামা তাহির সাহেব রহ. মাওলানা আবু তাহির মিছবাহ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী।

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রজীবনে শহীদুল্লাহ সব সময়েই সাহিত্যচর্চা করতেন। কলেজে পড়ার সময় "ভারতী" পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পাতায় প্রথম প্রকাশিত শহীদুল্লাহর এই রচনাটির নাম ছিল "মদন ভস্ম"। তখন "ভারতীর" সম্পাদক তখন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য সম্পর্কে একজন মুসলমান লেখকের আগ্রহ দেখে স্বর্ণকুমারী দেবী যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ও লেখালেখি অব্যাহত রাখেন শহীদুল্লাহ। বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "বাঙ্গালা ভাষা তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ" কোহিনূর পত্রিকায় "বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ", প্রতিভা পত্রিকায় ফারসি ও আরবি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষারন্তরীকরণ প্রবন্ধ। প্রভাতী পত্রিকাতে তাঁর আরও কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ সময় কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে মিলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"। শহীদুল্লাহ ছিলেন এই সমিতির সম্পাদক।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে সক্রিয় থেকে যিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে, চেতনায় ও বাকভঙ্গিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন; তিনি কবি আল মাহমুদ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবিও তিনি। তাঁর প্রকৃত নাম মীর আবদুশ শুকুর আল মাহমুদ। একাধারে একজন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছোটোগল্প লেখক, শিশু-সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক তিনি। কাব্যে যেমন মৃত্যু কামনা করেছিলেন, তেমনই ঘটল:

কোনো এক ভোর বেলা, রাত্রি শেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাকিদ;
অপ্রস্তত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ আমার ঈদ
- আল মাহমুদ

মুহিব খান

দেশে ও দেশের বাইরে তিনি "জাগ্রত কবি" উপাধিতে সমাদৃত। পূর্ব লন্ডনে আয়োজিত এক গণসংর্বধনায় তাকে "মুসলিম উম্মাহর জাতীয় কবি" উপাধিতেও ভূষিত করা হয়। তার ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা তাকে একজন আধুনিক আলেম, দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকেন। এছাড়াও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে অনেক প্রবন্ধ ও কলাম। তার রচিত ঐতিহাসিক অনুবাদ সাহিত্য "আল-কোরআনের কাব্যানুবাদ" এবং বিস্ময়কর সিরাত অ্যালবাম "দাস্তান-ই-মুহাম্মাদ" বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম সৃষ্টি। এ যাবত বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে।

বরেণ্য

ভাষাপণ্ডিত ড. শহীদুল্লাহ রহ.

(সংগৃহিত, বিন্যাস ও শিরোনাম উলফতের)

শুভজন্ম

ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা ছোট্ট একটি গ্রাম। কলকাতা শহর থেকে খুব দূরে নয়। সন্ধ্যে হলে গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে প্রদীপের আলো। ভোরবেলা শোনা যায় আজানের ধ্বনি। এই গ্রামের নাম পেয়ারা। চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম পেয়ারা। এই গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ মুন্সী মফিজুদ্দিন। বেশ শিক্ষিত লোক তিনি। কলকাতায় কোর্টে চাকরি করতেন। ইংরেজি তো বটেই, আরও চার পাঁচটা ভাষা জানতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হুরুন্নেসা। তিনিও লেখাপড়া জানতেন। ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই। দিনটি ছিল শুক্রবার। তখন ঘোর বর্ষা। মুন্সী মফিজুদ্দিনের বাড়িতে শোনা গেল শিশুর কান্নার আওয়াজ। ছোট্ট একটি শিশু জন্ম নিয়েছে হুরুন্নেসার কোলে। ছেলেটির নাম রাখা হলো মুহম্মদ ইবরাহীম। আকিকাও হলো এই নামেই। কিন্তু নামটি পছন্দ হলো না মা হুরুন্নেসার। তিনি ছেলের নাম রাখলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

সোনালি শৈশব

মুন্সী মফিজুদ্দিনের আরও ছেলেমেয়ে ছিল। তাঁর ছিল তিন মেয়ে চার ছেলে। ভাইবোন সবার সঙ্গে মিলেমিশে বড়ো হতে লাগল শহীদুল্লাহ। খুব হাসিখুশি শিশু। গান গায়, গানের তালে নাচে। ছেলেটিকে তাই অনেকে ডাকে সদানন্দ বলে। গ্রামের সবুজ প্রকৃতি খুব ভালো লাগে সদানন্দের। ভালো লাগে রাখালের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে রাখালিয়া বাঁশির সুর শুনতে। একদিন তো পুকুর ঘাটে গেল আর ফিরে আসার নাম নেই। বাড়ির লোকজন চিন্তায় অস্থির। সন্ধ্যের সময় চুপিচুপি বাড়ি ফেরে সদানন্দ। রাখালের সঙ্গে সারাটা দিন ঘুরেছে মাঠে মাঠে, শুনেছে বাঁশির মিঠে সুর।

পাঠশালায়

কিন্তু এভাবে ঘুরে বেড়ালে তো চলবে না। শহীদুল্লাহকে ভর্তি করে দেওয়া হলো গ্রামের পাঠশালায়। এই পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা আর বোধোদয় পড়তেন শহীদুল্লাহ। সেই সঙ্গে কুরআন শরীফ পড়তে শিখলেন তিনি। বাড়িতে শিখলেন নামাজ পড়তে। দশ বছর বয়সে বাবার কর্মস্থল কলকাতার হাওড়ায় চলে এলেন তিনি। ভর্তি হলেন একটা মাইনর স্কুলে। এই স্কুল থেকে ১৮৮৯ সালে মিডল ইংলিশ পাস করলেন। তারপর ১৯০০ সালের জানুয়ারিতে ভর্তি হলেন হাওড়া জেলা স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে (বর্তমানের ৭ম শ্রেণী)। স্কুলে তখন ইংরেজি, বাংলা ছাড়াও আরেকটি ভাষা পড়তে হতো। হিন্দু ছেলেরা পড়ত সংস্কৃত, মুসলমান ছেলেরা পড়ত ফারসি। শহীদুল্লাহ কিন্তু ফারসি না নিয়ে, পড়লেন সংস্কৃত।

ভাষাপ্রেমী ও বইপোকা শহীদুল্লাহ

শহীদুল্লাহর স্মৃতিশক্তি ছিল খুব প্রখর। যা পড়তেন তাই মনে রাখতে পারতেন। শুধু স্কুলের পাঠ্য বই নয়, বাইরের নানা রকম বইও পড়তেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের লেখা মুহাম্মদ চরিত, ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ আর তাপসমালা পড়তে খুব ভালো লাগে তাঁর। অন্য ছেলেরা যখন ঘুড়ি উড়ায়, লাটিম কিংবা মার্বেল দিয়ে খেলে, মাঠে ফুটবল খেলে; শহীদুল্লাহ তখন ঘরে বসে বইয়ের পাতায় চোখ রাখতেন। স্কুল জীবনেই ভাষা শেখার নেশা পেয়ে বসে শহীদুল্লাহকে। স্কুলে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত তো পড়তে হতোই-এছাড়া ঘরে বসে তিনি শিখলেন ফারসি, হিন্দি, উর্দু আর উড়িয়া ভাষা। সেই সঙ্গে গ্রীক আর তামিল অক্ষরও লিখতে পড়তে শিখলেন। শুধু ভাষা শেখাই নয়, ভাষাগুলোর তুলনা করতেও ভালো লাগত তাঁর। সংস্কৃত ভাষার একটি শব্দ বা ধাতুরূপ কেমন করে বদলে যায় তামিল, ল্যাটিন কিংবা বাংলা ভাষায় সেগুলো লিখে দেখতেন। স্কুলে পড়ার সময় হাফিজ ছিলেন শহীদুল্লাহর প্রিয় কবি। অবশ্য মূল ফারসিতে হাফিজের কবিতা তখনও পড়েননি তিনি। ভাই গিরিশচন্দ্রের গদ্যানুবাদ পড়েছিলেন। সেখান থেকে একটা গজলের কাব্যানুবাদ করলেন। রামায়ণ থেকেও কিছু অংশ পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন তিনি।

ধর্মানুরাগ

বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী ছিলেন। আর নিজের ধর্মে তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। অবশ্য ধর্মানুরাগের বিষয়টি ছিল বংশগত। শহীদুল্লাহর পরিবার চতুর্দশ শতক থেকে বংশানুক্রমিকভাবে ২৪ পরগণার বিখ্যাত পীর সৈয়দ আব্বাসের (পীর গোরাচাঁদ) খাদেম ছিলেন। পীর গোরাচাঁদের মাজার ছিল পেয়ারার পাশে হাড়োয়া গ্রামে। পীর গোরাচাঁদের মাজারের প্রথম খাদেম ছিলেন শহীদুল্লাহর চৌদ্দতম পূর্ব পুরুষ শেখ দারা মালিক।

মেধার বাহার

স্কুলজীবনে ইংরেজি আর বাংলায় শহীদুল্লাহ ছিলেন খুবই ভালো। ৮ম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর শিক্ষক নারিকেল গাছ নিয়ে একটি ইংরেজি রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। শহীদুল্লাহর লেখা পড়ে শিক্ষক বিশ্বাসই করতে চাননি যে সেটা শহীদুল্লাহর নিজের লেখা। ক্লাসে বরাবরই তিনি ছিলেন ভালো ছাত্র। ৭ম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় রুপার মেডেল পেয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে ভালো ছিলেন সংস্কৃতে।

অন্য ছেলেরা যখন ঘুড়ি উড়ায়, লাটিম কিংবা মার্বেল দিয়ে খেলে, মাঠে ফুটবল খেলে; শহীদুল্লাহ তখন ঘরে বসে বইয়ের পাতায় চোখ রাখতেন।

সংস্কৃতে সবসময়ই ফার্স্ট হতেন তিনি। একবার শহীদুল্লাহর হিন্দু বন্ধুরা কৌতুক করে পণ্ডিত মশাইকে বলেছিল "স্যার, আমরা বামুন কায়েতের ছেলে থাকতে, আপনি ঐ মুসলমান ছেলেটাকে সবসময় ফার্স্ট করে দেন, এতো ভারি অন্যায়।" উত্তরে পণ্ডিত মশাই বলেন, "আমি কী করব, সিরাজুদ্দৌলা লেখে ভালো। তোরা তো ওর মতো লিখতে পারিস না।" পণ্ডিত মশাই শহীদুল্লাহর নাম কিছুতেই মনে রাখতে পারতেন না, বলতেন সিরাজুদ্দৌলা।

উচ্চশিক্ষা

১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করলেন শহীদুল্লাহ। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের এফ. এ (ফার্স্ট আর্টস) এর প্রথম বর্ষে। প্রেসিডেন্সী কলেজে শহীদুল্লাহর সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ। ঐ সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলার সেরা সব ব্যক্তি। কেমিস্ট্রি পড়াতেন স্যার পিসি (প্রফুল্ল চন্দ্র) রায়, ফিজিক্স পড়াতেন স্যার জি. সি. বসু, গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ড. শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। রায় বাহাদুর খগেন্দ্র মিত্র এবং ড. আদিত্য কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন লজিকের অধ্যাপক। দু বছর পর এফ. এ পাস করে হুগলি কলেজে ভর্তি হলেন শহীদুল্লাহ। বি. এ.- তে তাঁর অনার্সের বিষয় ছিল সংস্কৃত। অসুস্থতার কারণে বিএ পরীক্ষা দেয়া হলো না তাঁর। এ বছরটা নষ্ট হবে এই ভেবে যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি শুরু করলেন। এক বছর পর কলকাতায় ফিরে এসে আবার ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। ১৯১০ সালে সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বিএ পাস করলেন।

বিয়ের পিঁড়িতে

এ বছরই চব্বিশ পরগনণা জেলার ভাসলিয়া গ্রামের মুহাম্মদ মুস্তাকীমের মেয়ে মরগুবা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। মরগুবা খাতুন দেখতে যেমন ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, তেমনি গুণী মহিলা ছিলেন। আজীবন তিনি স্বামীকে বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন।

পণ্ডিতদের ধর্মবৈষম্য

১৯১১ সালে শহীদুল্লাহ সংস্কৃতে এম.এ পড়ার জন্য ভর্তি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু শহীদুল্লাহর সংস্কৃতে এম. এ পড়া নিয়ে দেখা দিল তুমুল বিপত্তি। এম.এ ক্লাসে সংস্কৃতের পাঠ্যসূচিতে বেদ পড়তে হত । হিন্দু সনাতন ধর্মের গ্রন্থ হলো বেদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ক্লাসে বেদ পড়াতেন একজন গোঁড়া পণ্ডিত অধ্যাপক। তিনি বললেন, শুধু ব্রাহ্মণরাই বেদ পড়তে পারে। শহীদুল্লাহর মতো একজন মুসলমানকে তিনি কিছুতেই বেদ পড়াবেন না। এই পণ্ডিত অধ্যাপকের নাম ছিল সত্যব্রত সামশ্রমী। শহীদুল্লাহর এই সংস্কৃত পড়ার ঘটনা নিয়ে সে সময় কলকাতা শহরে সব কাগজে অনেক লেখালেখি হলো। তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। দি বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে বলা হতো বাংলার মুকুটহীন রাজা। তিনি শহীদুল্লাহর পক্ষ অবলম্বন করলেন। তাঁর কাগজে তিনি কড়া ভাষায় সম্পাদকীয় লিখলেন এ নিয়ে। সে সময় ভারতের আরেকজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ মওলানা মোহাম্মদ আলীও বিশেষভাবে লিখলেন যেন শহীদুল্লাহকে সংস্কৃত পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে বলা হতো বাংলার বাঘ। তিনিও পণ্ডিতমশায়কে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হলো না। গোঁড়া অধ্যাপক কারও কথাই শুনলেন না। শহীদুল্লাহর কলেজ জীবনের শিক্ষক সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বললেন প্রাইভেটে এম.এ পরীক্ষা দিতে। আবার আরেকজন শিক্ষক বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে বললেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য বিষয় নিয়ে পড়তে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও বললেন অন্য বিষয়ে এম.এ পড়তে। ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করা সত্ত্বেও সংস্কৃত পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দেখে শহীদুল্লাহ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। মামলাটি দিল্লী হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, শহীদুল্লাহকে সংস্কৃতি পড়তে দেওয়া হোক, অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জন্য একটি সাবজেক্ট চালু করে তাকে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আদালতের দ্বিতীয় নির্দেশ অনুযায়ী "তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ" নামে নতুন একটি ফ্যাকাল্টি চালু করেন। এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন অধ্যাপক রবিদত্ত। শহীদুল্লাহ এই বিভাগের প্রথম ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন। এবং এই বিভাগ থেকে প্রথম এম. এ ডিগ্রী লাভের গৌরব অর্জন করলেন। এইভাবে সংস্কৃতে এম.এ ডিগ্রী না পেলেও তুলনামূলক ভাষাতত্ব পড়ার সময়ই তিনি সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের সুযোগ পেলেন। বস্তুত, সংস্কৃত ছিল শহীদুল্লাহর অন্যতম প্রিয় ভাষা। সারাজীবনই তিনি এ ভাষার নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন। ১৯১২ সালে এম. এ পাস করার পর তিনি বৃত্তি পেলেন জার্মানিতে গিয়ে সংস্কৃত পড়ার জন্য। বিদেশে যেতে হলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়। শহীদুল্লাহর স্বাস্থ্য তেমন ভালো ছিল না। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফল তাঁর অনুকূলে গেল না। ফলে সরকারি বৃত্তি পেয়েও জার্মানিতে তখন যাওয়া হলো না তাঁর। শহীদুল্লাহ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে লাগলেন।

সাহিত্যচর্চা

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রজীবনে শহীদুল্লাহ সব সময়ে সাহিত্যচর্চা করতেন। কলেজে পড়ার সময় "ভারতী" পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পাতায় প্রথম প্রকাশিত শহীদুল্লাহর এই রচনাটির নাম ছিল "মদন ভস্ম"। তখন "ভারতীর" সম্পাদক তখন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে একজন মুসলমান লেখকের আগ্রহ দেখে স্বর্ণকুমারী দেবী যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ও লেখালেখি অব্যাহত রাখেন শহীদুল্লাহ। বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "বাঙ্গালা ভাষা তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ" কোহিনূর পত্রিকায় "বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ", প্রতিভা পত্রিকায় ফারসি ও আরবি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষারন্তরীকরণ প্রবন্ধ। প্রভাতী পত্রিকাতে তাঁর আরও কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ সময় কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে মিলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"। শহীদুল্লাহ ছিলেন এই সমিতির সম্পাদক। এছাড়াও ১৯১৮ সালে তিনি "বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকা"র যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯১৯ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সরকারী পদে যোগ দেন। ১৯২০ সালে তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য "আঙুর" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে হলে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের একমাত্র শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর একটানা ২৩ বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সেখানে তিনি দু'বছর আইনের অধ্যাপনাও করেছেন। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটির অবসরে শহীদুল্লাহ ভারতের 'মালাকান' রাজপুতদের মাঝে ইসলাম প্রচারের জন্য যান।

"আপনার মতো এত বড়ো পণ্ডিত, যাহার বিদ্যার পরিধি আয়ত্ত করিবার সাধ্য আমাদের নাই, যিনি বেদ-বেদান্তের অধ্যাপক, ফার্সি ও আরবি যার নখদর্পণে, যিনি জার্মান ব্যাকরণের জটিল ব্যূহ ভেদ করিয়ে অবসর রঞ্জন করে-তিনি একটি 'আঙুর' হাতে নিয়া উপস্থিত!"

ড. শহীদুল্লাহকে লোকসাহিত্যিক ড. দীনেশ চন্দ্র সেন

ওই বছরের শেষে তিনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন "আঞ্জুমানে ইশায়াত-ই-ইসলাম" নামে একটি ইসলাম প্রচার সমিতি। উল্লেখ্য, ঢাকার সর্বপ্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ 'শেখ বোরহানুদ্দীন পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ' প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিলো অবিস্মরণীয়।

১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি প্যারিসে যান। ফরাসি ভাষার মাধ্যমে বাংলাভাষার সবচেয়ে পুরনো কাব্যগ্রন্থ 'চর্যাগীতি' সম্পর্কে দু'বছর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৮ সালে দেশে ফিরে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি পত্র-পত্রিকার বাংলা ও ইংরেজিতে উঁচু মানের প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তার প্রথম প্রবন্ধের বই 'ভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। এরপর তিনি একের পর এক বই লিখতে থাকেন। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা একশ'র কাছাকাছি আর দেশি-বিদেশি ভাষায় লেখা তার প্রবন্ধের সংখ্যা কয়েকশ'।

এক কথায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, লেখক, গবেষক,সমাজ সংস্কারক, সূফি ও ধর্মপ্রচারক । পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গবেষণা আজও অতুলনীয়। তিনি ২৪টি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, এগুলোর মধ্যে ১৮টি ভাষার ওপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃতের ওপর তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় ইরানের বিশিষ্ট কবি হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের বই অনুবাদ করেন। অনুবাদ করেন ইকবালের কবিতা। এছাড়া তাঁর রচিত "ইসলাম প্রসংগ" ও নবীজীবনী "নবী করীম হযরত মুহম্মদ (দ:)" উল্লেখযোগ্য। জ্ঞান-সাধনার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলেই শিক্ষিত সমাজে তাঁকে "চলমান বিশ্বকোষ" হিসেবে সম্মান করা হত।

আধ্যাত্ম ও ধার্মিকতা

ফুরফুরা শরিফের মুজ্জাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিক (রহ.) ছিলেন তাঁর পীর বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক। পরবর্তীতে তিনি তাঁর পীর মুর্শিদের খিলাফাতও প্রাপ্ত হোন। পীরভাই হিসেবে পেয়েছিলেন হযরত নেসারুদ্দীন আহমাদ (রহ.),রুহুল আমিন বর্ধমানী (রহ.), সদরুদ্দীন আহমাদ শহীদ (রহ.) ও পীর প্রফেসর আব্দুল খালেক (রহ.) এর মতো প্রমূখ প্রাজ্ঞজনকে।

একনিষ্ঠ ধার্মিক হিসেবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কুরআন হাদিসের অনুবাদ যেমন করেছিলেন, তেমনি ধর্মপ্রচারেও সক্রিয় ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে দ্বীন প্রচারের জন্য তিনি ও তাঁর পীরভাই পীর প্রফেসর আব্দুল খালেক (রহ.) স্বীয় পীর মুর্শিদ কর্তৃক তায়াজ্জুহ ও ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন।

মৃত্যু

১৩ জুলাই ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রহ. এর মৃত্যুবার্ষিকী বা ইন্তেকাল দিবস। ১৯৬৯ সালের এই দিনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মনীষীদের মূল্যায়ন:

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন বাংলা ভাষার প্রথম সহজবোধ্য 'বাংলা ব্যাকরণ' লিখলেন তখন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুশী হয়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখেন। ওই চিঠিতে তিনি বলেন, "আপনার বাংলা ব্যাকরণখানি পড়ে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। ব্যাকরণখানি সকল দিকেই সম্পূর্ণ হয়েছে। এতে ছাত্রদের উপকার হবে। বইখানি আমার শান্তি নিকেতনের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের দেব। তাঁরা তা শ্রদ্ধাপূর্বক ব্যবহার করবেন।"

লোকসাহিত্যিক ড. দীনেশ চন্দ্র সেন

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শিশু-কিশোরদের জন্য 'আঙুর' পত্রিকা বের করার পর একে স্বাগত জানিয়ে পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত লোকসাহিত্যিক ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, "আপনার মতো এত বড়ো পণ্ডিত, যাহার বিদ্যার পরিধি আয়ত্ত্ব করিবার সাধ্য আমাদের নাই, যিনি বেদ-বেদান্তের অধ্যাপক, ফার্সি ও আরবি যার নখদর্পণে, যিনি জার্মান ব্যাকরণের জটিল ব্যূহ ভেদ করিয়ে অবসর রঞ্জন করে-তিনি একটি 'আঙুর' হাতে নিয়া উপস্থিত!"

প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ

বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ বলেন, " ড. শহীদুল্লাহর মন ছিল চির সবুজ,চির নমনীয়। সনাতন আচার তার মনে কখনো বন্ধন হয়ে দাঁড়ায় নাই। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিজয় অভিযানে তিনি নির্ভীক পতাকাবাহী সৈনিকরূপে অনাগত ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবেন।"

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

অন্যদিকে বিশিষ্ট কবি, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, " ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানত বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে, এই উপমহাদেশে এমন এক অনন্য প্রতিভা, যাঁর পরিচয় শুধু প্রশংসার শব্দ উচ্চারণ করে দেয়া চলে না। তিনি জ্ঞানকে শুধু গ্রহণই করেননি, সর্বত্র সেই জ্ঞানের তাপকে ছড়িয়েছিলেন। ভাষা সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর কৌতূহল এবং অন্বেষণের কৃতিত্ব অসাধারণ। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের অধিকারী হয়েছিলেন।" ▪

কবি আল মাহমুদ

বরেণ্য

বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তিতুল্য কবি আল মাহমুদ ধুলোমাটির এই পৃথিবীর সমস্ত মায়া ছিন্ন করে বিদায় নিয়েছেন। লম্বা সময় ধরে অসুস্থ এই কবিকে নিয়ে সাহিত্যপ্রেমীদের সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটেছে ফাল্গুনের তৃতীয় রাতে। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে হারিয়ে গেছেন এই মহান কবি চিরতরে। আল্লাহ্‌ কবির সুপ্ত ইচ্ছে পূরণ করেছেন; শুক্রবার রাত ১১টা ৫ মিনিটে বিদায় নিয়েছেন কবি আল মাহমুদ। ইচ্ছে পূরণ হলো হয়তো! এটা কি তবে সৌভাগ্যের মৃত্যু? কে জানে!

-সংগৃহিত, বিন্যাস ও শিরোনাম উলফতের

জন্ম ও শৈশব

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে সক্রিয় থেকে যিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে, চেতনায় ও বাকভঙ্গিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন; তিনি কবি আল মাহমুদ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবিও তিনি। তাঁর প্রকৃত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। একাধারে একজন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছোটোগল্প লেখক, শিশু-সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক তিনি।

১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই প্রবল বর্ষণের এক রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামের এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কবি। তাঁর বাবার নাম মীর আবদুর রব এবং মায়ের নাম রওশন আরা মীর। বেড়ে উঠেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার সাধনা হাই স্কুল এবং পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলের পড়াশোনা করেন। মূলত এই সময় থেকেই তাঁর লেখালেখিতে হাতেখড়ি।

বিচিত্র কবি-জীবনের সূত্রপাত

বৈচিত্র্যময় তাঁর জীবন। কখনো সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন, কখনো প্রুফ রিডার ছিলেন, কখনো কবিতা লিখে গেছেন নিরন্তর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, স্বাধীনতার পর আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে জেল খেটেছেন, এরপর নিয়োগ পেয়েছেন শিল্পকলা একাডেমিতে। এক জীবনে বহু জীবনের স্বাদ নিতে পেরেছেন কবি। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৯৫৪ সালে সংবাদপত্রে লেখালেখির সূত্র ধরে কবি ঢাকা আসেন। তখন থেকেই তাঁর কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। আজীবন আত্মপ্রত্যয়ী কবি ঢাকায় আসার পর কাব্য সাধনা করে একের পর এক সাফল্য লাভ করতে থাকেন। কবি নিজেই বর্ণনা করেছেন সে অভিজ্ঞতা। দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত ইমরান মাহফুজ,র নেয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্রাম থেকে শহরে আসা নিয়ে কবি বলেন- "আমি ঢাকায় এসেছিলাম খদ্দরের পিরহান গায়ে, পরনে খদ্দরের পায়জামা, পায়ে রাবারের স্যান্ডেল, বগলের নিচে গোলাপফুল আঁকা ভাঙা সুটকেস নিয়ে। এসেছিলাম অবশ্যই কবি হতে। আজ অনেক বছর শহরে আছি। আমার সুটকেসের ভেতর আমি নিয়ে এসেছিলাম বাংলাদেশের সবগুলো নদী, পাখি, পতঙ্গ, নৌকা, নর-নারীসহ বহমান আস্ত এক বাংলাদেশ। যেমন, জাদুকররা তাঁদের দ্রষ্টব্য দেখান। আমার ভাঙা সুটকেস থেকে জাতিকে দেখিয়েছি। আমার দ্রষ্টব্য দেখে বাংলার মানুষ কখনো কখনো হাততালি দিয়েছেন, আবার কখনো অশ্রুসিক্ত হয়েছেন। আমি এখনো এই শহরেই আছি। আমি যখন এসেছিলাম তখন আমার বন্ধুদের বগলের নিচে থাকতো সিলেক্টেড পয়েমস জাতীয় ইউরোপের নানা ভাষার নানা কাব্যগ্রন্থ। আমি যেমন আমার ভাঙা সুটকেস থেকে আমার জিনিস বের করে দেখিয়েছি তাঁরাও তাঁদের বগলের নিচের পুঁজি থেকে নানা ভেলকি দেখিয়েছেন। এখনো আমি এই শহরেই আছি। আমার সেসব বন্ধুদের সৌভাগ্য হয়নি। এই মহানগরীতে তাঁদের নাম তরুণরা উচ্চারণ করেন না। কবি হওয়ার আজন্ম লালিত স্বপ্ন পূরণ করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি ছন্দ-অন্ত্যমিলের এই রাজাকে।

পরিচিত হয়ে উঠলেন কবি

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল পত্রিকা এবং কলকাতার নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ; বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বিখ্যাত কবিতা পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে ঢাকা-কলকাতার পাঠকদের কাছে তাঁর নাম সুপরিচিত হয়ে ওঠে; তাঁকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে সাংবাদিকতা জগতে পদচারণা শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরি কাফেলা পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিলে তিনি সেখানে সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ লোক-লোকান্তর সর্বপ্রথম তাকে স্বনামধন্য কবিদের সারিতে জায়গা করে দেয়। এরপর কালের কলস, সোনালি কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে উঠো প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলো তাকে প্রথম সারির কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন, যুদ্ধের পরে দৈনিক গণকণ্ঠ, পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।

মূলত এই সময় তিনি গল্প লেখার দিকে মনোযোগী হন। স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এক বছরের জন্য একবার জেল খাটেন। পরে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু তাকে শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি পরিচালক হন। পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

স্বকীয়তা

আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ অনন্য এক জগৎ তৈরি করেন। সেই জগৎ যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন নিয়ে নয় – স্নিগ্ধ-শ্যামল, প্রশান্ত গ্রামীণ জীবন নিয়ে। গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির চিরায়ত রূপ নিজস্ব কাব্যভাষা ও সংগঠনে শিল্পিত করে তোলেন কবি আল মাহমুদ।

তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার শহরমুখী প্রবণতার মধ্যেই ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদী নির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর

ছবিতে (নাস্তিক কবি) শামসুর রাহমানের পাশে নামাজরত আল মাহমুদ

চিরন্তন প্রেম-বিরহকে তার কবিতায় অবলম্বন করেন। নারী ও প্রেমের বিষয়টি তার কবিতায় ব্যাপকভাবে এসেছে। বলা যায়, আল মাহমুদ ছিলেন যৌবন ও প্রেমের কবি।

আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ তার অনন্য কীর্তি।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট লেখক, সমালোচক শিবনারায়ণ রায় বলেছিলেন, "বাংলা কবিতায় নতুন সম্ভাবনা এনেছেন আল মাহমুদ, পশ্চিম বাংলার কবিরা যা পারেনি তিনি সেই অসাধ্য সাধন করেছেন।"

বাংলা কবিতার রাজধানীকে কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করার কৃতিত্ব এককভাবে যদি আল মাহমুদকে দেয়া হয়, তাতে কোনো ভুল হবে না।

ইসলামি ভাবধারা

"অথচ ঘুমের মধ্যে কারা যেনো, মানুষ না জ্বীন
আমার কবিতা পড়ে বলে ওঠে আমিন, আমিন।"
- আল মাহমুদ

১৯৯০-এর দশক থেকে তাঁর কবিতায় বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস উৎকীর্ণ হতে থাকে; এজন্য তিনি তথাকথিত প্রগতিশীলদের সমালোচনার মুখোমুখি হন। ১৯৯৩ সালে বের হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস কবি ও কোলাহল। ইসলামি আদর্শের প্রতিফলন ঘটতে থাকে তাঁর লেখায়। ফলে এক শ্রেণির প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবী মহল তাঁর সমালোচনায় মেতে ওঠে। ইসলামি রাজনীতির দিকেও কবি কিছুটা ঝুঁকে পড়েন। ফলে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে সেদিকে কবির ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি আপন জগতে সমানতালে চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁর সৃষ্টিযজ্ঞ। কবি অবজ্ঞাভরে বলেছিলেন, "দাড়ি রাখলে আর ধর্মভীরু হলেই যদি কেউ মৌলবাদী হয়; তবে অবশ্যই আমি মৌলবাদী!"

অবহেলিত কিংবদন্তি

কবি আল মাহমুদ বাংলা সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন, তাকে একটিমাত্র লেখায় বর্ণনা করা একেবারেই অসম্ভব। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জাতীয় আত্মপরিচয় গড়ে তোলার একেবারে নেপথ্যের কয়েকজন মানুষের কথা যদি বলতে হয়, তবে তাদের ভেতর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আল মাহমুদের নাম রাখতেই হবে। হুমায়ূন আহমেদ যদি আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের রাজা হয়ে থাকেন, তবে আল মাহমুদ নিঃসন্দেহে কবিতার জগতে এক

**"কোনো এক ভোর বেলা, রাত্রি শেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাকিদ;
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ আমার ঈদ"
- আল মাহমুদ**

তবে তারপরেও এই কবি যেন কিছুটা অবহেলিত! কবির প্রাপ্য সম্মানের অনেকটাই হয়তো তিনি পাননি; অন্তত – কবির ধারণা এমনই। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন সাহসের সমাচার গ্রন্থে তিনি বারবার এই কথাটাই বলেছেন।

"তোমরা আমাকে বুঝোনি। আমি বলি না বুঝবে না, বুঝবে। তবে তখন আমি আর থাকবো না। তবে এটা মনে রেখো, বাংলা সাহিত্যে যারা কিছু করতে চাও, আমাকে তোমার পাঠ করতেই হবে। এটা আমার আত্মবিশ্বাস।"

এক সাক্ষাৎকারে কবি অভিমান করে বলেছিলেন, "আমার কাঁধে বিরাট সংসার। আমার রোজগার দিয়ে ছেলেমেয়েদের বড়ো করতে হয়েছে। ভালো কোনো চাকরি আমাকে কেউ দেয়নি। প্রচুর শ্রম দিতে হয়েছে। নানা ধরণের গদ্য লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু করতে পারলাম না। বন্ধুদের, কবিদের দেওয়া মানসিক চাপ উপেক্ষা করে সমাজে জায়গা করে নিতে হয়েছে আমাকে। কেউ কোনো স্পেস আমাকে দিতে চায়নি। অনেক ধাক্কা খেয়েছি, মুক্তিযুদ্ধ করেছি, জেলও খেটেছি। আমাকে বলো, একজন কবি আর কী কী করতে পারে? আমাকে স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়নি। এখন কোনো কিছুতেই আমার আর আফসোস নেই।"

সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা – স্বাধীনতা পদক তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তবে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন কবি।

মৃত্যু

দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন কবি। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে প্রায় এক দশক হতে চলেছিলো। জীবন প্রদীপের যেটুকু আলো নিভু নিভু করে জ্বলছিলো, সেটিও দপ করে নিভে গেল শুক্রবার রাতে। হাজারো ভক্তকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন এই মহান কবি।

শেষ কথা

কবিদের কি আসলেই মৃত্যু হয়? সেটা কীভাবে সম্ভব? তাদের কথামালা তাদের অমর করে রাখার গুরুভার তুলে নেয় কাঁধের উপর! কবি আল মাহমুদ। একটি নাম, একটি ইতিহাস! আল মাহমুদ বেঁচে থাকবেন তাঁর কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে! সোনালি কাবিন, লোক-লোকান্তর, বখতিয়ারের ঘোড়া, কালের কলস, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, পাখির কাছে ফুলের কাছে, কাবিলের বোনের মাধ্যমে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিবেন অনন্তকাল।

আমি চলে গেলে এ পারে আঁধারে কেউ থাকবেনা আর;
সব ভেসে গেছে এবার তবে কি ভাসাবো অন্ধকার?
আলো-আঁধারির এই খেলা তবে আমাকে নিয়েই শেষ
আমার শরীর কাঁপছে যেমন কাঁপছে বাংলাদেশ।„
- আল মাহমুদ

আল মাহমুদ কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না। তিনি বেঁচে থাকবেন অনন্ত কাল। যতদিন বাংলা থাকবে। বাংলায় কথা বলার মানুষ থাকবে। আমাদের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবেন কবি। প্রিয় কবি আল মাহমুদ।

দেশ পরিচয়ে যদিও আমরা বাংলাদেশি সাবাই
মুসলিম বলে আমাদের কোনো সীমানা তো বাধা নাই
-মুহিব খান

বরেণ্য

সংগৃহিত, বিন্যাস উলফতের।

মুহিব খান। পুরো নাম মুহিববুর রহমান খান।

বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় কবি, শিল্পী, সাংবাদিক, কলামিস্ট, টিভি আলোচক ও উপস্থাপক এবং ইসলামি চিন্তাবিদ। পুরো নাম মুহিব্বুর রহমান খান, জন্ম: কিশোরগঞ্জ শহরে ১৯৭৯ অক্টোবরে। ষোড়শ শতকে মুসলিম মধ্য এশীয় অঞ্চল থেকে তাঁর পূর্বসূরিদের বাংলাদেশে আগমন। পারিবারিক ঐতিহ্য; ইসলামি শিক্ষা, দাওয়াত ও সংগ্রামের ইতিহাসে সমৃদ্ধ। তিঁনি উপমহাদেশের বরেণ্য আলেমে দ্বীন, দার্শনিক, রাজনীতিক, বাংলাদেরশের প্রাক্তন পার্লামেন্টারিয়ান মাওলানা আতাউর রহমান খানের কনিষ্ঠ পুত্র।

পড়াশুনা:

তাকমীল ফিল হাদিস ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, ১৯৯৮ (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়াহ বাংলাদেশ)।

স্নাতকোত্তর "রাস্ট্র বিজ্ঞান" ২০০৪ (জাতিয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)

বর্তমান কর্মক্ষেত্র:

-প্রতিষ্ঠাতা প্রধান "ইসলামিক কালচারাল ইন্সটিটিউট" (আই সি আই)।
-সাবেক নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক লিখনী।

জাতীয় আঙ্গনে

তার কবিতা ও সংগীত দেশপ্রেম, মানবতাবাদ, বিশ্ব-শান্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির চেতনায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলাদেশের বিপুল জননন্দিত জাতীয় সংগীত শিল্পীদের অনেকেই গনমাধ্যমে তার লেখা দেশের গান পরিবেশন করেছেন। তাদের মধ্যে- সুবীর নন্দী, আবিদা সুলতানা, শাকিলা জাফর, আইয়ুব বাচ্চু, হায়দার হোসেন, কনক চাঁপা, মনির খান, মমতাজ, আগুন, শুভ্রদেব, ফাহমিদা নবী প্রমুখ অন্যতম। তিনি নিজেও গনমাধ্যমে দেশাত্মবোধক ও আদর্শিক গান গেয়ে কোটি মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। দেশে ও বিদেশে তার প্রতিটি কনসার্টে শ্রোতাদের স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ও ব্যাপক জনসমাগম পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের সামারিক বাহিনীর জন্য উদ্দীপনা সংগীত "ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি" এবং রাষ্ট্রীয় আইন শৃংখলা রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপির দলীয় সংগীতের রচয়িতা ও সুরকার তিনিই।

কর্মজীবন

বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় টিভি চ্যালেন ইসলামিক টিভির প্রথম অনুষ্ঠান নির্বাহীও তিনি ছিলেন। দেশের ইসলামি তারুণ্যকে অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে রক্ষা করে শিক্ষা সংস্কৃতি ও মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে সুযোগ্য ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি "ইসলামিক কালচারাল ইনস্টিটিউট (আই.সি.আই)" নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এখানে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান "ইসলামিক ফাউন্ডেশনে" তিনি নিয়মিত শিল্পী, আলোচক এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সম্মানিত বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দেশের সর্বাধিক প্রচারিত ও পাঠক নন্দিত জাতীয় সাপ্তাহিক লিখনীর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন।

- কোন ধরনের বই পড়তে পছন্দ করেন এবং কেন করেন?
– (মহিব খান:) সত্য ও মানবতার জন্য উপকারি যে কোন বই। নিজে আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করার জন্য।

কবির একটি আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার

১. লেখালেখির সূচনা কবে থেকে?
-কৈশোর থেকেই।
২. নিয়মিত লেখালেখি করেন?
– নিজের নিয়মে।
৩. লেখালেখির ক্ষেত্রে কার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়েছেন?
– পরিবার থেকেই।
৪. লেখালেখির ক্ষেত্রে আপনার প্রেরণা ও আদর্শ কে?
-নির্দিষ্ট কেউ নন।
৫. প্রিয় বই?
– ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, আত্মজীবনী।
৬. প্রিয় লেখক?
– নির্দিষ্ট কেউ নন।
৭. প্রিয় মুহূর্ত?
– পরিবারের সাথে কাটানো সময়।
৮. কোন সময় লিখতে ভালোবাসেন?
– যখন ইলহাম হয়।
৯. প্রিয় স্থান?
-মদীনা মুনাওয়ারা, মুসলিম স্মৃতি বিজড়িত ইউরোপ, নিজ শহর কিশোরগঞ্জ।
১০. প্রিয় পর্যটন স্থান?
– সমুদ্র ও নদীতীর, বিশ্বের উন্নত শহর, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
১১. স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা?
– পথ তৈরি করে যাওয়া, যে পথে পরবর্তিরা নির্বিঘ্নে চলবে।
১২. প্রিয় রং?
– সাদা এবং যেখানে যে রং মানায়।
১৩. প্রিয় পাখি ও প্রাণী ?
– ঈগল, ঘোড়া
১৪. প্রিয় ফুল ও ফল ?
– গোলাপ, আম।
১৫. প্রিয় খাবার?
– বেগুন ভাজা, পোলাও, গোশত, বিরিয়ানি, সুস্বাদু বিদেশী খাবার।
১৬. প্রিয় কবি?
– মির্জা গালিব, ইকবাল ও নজরুল।
১৭. প্রিয় কাজ?
– চিন্তা ভাবনা।
১৮. সর্বাধিক পঠিত বই?
– পাঠ্যবই।
১৯. প্রিয় মাদরাসা?
– আল জামিয়াতুল ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।
২০. প্রিয় মানুষ?
– সন্তান।
২১. প্রিয় ব্যক্তিত্ব?
– আব্বা
২২. প্রিয় ফেসবুক লেখক?
– নির্দিষ্ট নয়।
২৩. প্রথম লেখা প্রকাশ? কবে কোথায়?
– দৈনিক ইনকিলাব, ১১ বছর বয়সে।
২৪. এখন কী পড়ছেন?
– ফিকহ, দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব।
২৫. এখন কী লিখছেন?
– আল কোরানের কাব্যানুবাদ (দ্বিতীয়ার্ধ)
২৬. জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি?
– প্রথম বই প্রকাশ, মুজদালিফায় রাত্রিযাপন, রওজা যিয়ারত।
২৭. জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কী?
– বিদেশ ভ্রমণ।
২৮. জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনা কোনটা?
– সোনারগাঁ পানাম নগর ভ্রমণ, চাঁদের আলোয় মরুভূমিতে বসে আস্ত খাশি দিয়ে ডিনার।
২৯. জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা কী?
– আব্বার ইন্তেকাল।
৩০. দৈনিক কুরআন তেলাওয়াত করা হয়?
– চেষ্টা করি।
৩১. তাহাজ্জুদ আদায় করা হয়?
– অনিয়মিত।
৩২. জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
– ভালো ও বড়ো কিছু করা।
৩৩. শখ কী?
– সুস্বাদু খাবার ও বিশ্ব ভ্রমণ।
৩৪. এই যে লেখালেখি, এ নিয়ে জীবনের সমাপ্তি বেলায় কী দেখতে চান?
– সারাজীবনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি।
৩৫. কোন ধরনের বই পড়তে পছন্দ করেন এবং কেন করেন?
– সত্য ও মানবতার জন্য উপকারি যে কোন বই। নিজে আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করার জন্য।
৩৬. আমাদের নবী ছাড়া কোন নবীকে বেশি ভাল লাগে? কেন?
– হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে পিতাও মনে হয়।
৩৭. কোন সাহাবীকে বেশি ভালো লাগে? কেন?
– হযরত উমর ফারুক রা.।
ইলম, তাকওয়া, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, হক বাতিলের পার্থক্য করনে, তিনি নবী সুলভ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

বাকিংহামের দ্বার, হবে ঘর আল্লাহর
দিকে দিকে ইসলাম জাগবে ...
মুহিব খান

৩৮. কোন তাবেয়ীকে বেশি ভাল লাগে? কেন?
– হযরত ইমাম আবু হানিফা র.।
শরিয়তকে সুরক্ষিত রূপ দেয়ার জন্য।
৩৯.কোন ইমামকে বেশি ভালো লাগে? কেন?
– যারা দ্বীনকে সবার জন্য সহজ করতে চেয়েছেন।
৪০. কোন বুযুর্গকে বেশি ভালো লাগে? কেন?
– হযরত থানবী রহ.,নিজের চেয়ে সাধারণের জন্য চিন্তা বেশি করেছেন।
হযরত ইলিয়াস রহ., দ্বীনের দাওয়াত কথায় নয় কাজে দেখিয়েছেন।
৪১. আমাদের আকাবিরদের মধ্যে কাকে বেশি ভালো লাগে? কেন?
– হযরত হাফিজ্জি হুজুর রহ.। ইসলামী রাজনীতিকে দৃশ্যমান করে তুলেছেন।
৪২. কোন বীর মুজাহিদকে বেশি ভালো লাগে? কেন?
– ফকির মজনু শাহ। বৃটিশ বিরোধী স্বসস্ত্র সংগ্রামের জনক।
৪৩. প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কে?
– মাহাথির মোহাম্মাদ।
৪৪. দীর্ঘদিনের জন্যে কারাবাসে যেতে হলে, কুরআন-হাদীস ছাড়া আর কী বই সাথে নেবেন?
– কুরআনের কাব্যানুবাদের কাজ শেষ করব।
৪৫. যুবকদের জন্য আপনার কিছু বলার আছে?
– আবেগ ও বিবেকের সমন্বয়ে চলতে হবে ৪৬. ফেসবুক
৪৬: ইউজার/লেখকদের উদ্দেশ্যে কিছু নসীহত?
– অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না।
৪৭: প্রিয় উক্তি?
– "ইন্নামাল আ,মালু বিন নিয়াত।"
৪৮. নিজের লেখা কবিতার প্রিয় দুটি লাইন?
– আমায়তো ভাই আমার পথেই চলতে হবে/ একটু সয়ে সামলে নিও তোমরা সবে।
৪৯. সফল রাজনীতিবিদের সন্তান ও রাজনীতির ছাত্র হিসেবে বর্তমান
পরিস্থিতিতে কি ভাবছেন?
– শ্রেণি ,ধর্ম নির্বিশেষে একটি কল্যাণমুখী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান দরকার।
৫০. বাংলাদেশে ইসলামিক মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যত কী?
– প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, তবে বিনা চ্যালেঞ্জে প্রতিপক্ষ ছাড় দেবে না। লড়াই করেই ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে হবে।
৫১.প্রিয় পোষাক?
– সাদা পাঞ্জাবী, পায়জামা।
৫২. প্রিয় বাহন?
– উন্নত মানের গাড়ী।
৫৩. নিজের কবিতা ও সংগীতের মধ্যে কোনটা প্রিয়?
– কবিতা আমার মুক্তি, সংগীত আমার শক্তি।
৫৪. আপনি কবি না সংগীত শিল্পি?
– কবি হিসেবে সম্মানিত, সংগীত শিল্পি হিসেবে জনপ্রিয়।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, সাকিব মুস্তানসির

রচিত গ্রন্থ

এ যাবত তাঁর বেশকিছু অডিও-ভিডিও এ্যালবাম এবং সাহিত্য ও দর্শনের বই প্রকাশিত হয়েছে। কিছু প্রকাশের পথে:

লাল সগরের ঢেউ, প্রাণের আওয়াজ, অচিনকাব্য, ১২ টি সুন্দর গল্প, কবিতা কলাম, মুরাকাবা, মেঘে ঢাকা সুন্নাত, আল কুরআনের কাব্যানুবাদ, প্রেম বিরহ, ইলহাম, শিশুপাঠ, পৃথিবীর পথে, রাষ্ট্রচিন্তা, প্রচ্ছদ প্রসঙ্গ ও সরল সংলাপ।

প্রকাশিত এ্যালবাম

সীমান্ত খুলে দাও
দিন বদলের দিন এসেছে
মরু সাহারা
ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি
ইয়ে মেরা ওয়াতান
আবার যুদ্ধ হবে
নতুন ইশতেহার আসছে
দাস্তান-ই মুহাম্মাদ

আরও কিছু বই ও অ্যালবাম প্রকাশের পথে। এছাড়াও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে অনেক প্রবন্ধ ও কলাম।
তার রচিত ঐতিহাসিক অনুবাদ সাহিত্য "আল-কোরআনের কাব্যনুবাদ" এবং বিস্ময়কর সিরাত এ্যালবাম "দাস্তান-ই- মুহাম্মদ" বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম সৃষ্টি। এ যাবত বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। ২০১১ এর জুলাইয়ে যুক্তরাজ্য সফরে চ্যানেল আই ও এনটিভি ইউকে তার বিশেষ সাক্ষাৎকার ও ফোনো লাইভ প্রচার করে। ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হয় লন্ডনের স্থানীয় বাংলা পত্রিকাগুলোতে।

ভ্রমণ

তিনি ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সৌদীআরব, বাহারাইনসহ বেশ কিছু দেশ ভ্রমন করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবন

মুহিব খান ব্যক্তিগত জীবনে এক ছেলে ও এক মেয়ের পিতা।

অর্জন

দেশে ও দেশের বাইরে তিনি "জাগ্রত কবি" উপাধিতে সমাদৃত। পূর্ব লন্ডনে আয়োজিত এক গণসংর্বধনায় তাকে "মুসলিম উম্মাহর জাতীয় কবি" উপাধিতেও ভূষিত করা হয়। তাঁর ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা তাকে একজন আধুনিক আলেম, দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকেন।

শিবলি-নিবাস আজমগড়ে...

[দারুল মুসান্নিফীন-উদ্দেশ্যে
একটি জ্ঞানসফর।]

-ইফতিখারুল হক খাইর
সংযোজন ও সম্পাদনা: হুসাইন আলহুদা

“

ট্রেন ছাড়ার মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। তাই জামে মসজিদ ছাড়তে হল। রেলস্টেশনে এসে কিছুক্ষণ যাত্রী ছাউনিতে বসলাম। সালাহুদ্দিন ভাই তথ্যকেন্দ্রে গেলেন। ট্রেন দু'ঘন্টা লেট করে আসবে। কিছু করার নেই, মোদি মিঁয়ার চৌকিদারি! নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে গিয়ে, সিঁড়িতে বসলাম। এখানে ওয়াইফাই ফ্রি। ৫জি+ গতি! কিছু কিতাব ডাউনলোড করলাম। 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!'ও। মিসবাহি সাহিত্যে ডুব দিলাম। সালাহুদ্দিন ভাই দেশের খবারা-খবরে সার্চ করলেন। মুফাক্কির মানুষ। আর হুসাইন ভাই তো আদীব মশাই, একটি উর্দূ সাহিত্য-ম্যাগাজিন হাতে করে নিয়ে এসেছেন। তা নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন।
ট্রেন এসে পৌঁছলো। 'কাইফিয়্যাত এক্সপ্রেস'। ৭টার জায়গায় ১১টায়। বহুত ক্লান্ত মনে হল বেচারাকে। অপেক্ষা মৃত্যুর অপেক্ষা কষ্টদায়ক। এত্তগুলো মানুষকে মৃত্যুকূপে ফেলে, এত দেরীতে এলে?
বগীগুলো পুরোপুরি ভর্তি। পাঁ রাখার জো নেই। তবুও কোনোরকম উঠে গেলাম। ভিতরের অবস্থা বর্ণনা করতে চাচ্ছি না। যারা জেনারেলে চড়েছেন, তাদের কারো মুখ থেকে সরাসরি শুনে নিলেই উত্তম হবে। নিচে বসার জন্য সামান্য জায়গা পেয়েছি। সেখানে বসেই পড়ে শুরু করে দিই "তোমাকে...। এতক্ষণ পর্যন্ত 'মাওলানা' বলে সম্মোধিত হচ্ছিলাম। কিন্তু কাইফিয়্যাতে ওঠার পর হালাত পাল্টে গেল। আওয়াম ভাইয়েরা হাফিজ্জি বলে ডাকতে লাগল। সালাহুদ্দীন ভাই ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, সাহারানপুর ও তার আশপাশের এলাকায় আলেমদেরকে মাওলানা বলা হয়। আর ইউ. পি.র অন্যান্য এলাকাতে হাফিজ্জি বলা হয়। মজাই লাগল, কয়েকদিনের জন্য 'হাফিজ্জি' বনা গেল।

”

সোমবার। ষাম্মাসিক পরিক্ষা শেষ হলো। উত্তরপত্র জমা দিয়ে, হলরুম থেকে বেরুচ্ছিলাম। দেখলাম; একঝাঁক ব্যাগঅলা গেট ত্যাগ করছে। বুঝলাম, তারা বাড়ি যাওয়ার জন্য আগ থেকেই কাপড়চোপড় গুছিয়ে রেখেছিল। গেইটে 'এলান' সাঁটানো; 'এক সপ্তাহ বন্ধ।'
কামরায় গেলাম। ততক্ষণে কামরার একজন বাড়ি চলে গেছে। অন্যরাও প্রস্তুতি নিচ্ছে। লেখা-জোখার সরাঞ্জামাধি রেখে গোসল সেরে নিলাম। কাপড় নেড়ে কামরায় আসতেই একজনের মুসাফাহা...।
- দুআ কী দরখাস্ত!
- ঠীক হ্যায়, সফর মামূন হো।

দুই.

যোহর বাদ লম্বা ঘুম দিলাম। পরিক্ষার ক্লান্তি কিছুটা উপশম হল। আসরবাদ কেমন জানি আনমনা লাগছিল। কিছুক্ষণ 'মাজমা'র সদস্যদের সাথে মাঠে বিচরণ করছিলাম। হঠাৎ মনে উদয় হল, কিছু একটা লেখে সময় কাটানো যায়। কিন্তু কী লিখি! আশপাশ নিয়ে ভাবতে লাগলাম। কিছু একটা এসেও যেন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাগরিবের নামাজ পড়ে কামরায় ফিরছিলাম; মনে পড়ল, "যৌথাহার" নিয়ে লিখা যায়, ভাল জমবে। লিখতে বসে গেলাম। এবড়ো থোবড়ো কি যেন লিখেও ফেললাম। পরেরদিন হুসাইন ভাইকে দেখালাম। তিনি এ ব্যাপারে ভাল দক্ষতা রাখেন। ফেনী থেকে তার সম্পাদনায় "দীপ্তিকা" দেশে বেশ খ্যাতি ছড়িয়েছে। ভীষণ আনন্দ প্রকাশ করলেন। সাহস যোগালেন। বেশ মনোযোগের সাথে দেখলেন। ভুলগুলো শুধরে দিলেন। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

তিন.

পুরো ক্যাম্পাস একেবারে নিরব হয়ে গেল। দারুল উলূমের জমজমাট ক্যাম্পাস ঘণ্টা কয়েকের ব্যাবধানে বিরাণ কেল্লায় পরিনত হল। জায়গায় জায়গায় বাতি জ্বলছে। দরবানরা পাহারাও দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নেই কোলাহল আর 'কলবর' (!)। রাতের খাবারে সালাহুদ্দীন ভাইকে নিমন্ত্রণ করা হল। তিনি আগমন করলেন। আজমগড় যাওয়ার 'মানসূবা' বেঁধে রেখেছিলেন। বললেন-
- আজমগড় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। শুয়াইব ভাই বার বার তাকীদ দিচ্ছেন। তারা আমাদের দেখতে আসেন। তাদের দাওয়াতেও আমাদের যাওয়া উচিৎ। এটি তাদের প্রাপ্য। জামীল ভাই যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন, শারীরিক কারণে না করে দেন। এখন আপনাদের কেউ গেলে যাওয়া যেত।
হুসাইন ভাই বললেন: আচ্ছা, শিবলি অ্যাকাডেমি -দারুল মুসান্নিফীন- তো আজমগড়েই, না? তাহলে তো ভাবতে হচ্ছে। ঠিক আছে, কাল জানাচ্ছি।
- কাল আবার দেরি হয়ে যাবে না তো! ইফতিখার ভাই, ট্রেন কয়টায়, দেখেন তো।
ট্রেন এ্যাপে অনুসন্ধান চালালাম। সকাল নয়টা ও দশটায়, দিল্লির দুটো ট্রেন আছে। তার মানে সাড়ে আটটার আগেই নিশ্চিত জানিয়ে দিতে হবে।
রাত থেকেই প্রস্তুতি শুরু; মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা, জামা-কাপড় গুছিয়ে নেয়া, মনে করে পরিচয়পত্র ব্যাগে ঢুকানো। ইত্যাদি।

দেওবন্দ থেকে পুরানদিল্লি.....

[নিজামুদ্দীন (এতায়াতি) মারকাজ, লালকেল্লা, দিল্লি জামে মসজিদে।]

মঙ্গলবার। সকাল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হয়ে গেল। নয়টার মধ্যে প্রস্তুতি সেরে বেরিয়ে গেলাম। দেওবন্দ থেকে নিজামুদ্দীনের ট্রেনে চড়ব। প্রায় বারোটার সময় ট্রেন এল।

গোফরান ভাই স্টেশন থেকে বিদায় নেন। সফরের কিছু পাথেয় তার থেকে সংগ্রহ করেছি । সাড়ে চারটা নাগাদ হযরত নিজামুদ্দীন ষ্টেশনে পৌঁছে যাই। সি.এন.জি. যোগে মারকাজ মসজিদ। আসর নামায দা'য়ীদের সাথে আদায় করি। [অযুখানায় বড় বড় গঁজার মাছ দেখে সিলেটের 'দরগায়ে শাহজালালের' কথা মনে পড়ে গেল।]
আমাদের পরবর্তী ট্রেন ওল্ডদিল্লি [পুরানদিল্লি] থেকে। 'কাইফিয়্যাত এক্সপ্রেস'। সন্ধা ৭.০০টায় পুরান দিল্লি থেকে ছেড়ে যাবে, সারা-রাত এক নাগাড়ে ছুটবে, কাল দেড় প্রহরে (১০টা নাগাদ) আজমগড় নিয়ে পৌঁছাবে। এই হল 'সাইট' থেকে দেওয়া তথ্য। কিন্তু প্রবীণ লোকরা বলছেন: মোদি মিয়াঁ আসার পর নাকি, সব দরহম-বরহম হয়ে গেছে। এখন কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা নেই....
আসরের পরপরই পুরান দিল্লির বাসে চড়ে যাই। *'দিল্লিপ্রদেশ পরিবহন'*। সরকারী সার্ভিস। স্পীড ভালোই। কিন্তু আরও ভালো ছিল বলে, কেজরিওয়ালের উপর অভিযোগ।

জাঁহানুমায়....

বাস গন্তব্যে এসে থেমে গেল। হুসাইন ভাই বার বার বলছিলেন: দিল্লি জামে মসজিদ পুরান-দিল্লিতে। একটু জিজ্ঞেস করা যাক।
তো এক রিক্সাঅলাকে সালাহুদ্দিন ভাই ডাক দিলেন: হাঁ জী, জাম্যা-মসজিদ কিধার হ্যয়?
আমাদের মতলব ছিল; তুমিই নিয়ে যাও। কিন্তু ইন্ডিয়ান সাদা-সিধে মানুষ, ধান্ধা করলেন না, বললেন: বাপুরা, হেটে গেলে ১০মিনিট লাগবে। হেঁটে চেলে যাও। রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।
মাগরিবের নামাজ আদায় করি, এই ঐতিহাসিক মুসলিম প্রাণকেন্দ্রে, দিল্লি জামে মসজিদে। জামে মসজিদ নিয়ে লিখতে গেলে আলাদা গ্রন্থের প্রয়োজন হবে । বাদশাহ শাহজহাঁন ১৬৫০ ঈসায়িতে লালকেল্লার বিপরিতে, এক উঁচু পাহাড়ে এর ভিত্তি রাখেন। লালমর্মর পাথর দিয়ে নির্মিত। লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেকোনোভাবেই যেনো এটি; প্রাসাধ থেকে উঁচু থাকে। নির্মাণ কজে বিলম্ব হচ্ছিল দেখে বাদশাহ মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। হেতু জানতে চাইলেন। মন্ত্রী জবাব দিলেন: মূল প্লোরে যে ইটগুলো বিছানো হবে। প্রতিটি ইটে, একবার করে কোরআন শরীফ খতম করে ফুঁ দেওয়া হচ্ছে !!
পরবর্তি মোগলদের নতুন বাদশাহরা এই মসজিদের মেহরাব থেকে বাইয়াত গ্রহণ করতেন।এবং এখানের খতীবরা বাদশাহর মাথায় তাজ পরিয়ে দিতেন। বাদশাহ ঔরঙ্গযেব রহ.; মুহাদ্দিস আব্দুল গফুর শাহ বুখারি রহ. এর হাতে মুকুট পরেন। আবার জালিম বাদশাহর বিরুদ্ধে এখানেই গড়ে ওঠত মুসলমানদের 'শাপলাচত্বর'। উপমহাদেশের মুসলিম কেন্দ্রবিন্দু হওয়াতে মসজিদের নাম রাখা হয় 'জাঁহানুমা'।
কিছুক্ষণ পরিদর্শণ করলাম। মুগ্ধ হলাম। নিজেদের ঐতিহ্য দেখে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারলাম না। আবেগি হয়ে ওঠলাম...। সন্ধ্যায় টিকেটকক্ষ বন্ধ থাকায় মিনারে চড়তে পারিনি।

'কাইফিয়্যাতে'র কাইফিয়্যাত:

ট্রেন ছাড়ার মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। তাই জামে মসজিদ ছাড়তে হল। রেলস্টেশনে এসে কিছুক্ষণ যাত্রী ছাউনিতে বসলাম। সালাহুদ্দিন ভাই তথ্যকেন্দ্রে গেলেন। ট্রেন দু'ঘন্টা লেট করে আসবে। কিছু করার নেই, মোদি মিঁয়ার চৌকিদারি! নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে গিয়ে, সিঁড়িতে বসলাম। এখানে ওয়াইফাই ফ্রি। ৫জি+ গতি! কিছু কিতাব ডাউনলোড করলাম। 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!'ও। মিসবাহি সাহিত্যে ডুব দিলাম। সালাহুদ্দিন ভাই দেশের খবারা-খবরে সার্চ করলেন। মুফাক্কির মানুষ। আর হুসাইন ভাই তো আদীব মশাই, একটি উর্দূ সাহিত্য-ম্যাগাজিন হাতে করে নিয়ে এসেছেন। তা নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন।

ট্রেন এসে পৌঁছলো। 'কাইফিয়্যাত এক্সপ্রেস'। ৭টার জায়গায় ১১টায়। বহুত ক্লান্ত মনে হল বেচারাকে। অপেক্ষা মৃত্যুর অপেক্ষা কষ্টদায়ক। এত্তগুলো মানুষকে মৃত্যুকূপে ফেলে, এত দেরীতে এলে? বগীগুলো পুরোপুরি ভর্তি। পাঁ রাখার জো নেই। তবুও কোনোরকম উঠে গেলাম। ভিতরের অবস্থা বর্ণনা করতে চাচ্ছি না। যারা জেনারেলে চড়েছেন, তাদের কারো মুখ থেকে সরাসরি শুনে নিলেই উত্তম হবে। নিচে বসার জন্য সামান্য জায়গা পেয়েছি। সেখানে বসেই পড়ে শুরু করে দিই "তোমাকে...। এতক্ষণ পর্যন্ত 'মাওলানা' বলে সম্মোধিত হচ্ছিলাম। কিন্তু কাইফিয়্যাতে ওঠার পর হালাত পাল্টে গেল। আওয়াম ভাইয়েরা হাফিজ্জি বলে ডাকতে লাগল। সালাহুদ্দীন ভাই ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, সাহারানপুর ও তার আশপাশের এলাকায় আলেমদেরকে মাওলানা বলা হয়। আর ইউ. পি.র অন্যান্য এলাকাতে হাফিজ্জি বলা হয়। মজাই লাগল, কয়েকদিনের জন্য 'হাফিজ্জি' বনা গেল।

কিছুক্ষণ ঝিমুচ্ছি, কিছুক্ষণ বাইরের পরিবেশ দেখছি। অধিকাংশ যাত্রী আজমগড়েরই। মানুষগুলো অনেক ভালো দিলের। একদম ফেনী-নোয়াখালীর পাবলিক মনে হয়। বাংলা বললে হয়তো "হেনির ভাষায় কইত।" আর মাত্র দুঘন্টা কয়েক মিনিট বাকি। একটা বড়ো ষ্টেশন এল। অনেকেই নেমে গেল। কয়েকটা সীট শূন্য হল। উঠে গিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করলাম। আবার যাত্রা শুরু। কিছুক্ষণ দ্রুত আবার কিছুক্ষণ ধীরে। এক নাগাড়ে ষোল ঘন্টা দৌঁড়ার পর এখন একেবারে গ্রাম্য পরিবেশে প্রবেশ করেছে রেলপথ। গতি ক্রমান্বয় কমতে লাগল। ব্যাগপত্র গুছাতে লাগলাম। পাশে কয়েকজন ভদ্রলোকের সাথে বেশ গল্প হয়েছিল। তাদের 'আল-বিদা' জানালাম। যেন প্রতিবেশীদের ছেড়ে যাচ্ছি। ট্রেন থেমে গেল।

আমরা নামলাম। মুক্ত বাতাসে স্বস্তির শ্বাস নিলাম । আস্-সাফারু কিত'আতুম মিনান নার। এবার যেতে হবে সরাইমীর। একজন হিন্দুলোক আমাদের পথ বাতলে দিচ্ছিল। দু হাজারী নোট ভাঙ্গাতে গিয়ে তাকে নিয়ে মিষ্টি খাওয়া হলো।

টেক্সিতে চড়লাম। সমাইমীরে নেমে যেনো পূর্ণ ফেনী শহর [আমার এলাকা] আবিষ্কার করলাম। যেন ফেনী ট্রাঙ্ক রোড। সিংহভাগ মানুষ মুসলিম। মৌলবিদের আনাগোনা। হুজুররা বাইক নিয়ে মাহফিলের পোস্টার লাগাতে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন। মহিলারা সবাই পর্দানশীন। প্রিয় পাঠক, বার বার ফেনী-নোয়াখালীর কথা এসে যাচ্ছে। এটি আমার দূর্বলতা হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল তাই-ই।

মেজবান বাড়িতে

আরেকটি টেক্সিতে মুহাযযাবপুর। সেখানে গিয়ে নামতেই সমাদর শুরু। শুয়াইব ভাই, আতাউল্লাহ ভাই ও ইকবাল ভাইসহ প্রিয় মেজবানরা আমাদের 'ইস্তিকবাল' করলেন। তিনোজনের ব্যাগ তারা তিন কাঁধে তুলে নিলেন।

তাদের আন্তরিকতা-আপ্যায়নের কোন কমতি নেই। প্রথমেই ভাতের সঙ্গে গোটা চিকেন ভাজা। সাথে গরুর গোস্ত ও সালাদ। আবার খাবার বাদ সেমাই । নুডুলস ছিলো নাস্তায়। একদম যেন মায়ের হাতের খাবার।

মাগরিব পড়ে ইশা পর্যন্ত বিশ্রাম নিই। ইশা বাদ আবার শাহী খাবার। সাথে খাসির গোস্ত...। খাবার শেষে সফরের কাজা নামাজগুলো 'আদায়' করে নিই। শোওয়ার পূর্বে আবার পরিবেশন করা হয় গ্লাস ভর্তি গরম দুধ। শুক্রবার। ফজরে ওঠলাম। নামাজ বাদ জিকির-তিলাওয়াত হল। এখানের মুহতামিম মুফতি হাবিবুর রহমান কাসেমি বিহারি ছুম্মা আজমি। তিনি হিন্দুস্তানের একজন সুপরিচিত মুফতি হওয়ার পাশাপাশি চিশতিয়া তরিকার খ্যাতিমান পীর সাহেবও বটে। তিনি এখন কোনো এক কাজে মাদ্রাসার বাইরে আছেন। বিকেলে মাদ্রাসায় আসলে আমরা তাঁর সাথে মুলাকাত করব। মসজিদ থেকে বেরিয়ে অন্যান্য দেশীয় সাথিদের সাথে মুলাকাত হয়। প্রায় শ'খানেক দেশী ছাত্র এখানে পড়ছেন। দেওবন্দে ভর্তি পরিক্ষায় উত্তির্ণ হলেও রাষ্ট্রীয় সমস্যার কারণে ফরম না পেয়ে, তারা এখানে ভর্তি হন। এখানে অনেকেই তাখাসসুস ফিল-ইফতা পড়ছেন। আবার কেউ কেউ তাখাসসুস ফিল-হাদীস ।

অবসর সময়ে আমরা কখনো "উলফত" [প্রথম সংখ্যার]-এর লিখাগুলোর বিন্যাস করছি। আবার কখনো মাদ্রাসার মাকতাবায় গিয়ে কিতাবপত্র ঘাটাঘাটি করছি। তুলনামুলক উন্নত কুতুবখানা। যেমন আছে কয়েকটি বিশাল বিশাল আলমারি জুড়ে মোটামোটা জিলদের বড়োবড়ো কিতাবের সেট, তেমনি আছে চাপাশের সুস্থ আঙিনা ও লাল গালিচায় মোড়ানো অধ্যয়নের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

মুসলমানদের দ্বীন-ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জ্ঞান-গরীমা; প্রতিটি বিভাগে পরিবর্তন এসে গেছে। এ সময়ের নতুন শিক্ষিতরা নিজেদের পুরাতন জ্ঞান-স্বর্গ থেকে উপকৃত হওয়ার যাগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমাদের এই বিষাক্ত চোবলে তারা এতই আত্মভোলা হয়ে গেছে যে,তাদের অনেকে জানেই না যে, মুসলমানরা তাদের সোনালীযুগে জ্ঞানের মহা বিকাশ গড়ে ছিল। যখন শত শত নতুন শাস্ত্রের উদ্ভাবন ঘটে ছিল। তখনকার মৃতপ্রায় অনেক শাস্ত্রকে তারা নতুন জীবন দান করেছিলেন। আজকের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তিও মুসলমানদের সেই বিকশিত জ্ঞানের উপরই নির্মীত...।

আল্লামা শিবলি রহ. এই চতুর্মূখি ষড়যন্ত্র ও মুসলমানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পরিণাম দেখে কোনো বিহিত করার লক্ষ্যে দারুল মুসান্নিফীন প্রতিষ্ঠা করেন।

দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলি অ্যাকাডেমি

শনিবার। আজ দারুল মুসান্নিফীন যাওয়ার পালা। আজমগড় সফরের অন্যতম মাকসাদ। সক্কাল সক্কাল সবাই প্রস্তুত। ভোরেই বেরিয়ে পড়ি। মাদ্রাসা থেকে ২০/২৫ মাইল দূরে আজমগড় জেলা শহর। শহরের অদূরেই আজমগড় হীরাপট্টিতে অবস্থিত। প্রথমে শিবলি কলেজ, পাশে দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলি অ্যাডকউডওকাডেমি।

পরিচয়

দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলি একাডেমী আল্লামা শিবলি (রহ.)-এর এক মহান স্মৃতিস্মারক। আল্লামা শিবলি সম্পর্কে কমবেশ সবার কিছু না কিছু জানা থাকার কথা। 'নদওয়া' চিন্তাধারার মূল রচিয়তা। স্যার সায়্যেদ আহমদের কাছের শিষ্য হলেও তার কিছু আলাদা বৈশিষ্টও আছে। স্যার সায়্যেদ আহমদ নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামকে আধুনিকতার সমন্বয় করে উপস্থপনা করার নিমিত্তে তার সাথি মাও. হালী, মাও. শিবলি, মৌলবি চেরাগ আলী, ডিপুটি নযীর আহমদ প্রমূখকে নিয়ে কাজ শুরু করলেও মাও. শিবলি ছাড়া সবাই ছিলেন পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত ও ভীত সন্তস্ত্র। আল্লামা শিবলির দারুল মুসান্নিফীনের প্রতিষ্ঠাও ছিল এর এক জলন্ত প্রমাণ। ঈসায়ি উনিশ শতকের শেষোর্ধে বিশ শতকের শুরুর দিকে প্রাচ্যে যেভাবে পশ্চিমের কর্তৃত্ব চেপে বসেছে। জীবনের কোনো একটি দিক এথেকে নিরাপদ থাকেনি।

মুসলমানদের দ্বীন-ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জ্ঞান-গরীমা প্রতিটি বিভাগে পরিবর্তন এসে গেছে। এ সময়ের নতুন শিক্ষিতরা নিজেদের পুরাতন জ্ঞান-স্বর্গ থেকে উপকৃত হওয়ার যাগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমাদের এই বিষাক্ত চোবলে তারা এতই আত্মভোলা হয়ে গেছে যে,তাদের অনেকে জানেই না যে, মুসলমানরা তাদের সোনালি যুগে জ্ঞানের মহা বিকাশ গড়েছিল। যখন শত শত নতুন শাস্ত্রের উদ্ভাবন ঘটেছিল। তখনকার মৃতপ্রায় অনেক শাস্ত্রকে তারা নতুন জীবন দান করেছিলন। আজকের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তিও মুসলমানদের সেই বিকশিত জ্ঞানের উপরই নির্মিত। মুসলমানদের পতন এবং পশ্চিমাভীতি তাদেরকে নিজেদের সু বিশাল জ্ঞানভুবন সম্পর্কেও অজ্ঞাত বানিয়ে ফেলেছে। এদিকে পুরাতন সিলেবাসের ওলামাদের মাঝে নতুন যুগের বাস্তবতা নিয়ে কোনো ধারনাই ছিলনা। তারা কেবল দারস-তাদরীস নিয়ে ব্যাস্ত ছিলেন। যাদের লেখালেখির সামান্য হাত ছিল তারাও পুরাতন কিতাবগুলোর 'শারাহ-শুরুহাত' [অনুবাদ-ব্যাখ্যাগ্রন্থ] লিখে তৃপ্ততা অনুভব করতেন। যুগ চাহিদার মোকাবেলায় তাদের অতটা মাথা ব্যাথা ছিল না।

আল্লামা শিবলি রহ. এই চতুর্মুখি ষড়যন্ত্র ও মোসলমানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পরিণাম দেখে কোনো বিহিত করার লক্ষ্যে দারুল মুসান্নিফীন প্রতিষ্ঠা করেন।

দারুল মুসান্নিফীনের প্রথম প্রস্তাব তিনি এভাবে প্রদান করেন;
[১০ই মার্চ, ১৯১০ ঈসায়িদিল্লিতে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নদওয়াতুল ওলামার সম্মেলনে তিনি বলেন:]
"মুসলমানদের ধর্মীয় এবং জাতীয় শিক্ষা-চাহিদায় যে পরিমাণ কওমি মাদরাসা, একটি কওমি কলেজ, একটি কওমি ইউনিভার্সিটির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন একটি বৃহৎ আকারের লাইব্রেরির। যদি মুসলমানদের ধর্মীয় অস্তিত্ব, মুসলমানদের জ্ঞান সম্ভার, মোসলমানদের ইতিহাসকে জীবিত রাখতে হয়, তাহলে আবশ্যই এমন গন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাতে মোসলমানদের দূর্লব-প্রসিদ্ধ সব ধরনে গ্রন্থসম্ভার মজুদ থাকবে। যাতে মুসলমানদের আবিষ্কৃত নিজস্ব শাস্ত্রগুলোর যথেষ্ট সংগ্রহশালা থাকবে। এবং এতে প্রতিটি শাস্ত্রের কিতাবাদি মজুদ থাকবে। [দারুল মুসান্নিফীন: তা'আরুফ:পৃ.৭]

দারুল মুসান্নিফীন, প্রতিষ্ঠাগত কয়েকটি মৌলিক চেতনা

১. যেকোনে জাতির ইতিহাসে, তাদের লেখিয়ে সমাজের ভূমিকা থাকে সর্বাগ্রে। এরাই জাতির ধর্ম-কর্ম, ইতিহাস ঐতিহ্য, শিক্ষা-দিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পাসবান হতে পারে। তাদের কলমেই অংকিত হবে যুগ চাহিদার ধর্মীয় গবেষণা আর্টিকেল। তারাই তৈরি করবে জাতির উন্নত থেকে উন্নত শিক্ষা সিলেবাস। তারাই আমাদেরকে স্মরণ করে দেবে আমাদের সে সব ইতিহাস, যার উপর ভিত্তি রাখে আমাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব। তারাই পারে পূর্বপুরুষদের কৃতিত্বমূখর আবদানগুলোকে জাতিকে অবগতি করাতে। কিন্তু প্রচলিত বৃটিশ শিক্ষা সিলেবাস পড়ুয়া প্রজন্মের উপর কোনোভাবেই আশাটুকু বাঁধা যায় না যে, তাদের মধ্য থেকে হাতেগুণা-সংখ্যক ব্যক্তিও তৈরি হবে, যারা ইসলামের ইতিহাস-আবদানগুলো জানতে ইসলামের আবিষ্কিত প্রাচিন জ্ঞান-সম্ভারে হাত লাগাবে। আল্লামা শিবলি নুমানি রহ. এতে উদ্যমী হয়ে ওঠেছেন। তিনি এমন একটি শিক্ষিত সমাজ তৈরি করতে চেয়েছেন, যারা মুসলমানদের প্রাচীন জ্ঞানসম্ভার থেকে আগামী প্রজন্মের জন্য পুঁজি জোগাবে। প্রাচীন জ্ঞানসম্ভারকে নতুন যুগের চাহিদা মাফিক জাতির সামনে পেশ করবে। সেই স্বপ্ন পূরণেই দারুল মুসান্নিফীনের প্রতিষ্ঠা।

২. নতুন শিক্ষা সিলেবাসের আগ্রসনে প্রাচীন শিক্ষাধারা দিন দিন বিলুপ্তির পথে। তো দারুল মুসান্নিফীন প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্য হলো; মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞানসম্ভারকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে পূর্বপুরুষদের ইলমি মিরাসগুলোকে সংরক্ষণ করা।

দারুল মুসান্নিফীনের মৌলিক ভাবমূর্তী

আব্বাসিদের পতনের পর মুসলমানদের প্রতিভাগুলো সংরক্ষণ করার বাহ্যত কোনো অভিবাবক খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আল্লামা শিবলি রহ. তুরস্কসহ পৃথিবীর বড়ো শহরগুলো সফর করার পর এক্ষেত্রে প্রকট শূণ্যতা অনুভব করেন। তো এক পর্যায়ে নিজেই উদ্যোগ নেন। ১৯১৪ ঈসায়ি সনে এর ভিত্তিস্থাপন করেন। অন্যতম কয়েকটি লক্ষ-উদ্দেশ্য হলো:

১. গবেষকদের জন্য উন্নতমানের সংগ্রশালা প্রতিষ্ঠা করা ।

২. তাদের গবেষণালব্ধ রচনাগুলো সংরক্ষণ করা। ছাপানোর জটিলতা থেকে পরিত্রান দান করা। এবং তাতে প্রাতিষ্ঠানিক মুদ্রণ ব্যবস্থা থাকবে।

৩. দূর-দূরান্ত থেকে আসা প্রতিভূদের জন্য মেহমানখানার ব্যবস্থা করা।

এই ব্যয় বহুল কর্মসূচির বাস্তবয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল বাজেটের। অন্যদিকে তিনি এই মহতি কাজের জন্য সরকারী অর্থায়ন গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানান। তাই সর্বপ্রথম নিজের আজীবনের সম্বল, দূর্লভ সংগ্রশালা; ৭ আরমারি কিতাব দারুল মুসান্নিফীনের জন্য দান করে দেন। অন্যান্য সঙ্গী-সাথিদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। এবং সর্বসাধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথযাত্রা শুরু করেন। এ যাবৎ দারুল মুসান্নিফীন বিশ্বকে অসাধারণ অনেক ইলমি পাথেয় উপহার দিয়েছেন। যথা: সাতখণ্ডের "সীরাতুন্নবী", এগারোখণ্ডের "সিয়ারুস সাহাবা" এবং "তারীখে ইসলাম" ও "তারীখে হিন্দ" নামে ধারাবাহিক রচনাসমগ্র ইত্যাদি। যেগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভারসিটিতে সিলেবাসভুক্ত। আরবি, ফার্সি, পোশতু, ইংরেজি, বাংলা, তুর্কি, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠিসহ আঞ্চলিক অন্যান্য ভাষায় সেগুলোর অনুবাদ পাঠকদের দারুন উপকারে আসছে।

ক্যাম্পাসে

আমরা ১০টা নাগাদ দারুল মুসান্নিফীনে পৌছে যাই। এক মনোরম পরিবেশ। চতুর্পাশে ফুল বাগান। হরেক রকমের ফুল। পাঠকদের কেউ চেয়ার-টেবিলে, কেউ-বা-বাগানে পা এলিয়ে, জ্ঞান-সাগরে ডুবে আছে। আবার বাগানের একপাশে দরজা ঘেঁষে কজন বুড়ো-সাহিত্যিক উর্দু "শের-শায়েরী"র আড্ডা জমিয়েছেন।

আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা লিখি। সামনের হলে লম্বাতে টেবিলপাতা। তাতে উত্তরপ্রদেশ সহ ভারতের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রকাশিত, সম-সাময়িক উর্দু ও হিন্দির দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাসমূহ সাজানো। চতুর্দিকে চেয়ার পাতা। শিবলি কলেজের কতেক শিক্ষার্থীকে সেগুলো পড়তে দেখেছি। আশপাশের কয়েকটি আলমারিতে ফিকহ, হাদীস, তাফসীর ও আদবের কিছু গ্রহনযোগ্য কিতাব নমুনা স্বরূপ রাখা হয়েছে। হুসাইন ভাই কিতাবুল 'ইলালের উপর কাজ করছিলেন। তাই "আল 'ইলাল লি ইবনে আবি হাতিম" কিতাবটি নিয়ে বসে পড়লেন। এখানের নিয়ম হলো; "মামনূউল মাস্"; ধরা নিষেধ। কোনো কিতাবের প্রয়োজন হলে কাউন্টারে গিয়ে কিতাবের নাম বলেবে; তারাই বের করে হাতে তুলে দেবে। মাসিক পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলাম। কর্মকর্তারা আপন আপন কাজে ব্যস্ত। কেউ প্রেস থেকে কিতাব আনছে, তো কেউ বাঁধাই করছে। আবার কেউ প্যাকিং করে ডাকযোগের রসিদ লিখছে। আমাদের দিকে তাকানোর যেন কারো সময় নেই। ওদিকে সালাহুদ্দীন ভাই সহ বড়ো সাথিরা কাউন্টারে গিয়ে কথা বলে আমাদের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেন। বিশেষ মেহমান হিসেবে আমাদের সাথে একজন কর্মকর্তা দেওয়া হয়। তিনি আমাদের ভেতরে নিয়ে যান।আট নয়টা কামরা। সবগুলোই কিতাবে ভরপুর। প্রতি কামরায় আলমারির ফাঁকে ফাঁকে সরু পথ। মাঝের একটা কামরা মোটামুটি ফাঁকা। চারপাশ করে সোফা পাতা । নিচে বসার জন্যও গালিচা আছে। গাইড বললেন: কার্যবিবরনী সভা, পরামর্শ সভা ইত্যাদী এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

একেবারে শেষের কামরায়ত পৌছলাম। তালাখোলা হলো। গুরুত্বপূর্ণ একটি মিউজিয়াম। আল্লামা শিবলি রহ. এর হাতে লিখা "মুসাওয়াদাত" (পান্ডুলিপি), তাঁর জামা, কোর্ট, শেরওয়ানি ও প্লাস্টিকের বানানো পা; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পায়ে গুলি লাগায় আল্লামা শিবলির একপা কেটে ফেলতে হয়। বাকি জীবন তিনি প্লাস্টিকের বানানো পায়ের উপর ভর করে অতিবাহিত করেন। আরও আছে আরব-আজমে তার প্রতি প্রদত্ত কিছু সম্মাননা পদক। দৃষ্টি কেড়েছে আল্লামা ইকবাল, আবুল কালাম আজাদ, হাবীবুর রহমান অ'াযমি ও বাহাদুর ইয়ার জংগসহ অন্যন্য আসলাফের হাতের লিখা চিঠিপত্র। কিছু কিছু আমরা ক্যামেরাবন্দিও করেছি। আমাদের সাথিরা পরে লম্বা সময় নিয়ে ইস্তিফাদা করার সংকল্প করেছেন।

এবার আমরা বাইরে এলাম । চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছি। নিরিবিলি পরিবেশ। পূর্ব-উত্তর কোণে বড়ো করে মসজিদ বানানো হয়েছে। মসজিদের ফটক বন্ধ। পাশের ছোটো দরজা দিয়ে প্রবেশ করি। পাশে আল্লমা শিবলি ও আন্যান্য মনীষীর মাজার। আমরা সেখানে গিয়ে জিয়ারত করি। এর পর কিছুক্ষণ বাগানে বিচরণ করছিলাম। বাগানের একপাশে একটা কূপ দেখতে পাই। "মা-লা-বুদ্দা মিনহু" থেকে কূপের মাসআলা পড়ে আসছি। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কূপ থাকলেও কখনো দেখা হয়নি। তাই সেটির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। বেশ গভীর! এখন আর পানি নেই। শুকিয়ে গেছে।

হঠাৎ পেছন থেকে একজন বুড়ো-ঘরানার মধ্যবয়স্ক লোক আমাদের ডাক দেন। এতক্ষণ তিনি সম-বয়সী কয়েকজনের সাথে শে'র-শায়েরীতে [কাব্য আড্ডায়] মগ্ন ছিলেন। আমরা ভ্রু-কুঞ্চে তাকাই। একজনকে মুতাকাল্লিম বানিয়ে তাঁর কাছে যাই। তিনি সবাইকে বসতে বললেন। শেখ ওমায়ের ছিদ্দিকী নদবি। বর্তমান দারুল মুসান্নিফীনের প্রধান। মতবিনিময়ের পর তিনি বর্তমান বাঙালিদের লেখালেখির আগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রোজনামচা লেখার তাকিদ দেন। আর মাদ্রাসাপড়ুয়াদের হীনমন্যতা দূর করার জন্য বলেন: দারুল মুসান্নিফীন আপনাদের। আপনারা এসে নবাবি [জমিদারি] দেখাবেন। আমরা যে কোনো বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতার করব। অথচ আপনারা এসে কেমন যেন আজনবী আজনবী ভাব নিয়ে কেটে পড়ছেন। ঠেকছে উল্টো, স্কুল-শিক্ষার্থীরা এসে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যায়....।

কথাগুলো চেতনে রেখাপাত করেছে। এই অভিবাবকের সাথে দীর্ঘ গল্প হয়। আমরা কিছু কিতাব সংগ্রহের আগ্রহ প্রকাশ করি। তিনি পন্দি এঁটে দেন যে আপনারা বিক্রয়কেন্দ্রে যান, আমি আশ-পাশে আছি। ছাড় দেওয়ার ব্যাপার এলে আমি পাশ থেকে আওয়াজ দিব!

[অসম্পূর্ন...]

ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ঈ.

সংগ্রামমূখর গঙ্গোহর একদিন......

-ইসলাম উদ্দিন
হাইলাকান্দি.আসাম।
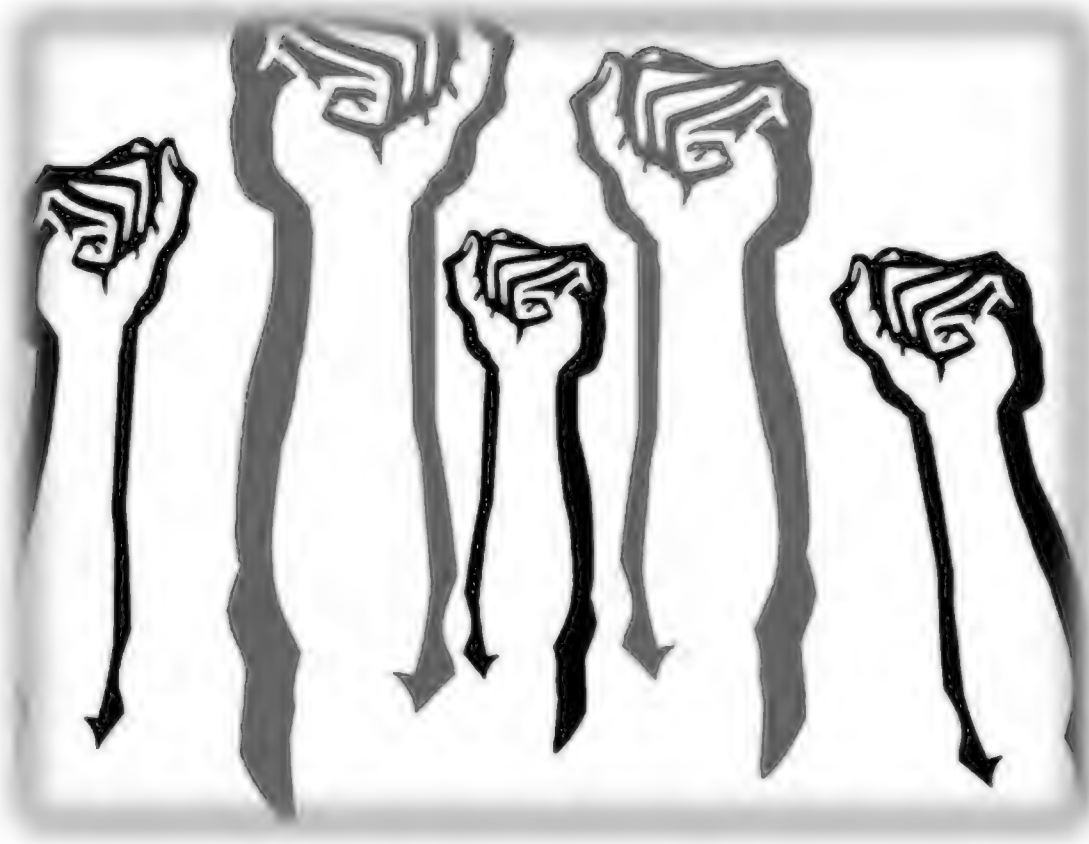
মিডিয়ায় চোখ ফেললেই কেবল অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতনের স্ট্রিমরোলার। মুসলমানদের নরসংহার, কাশ্মিরিদের বুকফাটা চিৎকার। জানিনা কেন সুরতহাল বদলায় না, যেন বদলাবার নয়! ... সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ,তাই বিল পাশে নেই কোনো মানা । সবকটি বিলে মুসলমানরাই নিশানা। বিরোধী দলগুলো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সংসদে অস্তিত্বহীন মুসলিম প্রতিনিধিত্ব। ধর্মীয় সংগঠনগুলোও আজ দিশেহারা। যেন দিকভ্রান্ত নৌকা। উদ্ভ্রম মাঝি।
দুর্দশাগ্রস্ত এই দিশেহীন সমাজে মিটমিট আলো জ্বালতে, পথহারাদের পথ দেখাতে, যেন কিছুটা উঠে দাঁড়াতে চাচ্ছে 'পুপুলার ফ্রন্ট অব ইণ্ডিয়া।' যেটা নির্যাতিতদের পক্ষে আওয়াজ তোলার চেষ্টা করছে। তাই এটি এখন অত্যাচারীদের পথের কাঁটা, জালিমদের পথে পাহাড়সম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতির কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত সংরক্ষণ করতে যাত্রা শুরু করেছিল। ২২টি রাজ্যে একসাথে অভিযানে নামল। নাম দিয়েছিল “ভয়হীন বাঁচুন, স্বসম্মানে বাঁচুন”। ভারতের কোণায় কোণায় চলল সফল অভিযান । দিল্লি, ভারতের রাজধানী। এখানে আওয়াজ উঠালে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ। তাই ইন্দিরা গান্ধী ইন্দোর স্টেডিয়ামে সম্মেলনের ডাক দিল তারা। শিরোনাম ছিল 'জনধিকার সম্মেলন' ।
আমজনতার উপস্থিতি সম্মেলনের স্বার্থকতা, সফলতা নির্ণয় করল। সফলতার শিখরে পৌঁছতে দেখে নেতৃবৃন্দ নড়েচড়ে বসলেন। কাউন্সিল থেকে আদেশ এল গ্রামে গ্রামে সভা করতে হবে। মাসজিদে মসজিদে বয়ান রাখতে হবে। মানুষকে জাগ্রত করে, সম্মেলনের মহত্ত্ব তুলে ধরে কনফারেন্সে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। দায়িত্ব অর্পিত হল সদস্যদের কাঁধে। সদস্য হিসেবে আমাকেও।
যেতে হল ঐতিহাসিক পূন্যভূমি 'গঙ্গোহে'।

গঙ্গোহ পানে এটি আমার প্রথম সফর। অচেনা-অজানা জায়গা। পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞাত। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, যদি হয় সফরসঙ্গীও নতুন কেউ। সবকিছুই নতুন। বিশেষ করে নতুন সফরসঙ্গীর আশংকা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।
কিন্তু বান্দার পেরেশানি আল্লাহর কি পছন্দ? নতুনত্ব ও অভিনবত্বের যেন কিছুই নেই। আলহামদুলিল্লাহ, সফরসঙ্গী হলেন প্রিয় মুস্তাফা ভাই। আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। স্বস্তির শ্বাস নিলাম। সফরের তারিখ ঘনিয়ে আসল। প্রস্তুতি চলছে তুঙ্গে। হালফিলে ঘটা দু-তিনটে বিষয় নির্দিষ্ট করলাম। মানুষের সামনে কিছু তো বলতে হবে!
২১ সেপ্টেম্বর। সকাল ন'টা। প্রস্তুতি চূড়ান্ত, এক্ষুনি বের হব। কিন্তু দেওবন্দ ছেড়ে যাবো! তাও পুরো এ-ক-দি-ন! মন নারাজ। কিছুতেই মানছে না। বুঝালাম মনকে। বললাম, উম্মাহর করুণ অবস্থা। কওমের স্বার্থে কাজ করা অপরিহার্য এবং ধর্মীয় দায়িত্বও।
শাকির ভাই। দারুল উলূম (ওয়াকফ) দেওবন্দে দাওরা হাদীসে পাঠরত। যাওয়ার আগে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। কোথায় যাব? কিভাবে যাব? কোন বাসে? কোন পথে?
তার জানা আছে। তার বর্ণনানুযায়ী প্রথমে 'ফাটক' গেলাম । বাসে চেপে বসলাম নানোতার উদ্দেশ্যে। নানোতা থেকে গঙ্গোহ। সেখানে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন ভাই নাদিম ও মুসাইয়াদ। প্রথম দেখা, প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু নতুনত্বের টেরই পেলাম না। দু'জনই ছিলেন অতি মায়িক, নরম দিল ও মিষ্টিমুখী। ক্ষণিকের বার্তালাপে মন জয় করে নিলেন তাঁরা। নাস্তার ইন্তিজাম করলেন। নাস্তা সম্পন্ন হল। এখন কর্মপথে রওয়ানা। পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যান্যার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী জোগাড় করে দিলেন তারা।
পথচলা শুরু হলো বাইক চড়ে। দুটি বাইকের ব্যবস্থা করলেন নাদিম ভাই। যেতে হবে গ্রামের বড়ো মসজিদে। বাইক আমার প্রিয় সওয়ারি। দীর্ঘ ছ'মাস পর বাইক পেয়ে মন ভরে গেল। ভাই নাদিমের পিছনে বসলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই দৃশ্য হলো অবিকল আপন গ্রামের পরিবেশ। গ্রামের সরু রাস্তা। রাস্তার দু-পাশে আখ খেত। চতুর্দিকে সবুজের মেলা। অনুকূল আবহাওয়া। আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন । মাঝে মাঝে চাষীরা চাষ করছেন। গ্রামের শিশুদের হৈ-হুল্লোড়। পাখির কলরব। সব মিলিয়ে মনমুগ্ধকর পরিবেশ।
বাইক যত এগোচ্ছে, তত সুন্দর দৃশ্য। সুন্দর থেকে সুন্দরতম এবং সুন্দরতম থেকে অভিসারের দিকে ছুটেই চলছি। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম বড়ো মসজিদে। আহ! গ্রামে এত সুন্দর মসজিদ! বিস্মিত হলাম। অবাক হলাম।
বিস্ময়াভিভূত হলাম নামাজে বড়ো সংখ্যক মুসল্লীদের আগমনে। নামাজান্তে অকুণ্ঠ চিত্তে অতি সংক্ষিপ্তভাবে চমৎকার বক্তৃতা রাখলেন ভাই মুস্তাফা। প্রাণের উচ্ছ্বাস ও হৃদয়ের উষ্ণতায় উত্তপ্ত বক্তব্যে জোতির্ময় হেরার আলোর স্নিগ্ধ বিচ্ছুরণ ফোটে ওঠল। শ্রোতাগণ প্রভাবিত হলেন। বেশ প্রভাবিত! সবাই সম্মেলনে যোগদান করতে প্রস্তুত। সংবিধান প্রদত্ত অধিকার আদায়ে ও সরকারের সংবিধান বিরোধী নীতি ও অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সবাই ঐক্যবদ্ধ। অত্যাচার-উৎপীড়ন ও জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠাতে তারা যেন পূর্ব থেকে অপেক্ষমাণ। কেবল পাচ্ছিলেন না কোন প্লাটফর্ম, মিলছিলো না বিশ্বস্ত জনপ্রতিনিধি। যখন শুনলেন পি.এফ.আই-এর নাম। মনে হলো, যেন খুঁজে পেয়েছেন বহু দিনের হারিয়ে যাওয়া কোনো রাজ তোরণের সন্ধান। বন্ধু মুস্তাফা ও আমি আসামের। এলাকার লোকজন খবর পাওয়া মাত্র দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। অতিথি আপ্যায়নে সবাই এগিয়ে এলেন । কিন্তু আমাদের কর্মসূচি স্বল্প সময়ে অনেক দীর্ঘ। তাই দেরি না করে আপন পথে এগিয়ে চললাম।
আবার বাইকের যাত্রা। এখন হবে 'নুক্কড় সভা' তথা স্ট্রিট কর্ণার প্রোগ্রাম। নাদিম ভাইয়ের বাইক গিয়ে থামল গ্রামের এক চৌরাস্তার মুখে। সেখানে ছিল বয়স্কদের আড্ডা। চতুর্দিকে ছোটো-খাটো এবং মাঝখানে বড়োসড়ো একটা হুক্কা। দৃশ্যটি ছিল আমার কাছে নতুন। মোবাইল বের করলাম। চুপিসারে ফটো তুলে স্মৃতির পাতায় রেখে দিলাম। সালাম-কালাম হলো, পরিচয়ও। এর ফাঁকে নাদিম ভাই মাইক চালু করলেন। মাইকের আওয়াজ শুনতেই শিশুরা উপস্থিত। শিশুদের আগমনে সভার শোভা দ্বিগুণ বর্ধিত হল। সরলমনা গ্রাম্য মানুষ। ভালো সাড়া দিলেন। দেশের হাল হকিকত ও আমাদের উদ্দেশ্য তুলে ধরলাম। একই মনোভাব, একই ভাবনা, একই প্রতিক্রিয়া। সম্মেলনে যোগদান করবেন বলে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উত্তর পাড়ার "বড়ি মহল্লা"। যেতে হবে আসরের পূর্বে। সূর্যের কিরণ যেন আস্তে আস্তে যৌবন হারাচ্ছে। রাস্তার ধারেও খেলার মাঠে শিশুদের সংখ্যা আগের চেয়ে বাড়ছে। হৈ-হুল্লোড়, লাফালাফি ও দৌড়ঝাঁপ। দৃশ্যটি অসাধারণ ও তৃপ্তিদায়ক। ভাবলাম, তাদের সাথে যদি দুমিনিটও থাকা যেত! আহহা আমিও স্মৃতিতে ভেসে গেলাম। সেই দূরন্ত বাল্যকালে। এমন সময় সুমধুর কণ্ঠে আজানের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো । এতক্ষণে আমরাও উপস্থিত 'বড়ি মহল্লা'তে। মসজিদ ক্যাম্পাসে আছে মাদ্রাসা; নাকি মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে মসজিদ?

বিস্ময়াভিভূত হলাম নামাজে বড়ো সংখ্যক মুসল্লীদের আগমনে। নামাজান্তে অকুণ্ঠ চিত্তে অতি সংক্ষিপ্তভাবে চমৎকার বক্তৃতা রাখল ভাই মুস্তাফা। প্রাণের উচ্ছ্বাস ও হৃদয়ের উষ্ণতায় উত্তপ্ত বক্তব্যে জ্যোতির্ময় হেরার আলোর স্নিগ্ধ বিচ্ছুরণ ফুটে ওঠল। শ্রোতাগণ প্রভাবিত হলেন। বেশ প্রভাবিত! সবাই সম্মেলনে যোগদান করতে প্রস্তুত।

জানি না ভালো করে। মাথায় টুপি, পরনে পাঞ্জাবি, তালিবানে ইলমে নুবুয়তের এক সমারোহ। মাসুম শিশুদের এই দল মসজিদের কাতারে হাজির। এ যেন জান্নাতি কোনো মাখলুক! কী অপরূপ দৃশ্য! কোনো আওয়াজ নেই, নেই কোনো দৌড়ঝাঁপও । শান্ত ও নিস্তব্ধ।
নামাজান্তে আবার বয়ান রাখলেন মুস্তাফা ভাই। আশাতীত সাড়া পেলাম। ইমাম সাহেব দাওয়াত দিলেন। যেতেই হবে। গ্রহণ না করলে বুঝি নারাজ নারাজ ভাব। তাই বাধ্য। বার্তালাপের মধ্য দিয়ে হালকা নাস্তা সেরে নিলাম।
সন্ধ্যা একেবারেই নিকটে। নাদিম ভাই একটু টেনশনে। বললাম, ভাই! টেনশন কীসের? সব তো ঠিকঠাক চলছে। বললেন যেতে হবে অনেক দূর। কিন্তু হাতে সময় খুব কম। তাড়াহুড়ো করে বাইকে বসলাম। নাদিম ভাই বাইকের গতি বাড়াতে থাকলেন। সরু ও বাঁকা পথ। পথটি কিন্তু এ গতির মুয়াফিক নয়। শরীর ভয়ে কম্পমান। থরথর কাঁপতে লাগল। "একটু ধীরে যান" বাক্যটি মুখে এসে থেমে যায়। এমনই ইতস্ততার মধ্যে আল্লাহর মেহেরবানী। সময় মতো নিরাপদে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে। মাগরিবের জামাতে শরিক হতে পেরে বেজায় খুশি নাদিম ভাই, তার চেষ্টা বিফল যায়নি বলে। নামাজে মুসল্লীদের সংখ্যা চোখ ধাঁধানো, মন মাতানো। সুন্নত আদায়ের পর উদ্দেশ্য উপস্থাপন করলাম উপস্থিতিদের সামনে। আশানুরূপ সাড়া পেলাম। অধিকাংশ লোকজন সম্মেলনে যেতে রাজি। যুবক-বৃদ্ধ-কিশোর- সবাই।
পুরো দিনের ক্লান্ত বদন। সামান্য সময় মসজিদে বসে বিশ্রাম নিলাম। এমন সময় একজন এসে "ভাই, পানি চাহিয়ে?" বলে পানি নিয়ে এলেন। ঠান্ডা রিফ্রেশ পানি। জী-ভরে পান করলাম।
নদিম ভাই বেগ হাতে প্রস্তুত।
সময় অপচয় হচ্ছে বলে বেরিয়ে পড়লেন। কোথায় যেতে হবে, আমার অজানা। বাইকের গতি কিন্তু দ্রুত। কোমল ঠাণ্ডা হাওয়া ও মৃদু বাতাস। অসাধারণ তৃপ্তি অনুভূত হল। বাইকের আলোয় সামনে ভেসে ওঠল হাইওয়ে। কিছুক্ষণ চললাম হাইওয়ে। ভালোই লাগছিল।
কোথায় যাচ্ছি? এখনও অজানা। দশ মিনিট পর বললাম, ভাই নাদিম, আর কতদূর যেতে হবে? কিছু একটা বললেন। হয়তো গন্তব্যস্থানের নাম। বুঝতে পারলাম না ভালো করে। আঞ্চলিক উর্দু তো। বুঝা বড়ো দায়। বুঝার ভান করে খামুশ থাকলাম কিছুক্ষণ। অবশেষে বাইক থামলো মসজিদ প্রাঙ্গণে। রাস্তার দু পাশে মানুষের ভীড়। এত মানুষ! কিছু একটা হয়েছে! এর মাঝে একজন বলে ওঠলেন যে, তাবলিগ জামাআত এসেছে। অতঃপর জামাতের পক্ষ থেকে নৈশভোজের দাওয়াত এল। মসজিদ সংলগ্ন বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। ঘরের আঙিনায় দস্তারখানা। খাবারের সামগ্রী তাতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। রকমারি খাবার। রুটি, ডাল, ক্ষীর সবই ছিল। পাশে অন্ধকারে দুজন মহিলা রুটি তৈরিতে ব্যস্ত। সব মিলে পরিবেশ ছিল উপভোগ্য।
খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। আজান হল। নামাজ আদায় করলাম। বয়ান রাখলেন বন্ধু মুস্তাফা। এমন বয়ান যে হৃদয়ের সূক্ষ্ম বীণায় ঝংকার তুলল। একে একে সবাই নাম লিখালেন।

ঘড়ির কাঁটা ঠিক ন'টায়। একটু শান্ত পরিবেশ। আবহাওয়া পুরোপুরি অনুকূল। চারিদিকে নিস্তব্ধতা। একটুখানি নির্জনতা। পুরো দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেহমন ক্লান্ত। শরীর বিশ্রামের আকুতি করছে। নাদিম ভাইরও একথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বললেন, চলো আমার গরিবখানায়। রাত বেশি হয়ে গেছে। এখন দেওবন্দের বাস পাওয়া মুশকিল। রাত এখানেই কাটাতে হবে। একথা বলে বাইকে চড়লেন। জিজ্ঞাসা করলাম ভাই, আপনার ঘর এখান থেকে কতদূর? বাইকে যেতে ১৫ মিনিট, আমার জন্য ১০ মিনিট। একথা বলতে বলতে বাইকের গতি দ্বিগুণ। ক্লান্ত শরীর ও হিমেল হাওয়া। দুটোর মিশ্রণে ঘুম পাকড়ে নিল। চোখ কচলাতে কচলাতে রাস্তা ঠাহর করতে লাগলাম।
ঘড়িতে চোত ফেললাম। কখন পার হবে দশ মিনিট। অপেক্ষা যেন প্রবল প্রতীক্ষায় রূপ নিল। দশ মিনিট পার হতে না হতেই নির্জন রাস্তার পাশে বাইক বন্ধ হল। চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে আছে। যেন অমবশ্যার রাত। আঙুলি ইশারায় বাড়ির পরিচয় দিলেন নাদিম ভাই। প্রবেশদ্বার ছিল বড়ো মাপের। সিঁড়ি করে ভেতরে যেতে হয়। ভিতরে চার-পাঁচটি মহিষ। পাশে বন্ধ ট্যাক্টর। একেবারেই নতুন। একটু সামনে গেলাম।
আজব দৃশ্য। ঘরের আঙিনায় শুয়ে আছেন অনেকে। আলাদা আলাদা বিছানা। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বিচিত্র শুধু একজন। বসে আছেন একা। হাতে তসবিহ।
ভাই নাদিমের অপেক্ষায় খাটে বসে প্রহর গুনছেন। নাদিম ভাই নিকটে গেলেন। হাটু পেতে নতশিরে সামনে বসলেন। দু হাত তার মাথায় রেখে কপালে চুমু খেলেন। কিছু কথা হল আপসে। জিজ্ঞাসা করতেই নাদিম ভাই বললেন, তিনি আমার জান, প্রিয় আম্মাজান, আমার সবকিছু, আমার আশ্রয়স্থান। একথা বলে শোয়ার ব্যবস্থা করলেন। খালাজান গরম দুধ নিয়ে এলেন। বললেন, সারা দিন পরিশ্রম করেছ। একটু দুধ পান করে নাও।
কুসুম গরম, আরও যখন চিনির মিশ্রণ, সবচে অমৃত হলো খালাজানের মমতা। দুধ শেষ হতে না হতেই প্লেট ভর্তি আপেল হাজির। কিছু খেলাম কিছু রেখে দিলাম। খাওয়ার মানসিকতা নেই। পুরো দিনের ক্লান্তিমাখা শ্রান্ত শরীর। তড়িঘড়ি করে শুয়ে পড়লাম।
কৃত্রিম আলো এখনও জ্বলন্ত। নিভে যাওয়ার প্রহর গুনছি। লাইটের আলোয় ঘুম আসবে না নিশ্চিত। কী করব? ভাবছিলাম! ঘুমও আসছে না, নাদিম ভাইকে একথা বলতেও পারছি না। "ফাটা বাঁশের মাঝখানে" কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিছানায় পড়ে আছি।
কিছু সময় এভাবেই অতিক্রম হল। নাদিম ভাই ঘরে প্রবেশ করলেন। হয়ত কৃত্রিম আলো এখন বন্ধ হবে। হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার আলো জ্বলল। কিন্তু না। কৃত্রিম আলোর সামনে হৃদয়ের আলো ধরাশায়ী। ভাই নাদিম চলে গেলেন মায়ের পাশে। মার মহব্বতে বিলীন নাদিম ভাই। গল্পে বিভোর। গল্প যেন খুব রসালো। অতিথি হিসেবে আমাদের কথা মনে পড়ছে না তার। আমিও হৃদয়ের চোখে তাকিয়ে আছি তাদের দিকে। অন্তর গহীনে কল্পনায় ভর করে। আমারও কল্পনার দেয়ালে প্রিয়সী মায়ের প্রকৃতি ভেসে ওঠল। যেন ডাকছেন; হৃদয়ের বীণায় মায়ের ডাক আঘাত হানল। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরল। চোখের একেকটা ফোঁটা যেন মায়ের মমতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবে শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবলাম, ভাবতে থাকলাম। কখন যে অতল ঘুমে হারিয়ে গেলাম..., কেউ কি টের পায়?

শিক্ষার্থী: দাওরা হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ

পাক্ষিক
উলফত
বিচিত্রের মাঝে ভালোবাসা জাগাবে

উপ-সম্পদকীয়:

উলফত বন্ধুরা, পাক্ষিক উলফতে যেকেউ যে কোনো বিষয়ে লেখতে পারো। কোনো না কোনো বিভাগে উলফত পরিবার তোমার লিখনী ছেপে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

তো যেসব লেখা সমাজ সংস্কার, কিংবা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে পাঠিয়ছ, সেগুলো উপসম্পদকীয় পাতায় ছেপে দেওয়া হলো। আশা করছি, বড়ো হয়ে তোমরা জাতির কল্যাণে জাতীয় দৈনিকগুলোর উপসম্পাদকীয় বিভাগে ইনসাফের কথাগুলো তোলে ধরবে।

যেখানে বিপ্লবীদের দিন কাটে...

-মু. তরিকুল ইসলাম

ক্লাসের চাপে কয়েকদিন যাবত যেতে না পারলেও মনটা যেন সেদিকেই উড়াল দিতে চায়। কেন? নিজেকে ভালো কিছু মনে হয়, তাই। সেটি কী?
-বিপ্লবী!
হোস্টেল, ক্যাম্পাস কিংবা খেলার মাঠ; সবখানেই ভেসে আসে তাদের আজাদির শ্লোগান। কখনো এমনও হয়েছে যে, পড়ার টেবিলে বসেও আনমনে ওদিক থেকে উড়ে যাওয়া শব্দপালের সাথে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি, বিড়বিড় করে আওড়িয়ে সহমত প্রকাশ করছি।
আজ শুক্রবার। আর অপেক্ষা করা যায় না, যেতেই হবে। তারা তো কত কিছুই ত্যাগ করেছে। আমি না হয় নিজের অবসর সময়টাতে যাই। সুতরাং এশার নামাজের পর চলে এলাম বন্ধুবর বড়ো ভাই হুসাইন আলহুদা ভাইয়ের কামরায়। সদা হাস্যোজ্জ্বল, উদ্যমি ও কর্মঠ এক সজিব প্রাণ। আবেদন করলাম সেখানে যাওয়ার। বাহ সাথে সাথেই প্রস্তুত। বুঝতে পারলাম না এরকম একজন ব্যস্ত মানুষ এত সহজে! পরে মনে হলো
ও-ও-ও, আজ বিদ্যুত নেই । ফলে ল্যাপটপও চলছে না।
সুতরাং যায়েদ ভাইকে সাথে নিয়ে তিন জনে রওনা করলাম সমাবেশের দিকে।
দারুল উলূম চৌক থেকে মসজিদে রশীদ হয়ে ঈদগাহ পানে চলে যাওয়া রোড়টা এখন জনাকীর্ণ। স্বাভাবিক চলার কোনো সুযোগ নেই, ছোটো-বড়ো পর্দানিশীন মা-বোন আর সাধারণ মানুষ, সাথে তলাবাদের উপচেপড়া ভীড়ে সাধারণ গাড়ি-ঘোড়া চলাচলের জো নেই। আমাদের অনুভূতিও এখন অন্য রকম। অজান্তেই যেন তাল মিলাচ্ছি "আজাদি" "আজাদি"। যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন তাদের কর্মসূচি সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী বিদ্রোহের রুপ নিচ্ছে।

দুই.

বিজেপি সরকার পার্লামেন্টে তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ভারতের জন্য অত্মঘাতিমূলক কয়েকটি কালো আইন করে বসেছে। একটি "সিএএ"। এই আইনে বিদেশ থেকে আসা ধর্মপীড়িত আশ্রয়পার্থীকে নাগরিত্ব দেওয়া হবে বলে বলা হয়। কিন্তু মুসলমান এই লিস্টে নেই। প্রথম কথা: মুসলমান কেন নিগৃহীত? দ্বিতীয় কথা: হ্যাঁ, প্রয়োজন নেই মুসলমানদের তোমাদের করুণার। হয়তো কোনো মুসলামন কখনো ধর্মপীড়িত হয়ে ভারতের নাগরিগ হতে চাইবেও না। কিন্তু প্যাঁচ অন্য জায়গায়।
সেই কংগ্রেস আমলেই "এন আর সি" নামে নতুন এক খেলা চালু করেছিল। তাতে বলা হয়, সকল নাগরিকদের সকল জাতীয় কাগজপত্র মিলিয়ে দেখা হবে, যদি কোথাও দুই কাগজের মাঝে চুল পরিমাণ হেরেপের দেখো যায়, তাহলে সে এই দেশের নাগরিক নয়। যেন কুতকুত খেলা। যথা: একজনের নাম "মু. আব্দুর রহমান।"এক কাগজে মু. আব্দুর রহমান আছে, অন্য কাগজে ভুলে "মু." শব্দটি পড়ে গিয়ে লেখা আছে "আব্দুর রহমান"। বাকি সব ঠিক আছে। কিন্তু খেলার অধিনায়ক বলবে যে, "আউট. .."।
তুমি এই দেশের নাগরিক নও। চাই তোমার চৌদ্দগোষ্ঠি দেশের আজাদির জন্য সর্বস্বই-বা বিলীন করুন না কেন?
-তাহলে আমি কে?
-হ্যাঁ, তুমি বাঙালি হলে "বাংলাদেশি", আর অন্য কোনোও ভাষার হলে "পাকিস্তানি"!

অসমে "এনআরসি" বাস্তবায়ন করা হলো। ফেঁসে গেল বারো লক্ষ হিন্দু নাগরিকও। সাথে পাঁচ লক্ষ মুসলমান। সাবাইকে ডিটেনশ্যান (বিদেশি অনুপ্রবেশকারী নাগরিকদের জন্য বানানো) ক্যাম্পে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু মুসলিম ছাড়া অন্য জাতির জন্য "কোনো চিন্তা নেই"। কারণ তারা এন আর সি দিয়ে বের হলো, সি এ এ দিয়ে আবার নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন একদম স্ব-সম্মানে!
সিএএ আইনটি এমন সময়ে পাশ করা হয়েছে, যখন সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসিজিদের ফায়সালায় মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেয়। কেবল সুপ্রিম কোর্ট বলে কথা, মুসলমানারা বুক বেঁধে সহ্য করে নিতে বাধ্য হয়। কারণ এই দেশে থাকতে হলে মুসলামনদের আইনকে সম্মান করে থাকতে হবে। আর এটি মুসলমানদের স্বভাবপ্রকৃতিও। কেননা তারা ঐশী আইনের অনুসারী, কোথাও হাঙ্গামা করে প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, আইনের আওতায় নিজেদের অধিকার আদায়ে তারা আবার চির সংগ্রামীও। সুপ্রিম কোর্টের ফয়সালা যেহেতু রাষ্ট্রীয় আইনে নির্দ্ধিধায় মেনে নিতে হবে, মুসলমানদের নিশ্চিত অধিকার হরণ হলেও তারা চুপ ছিল। কিন্তু সি এ এ? আর কত খেলার বস্তুতে পরিণত করতে চাও আমমদের? তাই জীবনের মায়া ত্যাগ করে পুরুষদের সাথে মাঠে নেমে পড়েন সচেতন মা-বোনরাও।

কারণ যখন নিজের অধিকার নিয়ে, নিজের স্বাধীন করা দেশে সম্মানের সহিত বেঁচে থাকা যাবে না, আর যারা স্বাধীনতার সময়ে তৃতীয় সারিতে থাকতেও সাহস করত না, তারা এসে স্বাধীনতা নিয়ে হোলি খেলবে, তা কীভাবে মানা যায়? আজ যদি সংগ্রাম না করা হয়, তাহলে একদিন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে ডিটেনশ্যান ক্যাম্পে হীন মৃত্যুতে নিকৃষ্টের ন্যায় ধুকে ধুকে মরতে হবে, তাই বীর বেশে আজই রণাঙ্গনে...। পুরুষরা নিজেদের মতো করে কখনো অবরোধ, কখনো বিক্ষোভ, সাথে কোর্ট-কাঁচারি-আদালতে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আর মহিলারা নির্দিষ্টস্থানে ক্যাম্প গড়ে যথাসাধ্য ধর্মীয় আবহ বাজায় রেখে গণ অবস্থান করতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম জামিয়া মিল্লিয়া আল ইসলামিয়ার নারী শিক্ষার্থীরা দিল্লির শাহীনবাগ থেকে বিপ্লব তোলে, সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে দেওবন্দ, মিরট, হায়দারাবাদ, বাংলা, মহারাষ্ট্র থেকে নিয়ে দেশের সর্বত্র। আমরা এখন যাচ্ছি, দেওবন্দের ঐতিহাসিক ঈদগাহ ময়দানের "সত্তাগড়ায়।" "সম্মিলিত মহিলা জোট" এই সত্তাগড়া-এর আয়োজন করেছে। আশ পাশের হাজার হাজার মহিলা পালা ভাগ করে উপস্থিত থেকে ২৪ ঘন্টা আজাদির শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। তারা ঘরে ফিরবেনা যতক্ষণ-না এই কালো আইন ওফেস নিচ্ছে"সরকার"।

ঈদগাহ ময়দানের (বর্তমান সত্তাগড়া-র) খণ্ডচিত্র:

আযাদী ৪৭-এর শত স্মৃতি লালন করেই আয়োজন বিন্যাস করা হয়েছে এতে। তেমনি সমাবেশস্থলকেও সাজিয়েছে নানান ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারা। যেন এক বিদ্রোহী মেলা। মূল ফটকে লাগিয়ে দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিকৃতি গান্ধীজি ও ভারত-সংবিধান প্রণেতা আম্বেটকারের ছবি। ভেতর ঢুকে বাম দিকে তৈরি করেছে বন্দীশালার প্রতিকী "ডিটেনশন ক্যাম্প।" পাশেই লাগিয়ে দিয়েছে বিশাল জাতীয় পতাকা। যেন একথায় জানান দিচ্ছে, আজ যদি কোনোভাবে এ কালো আইন বাস্তবায়ন করতে পারে, তাহলে স্বাধীন হওয়া সত্বেও এধরণের পরবাসী ক্যাম্পেই আমাদের থাকতে হবে। যদিও মাথার উপরে উড়তে থাকবে স্বাধীন পতাকা। এগুলোর পাশেই রাখা হয়েছে ঐতিহাসিক বিভিন্ন নিদর্শন । ইন্ডিয়া গেইট, দেওবন্দ সত্তাগড়ের বিলবোর্ডসহ আরও কত কি। এটি মহিলাদের জন্য নির্ধারিত এরিয়ার বাইরের জায়গাটুকুর চিত্র। যা মূলত পুরুষদের জন্য রাখা হয়েছে। দূরত্ব বজায় রেখে পুরুষরাও মহিয়সী মহিলাদের আজাদির এই মিশনকে উৎসাহ জোগাতে শ্লোগানে সুর মিলিয়ে জয়গান তোলে।

এতেও দাঁড়ানোর কোনো জায়গা নেই। স্কুল -কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বৈশাখি মেলার মত ছোটো –ছোটো জটলা বেঁধে গোলাবৃত্ত বানিয়ে গলা ছেড়ে দিচ্ছে আজাদি আজাদি শ্লোগান। পুরো দৃশ্যটা চোখে পড়ার মতো ।বাহারি রঙের প্লেকার্ড, পতাকাসহ আরো অনেক কিছু। পুরুষদের সীমানা শেষ হলে মাধ্যখানে একটি নিরপেক্ষ খালি জায়গা। এখানে কেউ আসে না। মূলত পর্দার শিয়তার জন্য এটি রাখা হয়েছে। এরপর শুরু হয়েছে মহিলাদের এরিয়া। যা মূল অবস্থানস্থল। এতে ঢুকার জন্য দুদিক দিয়ে রয়েছে দুটি প্রবেশ পথ। কেবল মহিলারা ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে ভেতরে। প্রবেশ পথে দূরত্ব বজায় রেখে কিছু পুরুষ পাহারা দেয়। যাতে কোনো ধরণের ধূর্তমি না হয়। এই এরিয়ার চতুর্দিকে রশি ও বাঁশ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ঠান্ডা কিছুটা পশমিত করার জন্য বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে কালো ম্যাট। ছোটো-বড়ো, বৃদ্ধা-পৌঢ় সবাই একই সাথে গেয়ে যাচ্ছে আজাদির গান। এই মুহূর্তের অসাধারণ একটি দৃশ্য হলো, স্বামীরা নিজেদের স্ত্রিদের বাইকে করে নির্দিষ্টস্থানে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে ছেলে মাকে, বড়ো ভাই তার ছোটো বোনকে গণঅবস্থানে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে।

অনেকেই হাতে বা মাথায় বেণীর মতো বেঁধে নিয়েছে জাতীয় পতাকা। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে এক তালে সুর তোলছে আজাদির সুরে। মঞ্চ থেকে কখনো গজল বা কবিতা আবৃত্তি, কখনো জ্বালাময়ী বক্তব্যে কাঁপিয়ে তুলছে ময়দান। ইতি মধ্যে জাতীয় মিডিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে দেওবন্দের এ সত্তাগড়া।

বাদুরের বাচ্চারাও বসে নেই

নানিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে (সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী সংগঠন) আর এস এস, এবং তাদের হোতা পুলিশরূপের মির্জাফররা, সাথে স্থানীয় কিছু নেতা-সেতা তো আছেই। ভয়ভীতি, হুমকি-ধমকি দিয়ে রুখতে চাচ্ছে আজাদির মিশনকে। তবে তারা কিছুতেই দমার নয়, শিশা ঢালা প্রাচীররের ন্যায় অনড়। দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে; আমরা বীরের জাতি, ভীতু নয়। আমরা তাদের উত্তরসূরি , যারা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন করেছে । হাজারো মা বুক খালি করেছেন এদেশের জন্য ।আজও যদি সেই স্বাধীনতা রক্ষার্থে জীবন দিতে হয়, রক্ত দিতে হয় আমরা সদা প্রস্তুত। আমাদের প্রতিটি সন্তানকে এর জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত । তাদেরকে কাসিম নানোতবি বানাব, শায়খুল হিন্দ বানাব, তাদেরকে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি বানাব। তবুও আমরা কারো কাছে মাথা নত করব না। হ্যাঁ, এখানকার শিশুদের অবস্থা দেখার মতো। মা-বোনরা তাদেরকে সাজিয়ে আনে রণ সাজে। ছোটোদের কবিতা আবৃত্তি, আর শিশু গলার শ্লোগান; বেশ মাতিয়ে রাখেছে সমাবেশকে। শুধু তাই নয়, নিয়মিত ইবাদতের জন্য বনানো হলো অস্থায়ী মসজিদ। বাত বারোটার পার যখন সবাই চলে যায়, একদল মহিলা এখানেই থাকেন, অর্থাৎ মাসজিদেই, এবং কান্নাকাটিতে কাটান নিশি রাত, জাতির ভবিষ্যত হেফাজতের জন্য। বিপ্লবের কামিয়াবির জন্য। সময় হলেই পালাক্রমে নামাজ পড়ে নিচ্ছে। অবস্থানকারীদের জন্য খানা-পানীয় সংগঠনের পক্ষ থেকেই হচ্ছে। প্রচার-প্রসার ও মুখপত্র হিসেবে গড়ে তোলেছে নির্দিষ্ট মিডিয়া সেল। সমাবেশ বেশ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথেই পরিচালনা হচ্ছে। লাউড স্পিকারের দুপুর থেকে অর্ধ রাত পর্যন্ত লাউডস্পিকার চালু রাখছে। ইতিমধ্যে সকলকে আমলে ধাবিত করতে শুরু হয়েছে মাস্তুরাতের কার্যক্রম । ক্যাম্পে জিকির আজকার তালিম তারবিয়াতও চলছে সমানভাবে।
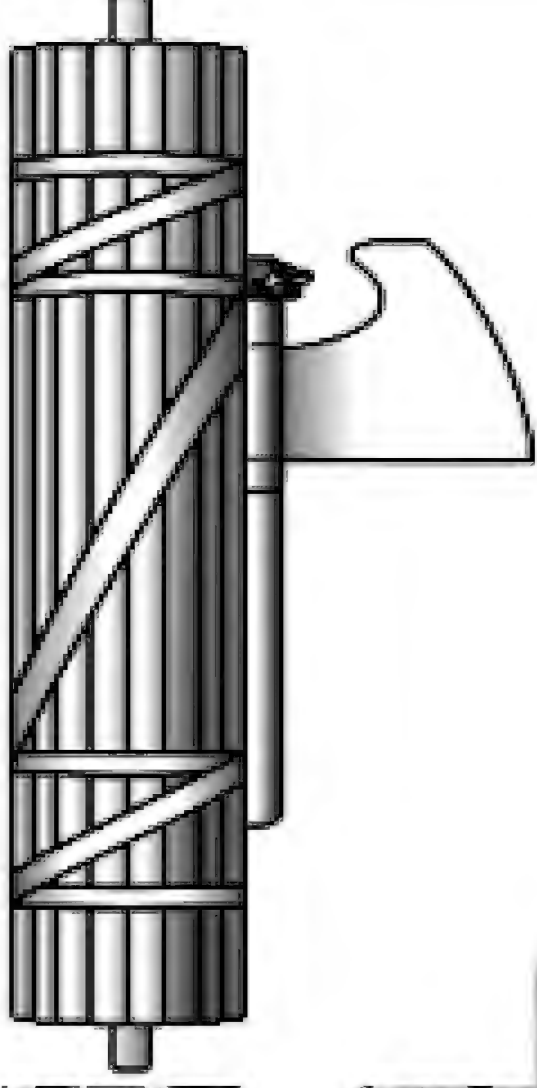
ফ্যাসিবাদ বা ফ্যাসিজম: মগের মুল্লুক মগের শাসন

-মু. আরাফাত হক

ফ্যাসিবাদ। কোনো এক শিল্পির মুখে শুনেছিলাম, প্রতিবাদী সুরে গেয়েছিলেন যে, *"ফ্যাসিবাদকে বলো, আর নয়, আর নয়।"*

সবার অভিযোগ যে, আমাদের ভারতেও নাকি কেউ ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চাচ্ছে? তাই চলুন, সংক্ষিপ্ত পরিসরে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। বাদ বাকি সিদ্ধান্ত আমরাই নিতে পারব, কে ফ্যাসিস্ট, কে নয়।

সেই ফ্যাসিস্ট পার্টি থেকে ফ্যাসিবাদ

ফ্যাসিবাদকে চিনতে হলে আমাদের প্রথমে ফ্যাসিবাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। ফ্যাসিবাদ বা ফ্যাসিজম হল একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ। ফ্যাসিজম শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ কুঠার। এমন আটি যার পেছনে কুঠার ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় কুঠারতন্ত্র ।

উৎপত্তি: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি জয়লাভ করে। কিন্তু তাদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। যার প্রভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সব ধরনের প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনীতিও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভয়াবহ এই দূর্ভোগের টাল সামলাতে না পেরে জনগণ হয়ে পড়েছিল নাজেহাল এবং সরকার হয়ে পড়েছিল নিষ্ক্রিয়। মনে হতো যে, দেশটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে আর দেশের হাল ধরার মতো কেউ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে "মুসেলিনি" নামক এক ব্যক্তি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ইতালির একটি শহর থেকে তার "ফ্যাসিস্ট পার্টি"র সূচনা করেন। বৈপ্লবিক চিন্তাচেতনার কারণে অতি অল্প সময়ে তিনি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন।১৮২২সনে তিনি নিজের অনুসারীদের নিয়ে একটা সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাদের উইনিফর্ম ছিল কালো জামা। এক সময়ে বাহিনী নিয়ে তিনি মার্চ করলেন রোমের দিকে। বাহিনীর লোকজন সরকারের কাছে দাবি জানায়, মুসেলিনিকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক অন্যথায় শক্তি প্রয়োগে প্রশাসনের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেব। শেষে রাজা বাধ্য হয়ে মুসেলিনিকে সরকার গঠন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি ইতালির স্বেচ্ছাচার ডিক্টেটার বনে যান। মসনদে বসেই অন্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেন।

ফ্যাসিষ্ট মুসেলিনির দর্শনসমূহ

মুসলিনির মৌলিক দর্শনগুলো এই:

১/ সত্তাগতভাবে "ব্যক্তি" কোনো গুরুত্ব রাখে না

২/ আসল বিষয় হলো জাতির কল্যাণ সামনে রাখা এবং এই স্বার্থে যে কোনো পদক্ষেপ হাতে নেওয়া ।

৩/ "আমার জাতি এগিয়ে যাক" এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক এটাই জীবনের মূল লক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪/ এজন্য এমন রাজত্ব চাই যেখানে সব শাখার উপর সরকারের হস্তক্ষেপ থাকবে; তথা শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ, চরিত্র গঠন এবং আইন-কানুন সব কিছু সরকারের নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হবে। মোটকথা রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয় সরকারের মন মতো পরিচালিত হবে।

৫/ কাজেই রাজত্ব বা ক্ষমতা হতে হবে প্রবল শক্তিশালী, মজবুত এবং সর্বসাধারণের প্রভাবমুক্ত । এবং এর জন্য এটাও জরুরি যে, দেশের পুরো জনগোষ্টি পুরোপুরিভাবে সরকারের অনুগত থাকবে। অর্থাৎ অন্ধভক্ত হতে হবে, কোনো বিরোধিতা করতে পারবে না।

মুসেলিনি তার জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন যুদ্ধ

এমন পরিস্থিতিতে "মুসেলিনি" নামক এক ব্যক্তি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ইতালির একটি শহর থেকে তার "ফ্যাসিস্ট পার্টি"র সূচনা করেন। বৈপ্লবিক চিন্তাচেতনার কারণে অতি অল্প সময়ে তিনি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন।১৮২২সনে তিনি নিজের অনুসারীদের নিয়ে একটা সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাদের উইনিফর্ম ছিল কালো জামা। এক সময়ে বাহিনী নিয়ে তিনি মার্চ করলেন রোমের দিকে। বাহিনীর লোকজন সরকারের কাছে দাবি জানায়, মুসেলিনিকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক অন্যথায় শক্তি প্রয়োগে প্রশাসনের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেব। শেষে রাজা বাধ্য হয়ে মুসেলিনিকে সরকার গঠন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি ইতালির স্বেচ্ছাচার ডিক্টেটার বনে যান। মসনদে বসেই অন্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেন।

পরবর্তি সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বড়ো মাপে দূর করতে সমর্থ হন। তিনি বলতেন, "আমরা কঠোরতা বর্জনকে বিশ্বাস করি না। কঠোরতা না থাকা কাপুরুষের লক্ষণ।" তার একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, "নারীর কাজ সন্তান ধারণ পুরুষের কাজ লড়াই।" এর সাথে তিনি একথাও বলতেন যে, "আমরা গণতন্ত্রেরও বিরোধী, কেননা সংখ্যাগরিষ্টের সঠিক সিদ্ধান্তে আসা জরুরি নয়। "

সুতরাং ফ্যাসিবাদের থিওরি অনুযায়ী ফ্যাসিস্ট লিডার যিনি হবেন, তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেটাই জাতিকে মানতে হবে।

এছাড়াও তাদের বক্তব্য ছিল,
"আমরা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সম্মান স্বীকার করি না। ব্যক্তিগতভাবে সে কিছুই নয়। জাতির ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে তার যতটুকু সম্মান, তাই। সুতরাং জাতির উন্নতির নামে যদি কোনো বিধান জারি করা হয়, আর তা ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে, তাহলেও সেটা যুক্তিসঙ্গত এবং জাতির জন্য তা মেনে নেওয়া জরুরি।
তারা বলত, "যদি কোনো সমালোচনা করতে হয় তাহলে ফ্যাসিস্ট পার্টির ভিতরে করো এবং সংশোধনের পথ কোনটি তা বয়ান করো কিন্তু পার্টির বাইরে গিয়ে, পত্র-পত্রিকায় কিংবা মিটিং-মিছিল করে সরকারের সমালোচনা করার কোন অবকাশ নেই।"

সারকথা:

মুসেলিনির ফ্যাসিবাদের সারকথা হচ্ছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির কোনো মূল্য নেই। মূল্য যা থাকতে পারে তা হলো জাতির। আর জাতির প্রতিনিধিত্ব করে স্টেট অর্থাৎ একদিকে সরকারের অধিকার সীমাহীন, অপরদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্বীকৃতি। আর যখন এমন হয়; তখন কঠোরতা অপরিহার্য আর এটাই হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। এবার একটু বিশ্ব পরিক্রমায় দৃষ্টি ফেলুন, যেথায় যেথায় এমন মগের মুল্লুক দৃষ্টিগোচর হবে, তাদের বুঝিয়ে দিন যে, তোমরা ফ্যাসিবাদ নামক কালো বিমারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছ। কে জানে বর্তমান কোনো রাষ্ট্র বা পার্টি এ থেকে মুক্ত আছে কিনা। আর যখন জনগণ বা সাধারণ্যের মূল্য থাকবে না, তখন শান্তির কল্পনা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম এ ক্ষেত্রে একেবারে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি প্রদান করেছে যে, সরকার জনগণের সেবক, সাথে জনগণ সরকারের ন্যায়নীতি মানতে বাধ্য থাকবে। হ্যাঁ, সরকার ভুল করলে ভুল বিবেচনায় খোদ জনগণও সরকারকে শুধরে দিতে পারবে। যদি কেউ ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করত হয়ত, কোনো তন্ত্রই আবিষ্কার করতে হতো না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি

-(লেখকের নাম নেই)

বর্তমান বিশ্বের কোথাও রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ নেই বলেই আজ বিশ্ব অশান্তি ও নানা নৈরাজ্যের শিকার। এজন্যই হয়তো পশ্চাত্যের কিছু দূরদর্শী গবেষক চিন্তাবিদ অশান্ত এ বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একক ডিক্টেটরশিপ অথবা একনায়কতন্ত্র কামনা করছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক একটি সাফল্য হলো, তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি লিখিত শাসনতন্ত্র মানবতাকে উপহার দিয়েছিলেন মদিনা সনদ নামে।
৪৭টি বিধান সম্বেলিত এ ধরনের মানবিক সমঝোতামূলক শাসনতন্ত্র প্রয়োগিকভাবে আর কেউ উপহার দিতে পারেনি।

নীতি ও আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন তিনি ।আল্লাহর কুরআন হলো সে আদর্শের মূলভিত্তি সেই হিসেবে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি ।
তিনি তার রাষ্ট্রের জন্য নিম্নের মূলনীতিগুলো নির্ধারণ করেন:

১ . আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য সব অনুগত্যের উর্ধ্বে।
২ . সব দায়িত্বপূর্ণ ও প্রশাসনিক পদে মুসলিম নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।
৩. সরকারের সমালোচনার অধিকার জনগণের থাকবে।
৪. ইসলামি সরকারের অনুগত জনগণের অপরিহার্য।
৫. বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত শীরধার্য। এইসব মূলনীতি ভিত্তিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার আর্থসামাজিক ও প্রভুত উন্নয়নে এক বৈপ্লবিক জোয়ার সাধিত করেছিলেন।

মসজিদে নববী ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কেন্দ্রীয় সচিবালয়। রাষ্ট্রীয় সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখান থেকে সম্পূর্ণ করা হতো।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাষ্ট্র ছিল শুরা-পরামর্শভিত্তিক পরিচালিত। নাগরিক অধিকার বিশেষ করে অমুসলিমদের অধিকার সুনিশ্চিত ছিল। পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমঝোতা, শৃঙ্খলা ও উদারতা ক্ষমার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তার উদার-ক্ষমা ঘোষণা বিশ্বের যেকোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আলোড়িত করে। তিনি মাঠে ময়দানে ছিলেন একজন তুখোড় সমরবিদ ও মানব ইতিহাসের সর্বপেক্ষা মানবতাবাদী রাষ্ট্রনায়ক। প্রতিহিংসামূলক হত্যা যুদ্ধে বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও শিশু হত্যা তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। সম্পদ অর্জন ও বহনের ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালার ছিল তার সর্বোত্তম আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কুরআনভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রথম পুরুষ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের শাসকদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় রসূলুল্লাহ স.এর পাদঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

কোনো বিশেষ কারণে হয়তো এই বন্ধু নামটি লেখেননি খাতায়। চেষ্টা করেও উদ্ধার না করতে পেরে বিনে নামে ছাপিয়ে দেওয়া হলো আপনার উপসম্পাকীয়।

-সম্পাদক

উলফত পরিবারের বিয়ে

-ইবনু লুৎফ

ভাইয়া! শুনলাম আপনি নাকি বিয়ে করছেন!?

-(একটা মুচকি হাসি দিয়ে) আহ্লাদ নিয়ে শুরু করলেন তাঁর প্রিয়তমা সবজান্তা হুর-পরীর মহাকাব্য, যেনো ঐতিহাসিক রূপকথার ঠাকুমা ঝুলি...! হয়তো পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষই এমন করেন, নিজের থেকে প্রিয় মানুষদের আলোচনা করতেই বেশি পছন্দ করেন...! প্রশ্নটি করলে সবাই মুচকি হাসি দেয়, কিন্তু কেনো!? এর রহস্য অ-বলাই থাকুক। হয়তো আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই!

তেমনি কিছুদিন আগে গত হল উলফত পরিবারের সম্মিলিত বিয়ে। যাকে জিজ্ঞেস করি, সেই সুচকি হাসি দিয়ে বলে; হ্যাঁ বিয়ে তো একটি খেলাম। অনেককে তো দেখিছি, বিয়েতে গিয়ে কুট কুট হাসছে। আরে কেন হাসছো? এবার আরও জোরে হাসি দিয়ে ওঠে।

(০১)
দাওয়াতটা আমরা পেয়েছিলাম অনেক আগেই। ঐ যে মুচকি হাসি, সেটা সহকারেই! তবে হ্যাঁ, শুধু একজন বা দুইজন নয়, একে একে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন! যা তাঁর উদারতা এবং আমাদের ভালোবাসার ফসল। লোকটা আসলে কেমন? একটু রসিক, একটু মিশুক, একটু ভাবুক..., না, হলো না! সব একটুর জায়গায় প্লাস + দুই দিন! তার মানে অনেক অনেক রসিক, মিশুক ও ভাবুক... তবে আরও কিছু গুণাবলী আছে... জানতে চাইবেন? কে সেজন..? বলব কী?... আচ্ছা ঠিক আছে বলেই দেই... ।উলফত নামের পুষ্পোদ্যানের প্রথম জমির মালিক । যার সাথে কথা বলে উলফত পরিবার স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছিল; তার বিয়ে। উলফত বন্ধুদের সাথে তার এত সখ্যতা জমে ওঠেছিলো যে, বিয়েটাকে কেউ তার একা ভাবতে পারছেনা । দাওয়াত কমিটির ঘটক ছিলেন আমাদের সম্পাদক মিঁয়া ।সবাইকে অলিমায় জমাতে বেটা এত দৌড়া দৌড়ি শুরু করেছেন, ভাবখানা যেন তার বিয়ে!!

(০২)
যাইহোক, আসল কথায় আসি, আমার আবার এই রোগ, কথা বলতে বলতে লাইন-চ্যুত! তো বিয়েটার আয়োজন করা হয়েছে পূণ্যভূমি দেওবন্দের পশ্চিমে "হেরা-গার্ডেন" নামক এক শ্মসানে। কেননা সেখানে প্লাস্টিকের কিছু কাল্পনিক গাছ-মূর্তি ছাড়া আর কোনো আল্লাহর সৃষ্টি প্রাকৃতিক গাছপালা আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু তারপরও সেটা গার্ডেন কেনো হলো আমার তেমন বুঝে আসলো না! যাই হোক তবুও সেটা গার্ডেন, কেননা সবাই সেটাই বলে ডাকছে! তাই কি আর করার, ডাকো "গার্ডেন"!
দাওয়াত পেয়ে কবুল করে মধ্যখানে ভুলে গিয়েছিলাম যে, দাওয়াতে যেতে হবে। পরিবেশ প্রতিকূলতা এত বেশি ছিল যে, তখন বিয়ের নাম নেওয়াটা দায় হয়ে দাড়িয়েছিল। বিয়ের বদলায় ভারত সরকার আমাদেরকে উপহার দিচ্ছিল সি এ এ। হা হা হা
কিন্তু বিয়েটা ভাগ্যে ছিল। হয়তো এত আলিম-উলামার আহাজারি আল্লাহ তাআলা বৃথা যেতে দেননি। দুয়েকদিন আগ থেকে হঠাৎ পরিবেশ অনুকূলে এসে গেল। আবার কল্পনায় ভাসতে লাগল সেই রজনী...! এবার সব মান অভিমান ভেঙে কবির সুরে সুর মিলিয়ে "উলফত পরিবার" গেয়ে ওঠলো...

মান করে থাকা আজ কি সাজে?
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে,
চলো চলো কুঞ্জ মাঝে।

আমাদের দাওয়াতটা ছিল "ওলিমা"র, মানে শাদী আগেই হয়ে গেছে, এখন তার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুয়াত হতে চলেছে...!
মাননীয় "বর" সাহেব আমাদেরকে অনেক আগে তো দাওয়াত করেছিলেন, কিন্তু এখন আবারও দাওয়াত করতে আমাদের রুমে এলেন, তবে একবার নয়, দুবার নয়, তিন-তিনবার! কারণ, ঐ যে বলেছিলাম, ভালোবাসার টান। তিনি বিয়েটা একা একা সারতে চাচ্ছেনই না। দাওয়াত নেওয়ার সময়ে সম্পাদক সাহেব তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বাংলা একাডেমি একটি 'এদারা।' এর সাথে হাজারো লোক সম্পৃক্ত থাকবে। সবাইকে যদি আপনি দাওয়াত দিতে যান। তাহলে আবস্থা কী দাড়াবে? তিনি বললেন, দেখুন, উর্দুর অঙ্গনে আমি বাংলা ঘোড়া নিয়ে ছুটছি।

আমার খেলা দেখার দর্শক নেই। কিন্তু বাঙালিরা আমাকে সায় দিয়েছে। আর তা উলফেতের মাধ্যমে। তাই আমি উলফত ছাড়া এই বিয়েতে আনন্দ পাচ্ছি না। যাইহোক, একবার দাওয়াত দিলে তো যাওয়া না-যাওয়ার কথা ভাবা যেত, কিন্তু তিন-তিনবার! না, না, এবার তো না-যাওয়ার কথা ভাবাই মহা পাপ... তাই গাট্টি-বোঁচকা বেঁধে এবার বিয়ে করতে, থুক্কু, বিয়ে খেতে যাওয়ার পালা।

(০৩)
ওলিমা'র দিন সকাল বেলা। মাননীয় সম্পাদক হুসাইন আলহুদা সাহেবের ফোন : হ্যালো, ইবনু লুৎফ্ ভাই! আজ জনাব দানিশ খান ভাইয়ের বিয়ে, মনে আছে তো? রাতে আমাদের দাওয়াত, কিছু "কিছু-মিছু" কিনতে হবে। এখন কী কেনা যায় বলেন তো? (আসলে এই যে "কিছু-মিছু" কেনা হচ্ছে, এগুলোকেই এখন আমাদের উলফত পরিবারের বিয়ের "মোহরানা" ধরা যাক!)
আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাওয়াত কতো জনের, আর কিছু যে কিনবেন, তো "বর" সাহেবের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি? কেননা, এখানে এর আগেও একটি বিয়েতে আমি গিয়েছি, কিন্তু সেখানে ঐ "কিছু-মিছু" গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। সম্পাদক সাহেব বললেন, আমাদের পুরো "উলফত পরিবার" যাবে। ফিরিস্তি অনেক লম্বা।
বিয়ের উপহারকে "কিছু-মিছু" বলার পেছনে লম্বা একটি খোশ-গল্প আছে, এখন এই বাসর রাতে অন্য কার্যে ব্যস্ত আছি, পরে কোনো একদিন শোনাবো! তো সেই "কিছু-মিছু" নেওয়া হলো। উলফতের মাননীয় ভাষা সম্পাদক মাওলানা যায়েদ হুসাইন সাহেব বাড়ির পানে পাড়ি জমানোর আগেই একটি উপহার খরিদ করে রেখে গিয়েছিলেন, সেটার সাথে আমাদের দুই আইটেমের মিলিয়ে মোট তিন আইটেম হলো...! এই পর্ব বিকেলের মধ্য শেষ করে রাতের জন্য অপেক্ষায় রইলাম। কখন রাত আসবে, কখন সেই মধুর রজনীর দেখা মিলবে, যেখানে থাকবে শুধু তুমি আর আমি...! এই না, না, যা ভাবছেন এমন কিছু না! আসলে এটাই আমাদের "পেহলী রাত" তো তাই! আরে যা, আবার উল্টোপাল্টা ভাবছেন! "প্যহলী রাত" মানে, দেওবন্দের পূণ্যভূমিতে এটাই অনেকের জীবনের প্রথম বিয়ের রাত... আরে কী বলে যে, বিয়ে খাওয়ার রাত।
০৪)
এশার নামাজ এখনও শেষ হয়নি। শুধু ফরজটুকু আদায় করে আমার প্রাণপ্রিয় শাইখ পালনপুরি হাফি.কে বাসায় পৌঁছে দিয়ে মাত্র সুন্নাত-বিতরের জন্য দাঁড়িয়েছি, মাননীয় সম্পাদক সাহেবের ফোন, ভাই প্রস্তুত হয়েছেন?
বললাম, এই তো ভাই যাচ্ছি, দশ মিনিট। উনি বললেন, আরে ভাই একটু তাড়াতাড়ি আসুন, এখানে রশীদের সামনে জটলা বেঁধে থাকলে খারাপ দেখাচ্ছে। মানে দাওয়াতি মেহমানরা সবাই সুপ্রস্তুত! আমি ফোনে রেখে শীতের খুচরা কিছু কাপড় পড়েই ভোঁ-দৌড়...!
গিয়ে দেখি সবাই অনুষ্ঠানস্থলের গেইটে পৌঁছা-পৌঁছি করছে। আমি গিয়ে বহুত মোহাব্বতের সাথে মাননীয় সম্পাদক সাহেবের হাতখানা পাকড়িয়ে ধরলাম। উনাকে দেখে খুব ব্যস্ত ও অস্থির মনে হলো, জিজ্ঞেস করে আন্দাজটা ঠিক প্রমাণিত হলো। বললেন, ভাই দুইজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে "কিছু-মিছু"গুলো নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু এখনও আসেনি, দেখেন তো কেমন লাগে!
আসলে তিনি চেয়েছিলেন, সবাই একসাথে বরের হাতে উপহারগুলো তুলে দেবেন। যাতে সবার পক্ষ থেকে হয়। কিন্তু উপহার বহনকারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব। সব তছনছ করে দিল। বললাম, আপনি সবাইকে ভেতরে নিয়ে যান, আমি বাহিরে তাদের অপেক্ষায় আছি।
একটু নয়, বেশ কিছুক্ষণ পর সাহেবদ্বয় এলেন! "কিছু-মিছু"গুলো গিফ্টের স্টাইলে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রসংগঠনের প্রধানদের আহ্বান করা হলো। সবাই মিলে "মাননীয় বর"-র হাতে "গিফট"গুলো স্টাইল করে তুলে দেওয়া হলো। আমাদের ভাবটা বেশ আকর্ষক ছিল। গায়ের গণ্যমান্যরা হা করে তাকিয়ে দেখছিল। পাশের একজন বলল: আজকের সেরা গেফট রে...!
উলফতের পক্ষ থেকে বর হয়ে যারা ছিলেন: মাননীয় সম্পাদক সাহেবের কথা তো আগেই বললাম, উনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা আইনুল হক সাহেব, মাওলানা কাজী মানজুর আলম সাহেব, মাওলানা মুফতী আব্দুল্লাহ সাহেব, মাওলানা জুবাইর আহমদ সাহেব, মাওলানা আবুল কাসিম মু.খালিদ সাহেব, মাওলানা মনিরুল হক সাহেব, হবু-মাওলানা ইফতেখারুল হক কাসিমি সাহেব, অনুপস্থিত মাওলানা যায়েদ হুসাইন সাহেব প্রমুখ... আর আমি অধম... তবে সেটা শুধু একটা রিপোর্ট তৈরি করার জন্য মাত্র! আর বাকি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনও ছিলেন, তবে "গিফট-হাতে" নয়, "গিফট-নজরে"!

সেই প্রতীক্ষিত পেহলী রাত

অত্র একালার বিয়ের পরিবেশ নিয়ে দ্বীনী মহলের বেশ আপত্তি আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া! বসার কোনও ব্যাবস্থাই রাখা হয় না। নারী পুরুষের মিলনমেলা । সভ্য যে কেউ এতে আপত্তি তুলবে। উলফতের অনেক সদস্য যার অশংকা করে দাওয়াত কবুল করতে দ্বিধা করছিলেন। এব্যাপারে আমরা দানিশ ভাইয়ের সাথে আগেই আলোচনা করে রেখেছিলাম। তিনি বলেছেন যথা সম্ভব চেষ্টা করব সুন্নাতি আভা কায়েম করার জন্য। বেচারা বাস্তবেই চেষ্টা করলেন।শাদি হলগুলো এমনিতেই পশ্চিমা ধাঁচে সাজানো। তিনি তাতেই চেয়ার টেবিল লাগিয়ে দিলেন। বেশ সুন্দর লাগছিল। কিন্তু অনেক বন্ধু বান্ধব নাকি তাকে বললেন: তুমি তো সব শেষ করে দিলে! কেন? বসে খাওয়া তাদের কাছে নাকি শাদি হলের জন্য মানায় না।

যাগগে, এসব ওদের মাথা-মুণ্ডু। আমাদের কাছে দানিশ ভাই একজন মহা বীর।তিনি পরিবেশকে জয় করতে পেরেছেন। মহিলাদেরকে ভিন্ন হলে রাখা হয়েছে। পুরুষরা মূল হলে স্বাচ্ছন্দ্যে শাদি উপভোগ করতে পারছে।

রাতের আইটেমগুলো নিয়ে একটু খোলামেলা আলোচনা করা যাক! এক্ষেত্রে পরের কথা আগেই বলে ফেলি, অনেকেই জিজ্ঞেস করবেন, সবগুলো আইটেমের মধ্যে কোনটি আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে? তাই বলছি, ভাই সব আইটেমই ভালো! অভিজাত । তবে, "কিমা"টা জোস হয়েছে, একদম জোস! যেই খাবে, একদম প্রেমে পড়ে যাবে! এছাড়াও বিরিয়ানি, তেহারি মোটামুটি ভালোই হয়েছে। যেমন হওয়ার দরকার তেমনই। তবে মহিষের গোস্ত তেমন জাত করে রান্না করতে পারেনি! বোধ হয়। এরচেয়ে যদি ঝোলটা কম করে ভুনা করে দিতো, তাহলেই বরং খুব মজা লাগতো। আসলে আমি পর্যালোচনা করতে বসিনি।আইটেম গনানা করাই মাকছাদ।এটি কিন্তু বউ চক্রের আইটেম মাত্র। এখনও শালীচক্রের আইটেম বাকি।

মাননীয় সম্পাদক সাহেব আমার উপর মাঝে মাঝেই কিছু কিছু সম্পাদনা-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই এবার ভুল-টুল সহ একটু বেশিই সুনাম অর্জন করার তৌফিক হলো। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে... তবে আমি একাই নয়! আমাদের খেত্তার মোটামুটি সবারই একই অবস্থা।

আর চাপাতি রুটির কথা কি আর বলবো, প্রথমে দেখে তো মনে হয় যেনো শীতের চাদর! কেউ বোধহয় গায়ে জড়িয়েও ধরতেও চেয়েছিল! তো প্রথমে রুটি, কিমা, গোস্ত আর তারপর তেহারি, বিরিয়ানি ও আরো কি কি যেনো...!

হবু-কাসিমি ইফতেখারুল হক সাহেব ভেবেছিলেন, আমার সাথে বাটপারি করে হয়তো গোস্তটা খেতে পারবেন! কিন্তু আমি অপেক্ষায় ছিলাম আমার অংশটা শেষ হওয়ার। এদিকে আমার অংশটা শেষ আর ঐদিকে তার পাতেরটাও গায়েব! এজন্যই জ্ঞানীরা বলেন, "যে অন্যের জন্য কূপ খোঁড়বে সে স্বয়ং ঐ কূপেই পতিত হইবে।" তবে বেচারা কোনো অন্যায় করেনি, শুধু একটা গোস্তই হয়তো নিতে চেয়েছেন।

বউয়ের পর এবার "শালি-চক্র"

"শালী-চক্র" মানে বুঝছেন না!? ঐ যে বউয়ের ছোট বোন! মানে, রসমালাই, খিরসা, ফুচকা, আলো কিট্টীসহ আরও নাম না জানা কতো প্রকারের যে "শালী-চক্র"! তো সেই শালী-চক্রে গিয়ে দেখি বউয়ের চেয়ে এটাই তো বেশি মজার!

উপমার ঘোর কাটিয়ে সরাসরি বলি। একটি অভিনব ব্যাবস্থাপনা। হলের চার পাশে ব্যান নিয়ে অনেকে বসে আছে। কারও কাছে রসমালাই। কেউ ফুচকা, কেউ আবার আলু কিট্টি। আরেকজন খিরসা নিয়ে বসে আছে। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়ত বিক্রি করছে। কারও কাছে ঝাল লাগতে পারে। তার জন্য রসমালাই কিনে খাওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছে আর কি। পরে দেখি উলফতের বন্ধুরা প্রতি ব্যানের সামনে চক্কর কেটে সামনে এগুচ্ছে। ব্যাপাটার কী? পরে শুনি সব ফ্রি!!! একবার নয়; যে যতবার পারবে, খেয়ে যাবে। এবং সবগুলো আইটেম। হা হা হা। ছুটলাম, আরে এরকম একটি মুহূর্ত? প্রথমেই ফুচকা-শালী। কারণ এটা আমার খুব প্রিয়! এর প্রেমের বিরহে মাঝে মাঝে আমাকে একদম রেললাইনের পাড়ে যেতে হয়...! আরে না, ঝাঁপ দিতে নয়, ওখানেই এটা পাওয়া যায় তো, তাই খরিদ করে খেতে যাই। যখনই একটু সময় পাই তখনই ঐ দিকে ঘুরেও আসি আবার ঐ প্রেমিকার সাথে মোলাকাতও করে আসি।

তাই এই প্রেমের কারণে আগে তাকেই খেলাম, আর একটু ভালো করেই খাইলাম! ফুচকা খাওয়া শেষ হতে না হতেই একজন এসে বললেন, ভাই আলোকিট্টী খান, ওটা এর চেয়েও ভালো! হবু-কাসিকাসিমি সাহেব আর লোভ সামলাতে না পেরে ওদিকেই হাঁটা শুরু করলেন... আমার আবার দুইটা সম্পর্কেই ভালো জানাশোনা ছিল, তাই এটাতেই পড়ে থাকলাম! একটু পর গিয়ে ওটাও অবশ্য একটু শুধু টাচ্ করলাম।

সেখান থেকে আবার ফুচকার স্টলে এসেছি মাত্র, আরও এক হবু-কাসিমী হাবিবুর রহমান সাহেব এসে বললেন, ভাই ঐ পার্শ্বে রসমালাইয়ের চক্রে যান, খুব টেস্টি। শুনেই তো দিদিমনিদের মতো মুখে জল চলে এসেছে, কিন্তু কেন, এটা তো টকজাতীয় জিনিস নয়, এটা তো "পুরা-কে-পুরা মিষ্টান্ন"! তবুও কেন জল এল...? হয়তো বেশি আবেগে... হায় আল্লাহ তুমি আমাকে এতো আবেগ দিছো কেন রে...!!!

আচ্ছা যাক, রসমালাইয়ের রেসিপির দিকে অগ্রসর হলাম, গিয়ে দেখি প্রিয় রেসিপি মোটামুটি একদম শেষের দিকে, খুব তাড়াতাড়ি চামুচ দিয়ে একবার তুলে নিয়ে আবার নিতে গিয়েছি তো দেখি এখন বর্তন চাটা ছাড়া আর উপায় নেই! এটা তো যাইহোক একটু মিললো। কিন্তু খিরসা যে একদমই রিযিক-মিস্! এখানেও ঐ যে হবু-কাসিমী সাহেব! উনি আগেভাগেই এসে মজা মেরে সব খেয়ে ফেলেছেন। অতিরিক্ত মজার ঠ্যালায় মাননীয় সম্পাদক সাহেবকেও এখানে দেখা গেলো খুব কাড়াকাড়ি করেই তৃপ্তি নিচ্ছেন। সব কিছু মনে হয় ভালোই হলো, তবে এখন পর্যন্ত একটা বাকি ছিল, তা হলো চা-কফি। সেটারও দেখা মিললো, তবে ভীষণ ভীড়। আমি মাননীয় সম্পাদক সাহেব ও হবু-কাসিমী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাইদয় কফি খাবেন? বললেন, চলেন। আমি বললাম, আমি আবার কফি বেশি পান করতে পারি না, এই মাত্র ৪/৫ কাপ হলে চলে। তবে যদি অর্জিনাল কাশ্মিরি চা হয়, তাহলে তো ৮/১০ কাপ! তারা শুনে অবাক হলেন না! কারণ দেখে দেখে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে...! তো মোটামুটি আমাদের শেষ চক্র ছিল এই "কফি-চক্র"! এর পর মাননীয় বর মশাইকে না বলেই এক প্রকার ভাগান্তকের মতো পালিয়ে আসি... , কারণ হয়তো তার কাছে এতক্ষণে উলফত পরিবারের নামে একা গাধা অভিযোগ পৌঁছে গেছে, যেভাবে পঙ্গপালের মতো এরা...।

সাময়িক বিদায়

প্রতিটি প্রভাতের একটা সন্ধ্যা আছে, এখনও পর্যন্ত কেউই এটার অস্বীকার করেনি। যদিও খোদ খোদাকেও অনেকেই অস্বীকার করছে। কিন্তু এটা এমন এক সত্য যা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও নেই। তাই আমাদের ওই "বিয়ে-প্রভাতের"-ও এই ক্ষণে "সন্ধ্যা" নামাতে হলো। এভাবেই এক এক করে সকল প্রভাতের সন্ধ্যা নেমে আসবে... আর একদিন আমাদের অতি প্রিয় জীবন-প্রভাতের সন্ধ্যা নামবে... হয়তো পরকালে তা আবারও উদিত হবে "সোনালি-প্রভাত" নিয়ে, নতুবা -আল্লাহ মাফ করেন- "অগ্নী-ঝড়"...!

পরিশেষে মহান রব্বে কারীমের কাছে দুহাত তুলে দোয়া মাঙ্গি, হে মহান রব্বে কারীম, তুমি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শবান, নিতিবান বানিয়ে দাও, তুমি এই ক্ষুদ্র জীবনের নৌকাকে নিজ অনুগ্রহে মাঞ্জিলে মাকসাদে পৌঁছে দাও, তুমি জীবনের অর্ধাঙ্গিনী দাও এমন, যে সত্যি-সত্যিই জীবনের অর্ধেক হতে পারে। সর্বোপরি সবাইকে সীরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত করে জান্নাতে একসাথে থাকার উপযোগী বানিয়ে দাও। আমীন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

স্বপ্নের গোধুলিতে বইমেলা, -ইফতিখারুল হক খাইর

বহুদিন ধরে রোজনামচার খাতায় খসখস শব্দ নেই। দিনগুলো বেশ আলসেমিতে কেটে যাচ্ছে। এভাবে আর কয়দিন? অনেক রোজনামচা কাজা পড়ে আছে। 'কাফফারা' (প্রায়শ্চিত্ত) সমেত চুকিয়ে না দিলে যে দারুণ বে-কায়দায় পড়তে হবে! জুমাবারের পাঠশালায় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। চেষ্টা করলে 'উমরী কাযা' আমার পক্ষে সম্ভব হলেও কষ্টসাধ্য। তাই কোনরকম 'উসবূয়ী কাযা' আদায় করে ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ি। আগে একটু সুখের দিনের 'কাজাগুলো' আদায় করে নেই। কারণ এর জন্য জাবাবদিহি বেশি করতে হবে। সুন্দর সুন্দর উপলক্ষ্য পেয়েও কেন এর কদর করা হল না??

রোজনামচায় গাঁথা ইতিহাস

২৭/১১/১৯ (বুধবার)
বাদ-ইশা। মুহতারাম ইবনু লুৎফের ফোন আসে-
-কোথায় আপনি?
-এইতো, কামরায়।
-অফিসে আসেন না যে?
-এই মূহুর্তে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ নেই। আর আপনারাও দাওয়াত-টাওয়াত দেন না। অফিসে গিয়ে কী করব?
-আমরা একটা বইমেলা করতে যাচ্ছি। কিছু কাজ জমে আছে। সুযোগ করে একটু কার্যালয়ে ঘুরে যাবেন।
-আচ্ছা, ঠিক আছে।

মনে প্রশ্ন বাঁধলো, বইমেলা করার জন্য এত বই পাবে কোথায়? হয়তো কয়েকজনের সংগ্রহে থাকা বইগুলো একজোটে প্রদর্শন করা হবে। এর চেয়ে বেশি আর কীইবা করা সম্ভব?!

২/১২/১৯ (সোমবার)
বাদ-ইশা। মাননীয় সম্পাদক সাহেবের ফোন-
-ব্যস্ত আছেন নাকি?
-না, তেমন কোনো কাজ নেই।
-কষ্ট না হলে এখন একটু 'মাতবাখে' আসতেন যদি! [দারে জাদীদ মাতবাখ, দারুল উলূমের অস্থায়ী একটি ছাত্রাবাস]
-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আসছি।

মাতবাখে গেলাম। সেখানে উলফত পরিবারের আরও দু'তিনজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। জানতে পারলাম, বাংলা ইসলামিক একাডেমি দেওবন্দের পরিচালক দানিশ ভাই বাংলাদেশ থেকে প্রায় দুলাখ টাকার কিতাব এনেছেন। সে বই দিয়েই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'উলফত ইসলামি বইমেলা'। সাথে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে 'উলফত বইমেলা সংখ্যা'। বইমেলা সংখ্যার একাংশে থাকবে নবজাগরণ সৃষ্টিকারী ইসলামি বইসমূহের লেখক-পরিচিতি। তাই মুফাক্কির গল্পকার আতিকুল্লাহ সাহেব সম্পর্কে লেখার জিম্মাদারি অর্পিত হয় আমার উপর।

৪/১২/১৯ (বুধবার) [রাত পোহালেই বই মেলা]
বাদ-মাগরিব। সম্পাদক সাহেবের দ্বিতীয় ফোন-
-আপনার লেখাটা পাঠিয়ে দিলে...!
-দুঃখিত, এখনো পরিপূর্ণ লিখা হয়নি। এশার সময় কম্পোজ করে পাঠিয়ে দেব।
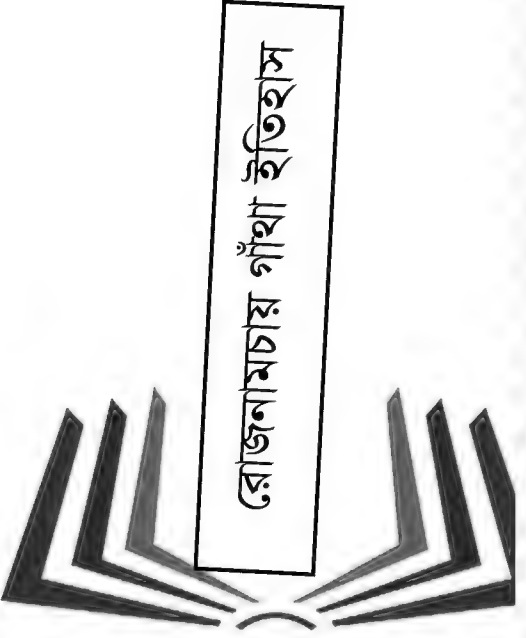
এশার পর যাওয়া হয় বাংলা একাডেমিতে পুস্তকাদি গোছাতে। ওদিকে যায়েদ ভাই ব্যানার ডিজাইন করে দানিশ ভাইয়ের হাতে পেনড্রাইভ তুলে দেন। রাত সাড়ে নয়টায় উলফতের পুরাতন সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করার তাকাদা আসে।
[ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে উলফতের ৫টি সংখ্যা, প্রতি সংখ্যার ন্যূনতম ৫কপি করে ছাপিয়ে প্রদর্শন করা হবে] সাথে নতুন সংখ্যার প্রচ্ছদ তৈরিরও। ইবনু লুৎফ ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কাগজের রিম কিনতে যাই। তিনি আবার নাছোড়বান্দা। চা না খেলে তার কাছ থেকে ছাড় পাওয়া মুশকিল। চা খাচ্ছি আর ভাবছি, কেমন প্রচ্ছদ তৈরি করা যায়! বিভিন্ন কুতুবখানার ব্যানার, পোস্টার দেখে চলছি। ঝাপসা আঁচ করতে পারলেও ভালো কোন ধারণা পাচ্ছিলাম না।
ইবনু লুৎফ ভাইয়ের এখনও অনেক কাজ বাকি। প্যান্ডেল তৈরির সরঞ্জাম সংগ্রহ করা। বইমেলার চারপাশ সাজানোর ব্যবস্থা করা। প্রচারণার সর্বশেষ পর্ব হিসেবে আবার পোস্টারিং করা। আরও কতো কি! তাই তাকে ছেড়ে দিলাম। কাজের ঝক্কি এত বেশি যে, সম্পাদক সাহেব বারবার অস্থির হয়ে ওঠছিলেন। তবে এই অভিজ্ঞতা তার প্রথম নয়। তাই লাগাম ধরে রাখার অপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমি সাধ্যমত প্রকাশনা বিভাগকে পুরোপুরি সচল রাখার চেষ্টা করছিলাম। কেন্দ্র থেকে যে কোনও নির্দেশ তড়িৎ পালন করে যাব বলে নিজেকে প্রস্তুত রাখার চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে আমরা বাংলা একাডেমির পর্যাপ্ত সহযোগিতা পায়নি।

ব্যানারটির চম্বুকীয় আকর্ষণে অনেক অবাঙালীকেও ঢুকতে দেখা গেছে বইমেলায়। পর্দা পাড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই লেখক-পাঠক ও বইপ্রেয়সীদের উপচে পড়া ভীড়! ত্রিপাশে 'পেট' সমতল টেবিল বসানো। টেবিলের উপর বিভিন্ন বিষয়ের হরেক রকমের পুস্তকসম্ভার। নাক বরাবর সামনে ছোট্ট একটা আলমারি। প্রতিটি তাকে বিশেষ কিছু গ্রন্থ প্রদর্শন করা হচ্ছে। গ্রন্থাদির মনোরম প্রচ্ছদ চোখ ধাঁধিয়ে তুলছে। আরেকটু উপরে পুরো দেয়াল জুড়ে বইমেলার বিশাল ব্যানার। ব্যানারের উপর ছাদঘেঁষা লাগানো হয়েছে বাংলায় প্রকাশিত বিখ্যাত ইসলামি পত্রিকাগুলোর প্রচ্ছদ, যা কয়েকগুণে বইমেলার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত সামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও আজ বুধবার রাত বারোটা ছুঁই ছুঁই, এখনও তাদের বই-মূল্য লাগানোই শেষ হয়নি। এই মুহূর্তে যায়েদ ভাই শারীরিক অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও একাডেমি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নেমে পড়েন। সম্পাদক সাহেব কখনো অফিসে, কখনো একাডেমিতে, কখনো বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন।
আবার বইমেলা সংখ্যার পুরো সম্পাদনা, ডিজাইন, সেটিং, লেখা সংগ্রহও করা লাগছে। নির্বাহ বিভাগের ইবনু লুৎফ ভাই ও তার সাথ দিয়েছেন ভাষা সম্পাদক যায়েদ ভাই; তারা বাইরের ব্যবস্থাপনাগুলো কঠিন চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করেই যেন সামাল দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানে এসে অঙ্গসজ্জা ও আল্পনা বিভাগের অবদান উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। এই বিভাগের জিম্মদার ছিলেন তরিকুল ইসলাম ভাই। আল্পকার হলো প্রিয় সহপাঠি আবুল বাশার মু. সালাহুদ্দিন সালেহ। পুরো সপ্তাহজুড়েই তাদের দৌঁড়-ঝাপ ছিল অতুলনীয়। সম্পাদক সাহেব থেকে এবার একটি নতুন অভিজ্ঞতা পেলাম যে, কেবল বইমেলা কেন্দ্র করেই তিনি এক সপ্তাহ আগেই কতগুলো উপ-কমিটি গঠন করে রাখলেন। এবার তার ব্যস্ততা হল কমিটির সাথে যোগাযোগ করে যাওয়া, আর দিকনির্দেশনা দিয়ে যাওয়া। অবশ্য আমাদের সম্পাদক ভিন্ন ধাঁচের, তিনি নিজেকে প্রতিটি কমিটির সদস্য মনে করেন। যেখানে প্রয়োজন, ছুটে যান।
কাগজ কিনে এক দৌঁড়ে কার্যালয়ে পৌঁছি। প্রিন্টারকে কাজে লাগিয়ে দেই। আমিও স্ট্যাপলার নিয়ে কাজে নেমে পড়ি। ওদিকে গড়গড় করছে আর এদিকে চটচট। অর্ধহাজারের অধিক পৃষ্ঠা প্রিন্ট করতে করতে প্রায় রাত সাড়ে বারোটা!
অন্যেদেরও ভীষণ ব্যস্ততা। কেউ কারোর খবর নেয়ার মতো সময় নেই। তারপরও উলফত পরিবার 'উলফত'কে ধরে রেখেছে। শত ব্যস্ততা এড়িয়ে সময় বের করে নিচ্ছে। আলহুদা ও ইবনু লুৎফ ভাই বারোটার দিকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করেন-
-আর কতক্ষণ লাগবে?
-এইতো আর পনের মিনিট।
-ঠিক আছে, আমরা আপনার জন্য হোটেলে অপেক্ষা করছি।
পঁচিশ মিনিট পর আমি তাশরিফ আনি। ঘড়ির কাঁটা প্রায় একঘটিকায়...। এতক্ষণ তারা অপেক্ষারত ছিলেন। কেবল একটু উৎসাহ জোগাতে! দোকানি তাদেরকে চা দিয়ে দিয়েছিল। তাই তারা ফারেগ হয়ে গিয়েছিলেন। আবার নতুন করে টেবিলে বসা হলো। শেষমেশ ইবনু লুৎফ ভাই পত্রিকাগুলো নিয়ে যান গাম লাগাতে। আমি ফিরি হিসেবের খাতা নিয়ে। আর সম্পাদক সাহেব প্রুফ দেখার জন্য সদ্য ছাপানো একটা বইমেলা সংখ্যা নিয়ে ভোঁদৌড় সম্পাদনা মঞ্চে।

৫/১২/১৯ (বৃহস্পতিবার)
ফজর পড়েই প্রচ্ছদ ডিজাইন শুরু। এক ঘণ্টাব্যাপী আঁকিবুঁকির পর ক্লাসের ঘণ্টা বাজে। ক্লাসে ছুটে যাই। পথিমধ্যে মনে হতে লাগল, ফজরের পরের পুরো সময়টা বেকার গেছে। প্রচ্ছদটা বইমেলার জন্য একদমই মানানসই হয়নি। যাকগে, নতুন কিছু ভাবতে হবে। নাহ, এখন পড়ায় মনোযোগ দেওয়া দরকার। এসব 'ভাবাভাবি' পরে হবে। তৃতীয় ঘণ্টায় শ্রেণীকক্ষের মুখপত্র, এখানের পরিভাষায় তুরজুমান 'ইন্তেহায়ী আফসোস কে সাথ' শিরোনাম টেনে ঘণ্টা খালি ঘোষণা করেন। এবার এক্সক্লুসিভ ছেড়ে নরমাল মোডে প্রচ্ছদ তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতি শেষে সম্পাদকের মতামতের অপেক্ষা...। সম্পাদনা মঞ্চ থেকে শুধু 'নীচ' শব্দটির বানান ঠিক করতে বলা হয়। বাকি সব নাকি ঠিক আছে! ঠিক থাকলেই ভালো।
দুপুর সোয়া বারোটায় ক্লাস ছুটি হয়। ছুটি হতেই দেখি, একাডেমী চত্তরে ইবনু লুৎফ ও যায়েদ ভাই প্যান্ডেল সজ্জায় ব্যস্ত। বাকি আছে বাংলায় প্রকাশিত বিখ্যাত ইসলামি পত্রিকাগুলোর প্রচ্ছদ প্রদর্শনীর প্রস্তুতি। ছুটে যাই কালার প্রিন্টের দোকানে।
-পৃষ্ঠাপ্রতি কত রাখবেন?
-দশ রুপি।
-দশ-বারো পৃষ্ঠা প্রিন্ট করলে?
-যান, আট রুপি করে।
-দাঁড়ান, অন্য দোকানে দেখে আসি। ...অন্যথায় আপনার কাছ থেকে করে নেব।
আরেক দোকানি বিশ টাকার কমে দিতে একদমই রাজি না। অবশ্য, এক পরিচিত দোকানি পাঁচ টাকায়ও প্রিন্ট করে দেয়। তবে, এই ভরদুপুরে তার দোকান বন্ধ। নিরুপায় হয়ে আবার প্রথম দোকানে...। আমাকে পূণরায় আসতে দেখে ব্যাটা সুযোগটা হাতছাড়া করেনি। পৃষ্ঠাপ্রতি পুরো দশ কড়ি হাতিয়ে নিয়েছে। যাকগে, সময় সবার আসে! যোহরের সময় নামাজ বাদ ফের চলে যাই দরসগাহে। পঞ্চম ঘণ্টা করার পর আবিষ্কার করলাম, ব্লাকবোর্ড থেকে ষষ্ঠ ঘণ্টায় ইবারত পাঠকারীর নাম উধাও! মানে, ঘণ্টা ফাঁকা। একদম 'চিটয়াল ময়য়দান'।
ওদিকে বইমেলার সাজসজ্জা প্রায় সম্পন্ন। অপেক্ষা শুধু বইমেলা সংখ্যার। ঘড়ির কাটায় তখন সাড়ে তিনটা। চারটা থেকে মেলা আরম্ভ। সম্পাদক সাহেব পত্রিকার কাজে দিনরাত হাটুভাঙা খাটুনি খেটে যাচ্ছেন। কাজ প্রায় সম্পন্ন করে পেনড্রাইভ যোগে উলফত বইমেলা সাংখ্যার একটা ভারি ফাইল দিয়ে যান। আমার জিম্মাদারি যদিও ডিজাইন এডিট করে কেবল প্রকাশনায় হাত দেওয়া, কিন্তু দেখি ওয়াটস্যাপ যোগে পাওয়া লেখাগুলোর ফ্রন্ট ভাঙ্গা। ফাইলটা হয়ে গেল বেশ ভারি। ভারি ফাইলে কাজ করাই দায়। প্রতি দুয়েক ক্লিকে ল্যাপটপের গতি মন্থর হয়ে যাচ্ছে। কখনো দুই মিনিটের বিরতি নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অবস্থা সঙ্গীন দেখে সম্পাদক সাহেব আমার সাথে আব্দুল্লাহ ভাইকেও রেখে গেলেন। কাজের মন্থরতা দেখে তিনি ক্লান্ত হয়ে সেই নাকডাকা ঘুম দেন। অথচ আধঘণ্টা পরই বইমেলা আরম্ভ হবে। আসর পড়ে আবার কাজ করতে করতে গোধুলির সন্ধ্যা এসে উপস্থিত। এখনো অর্ধেক কাজ বাকি। মেলা তো শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। হুসাইন ভাই ফোনে জানালেন-
-ভাই, একাডেমি চত্বর লোকে লোকারণ্য। একটু এসে দেখে যান না!
-এখনো তো অর্ধেক কাজ বাকি। আসি কীভাবে?
-রাখেন তো। কাজ পরে করা যাবে। দুয়েক মিনিটের জন্য এসে দেখে যান।
মনে মনে দারুণ কৌতূহল। একাডেমি চত্বরে পা রাখতেই কৌতূহলের তুলনায় কয়েকগুণ অধিক সজ্জিত ও লোকারণ্য দৃশ্যে বিস্মিত হলাম।

বইমেলার খণ্ডচিত্র:

রাস্তা থেকে চত্বরের মোড় বাঁকতেই নজরে পড়ল লম্বা পর্দা। দুধারে প্রবেশের জন্য সামান্য ফাঁকা আছে। পর্দার মাঝ বরাবর কিছুটা উপর করে স্বাগত-ব্যানার সাঁটানো। সালাহুউদ্দীন সালেহ ভাই কর্তৃক আর্টকৃত অর্থবহ স্বাগত-ব্যানারটি সত্যিই আগত বইপ্রেমীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ব্যানারটির চম্বুকীয় আকর্ষণে অনেক অবাঙালীকেও ঢুকতে দেখা গেছে বইমেলায়। পর্দা পাড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই লেখক-পাঠক ও বইপ্রেয়সীদের উপচে পড়া ভীড়! ত্রিপাশে 'পেট' সমতল টেবিল বসানো। টেবিলের উপর বিভিন্ন বিষয়ের হরেক রকমের পুস্তকসম্ভার। নাক বরাবর সামনে ছোট্ট একটা আলমারি। প্রতিটি তাকে বিশেষ কিছু গ্রন্থ প্রদর্শন করা হচ্ছে। গ্রন্থাদির মনোরম প্রচ্ছদ চোখ ধাঁধিয়ে তুলছে। আরেকটু উপরে পুরো দেয়ালজুড়ে বইমেলার বিশাল ব্যানার। ব্যানারের উপর ছাদঘেঁষা লাগানো হয়েছে বাংলায় প্রকাশিত বিখ্যাত ইসলামি পত্রিকাগুলোর প্রচ্ছদ, যা কয়েকগুণে বইমেলার সৌন্দর্যে বৃদ্ধি করেছে। আর চারিধারে বিভিন্ন মনিষীর উক্তি ও ত্রিভুজাকৃতির চিরকুটগুলো তো দর্শককে পৌঁছে দেয় বাংলার এক নতুন ভুবনে। ক্রেতারা বই পছন্দ করে দাম পরিশোধের জন্য ঢুকে পড়ছে একাডেমির ভেতরে। পরিচালক দানিশ ভাই ছোট্ট একটা ডেস্ক নিয়ে দরজার পাশেই উপবিষ্ট। দাম পরিশোধ করে ক্রেতাদের যেন বেরোতে মন চায় না। ভেতরেও চতুর্দিকে নিচ থেকে একেবারে ছাদ ছোঁয়া রঙ বেরঙের মনোহারি পুস্তকাদি।
দেখতে দেখতে মাগরিবের আজান হয়ে গেল। সব রেখে ছুটি যাই মসজিদ পানে। নামাজ শেষে আবার বইমেলা সংখ্যার কাজ শুরু। প্রায় একঘণ্টার মধ্যে আল্লাহর রহমতে কম্পিউটারের কাজ শেষ। এবার নতুন কাজ। ফর্মা তৈরি। সাধারণত ফর্মা ষোল পৃষ্ঠার হলেও উলফত অসাধারণ বলে তৈরি হলো পুরো বেয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় এক ফর্মা। ফর্মার কাজে জাবির ভাই সহযোগিতা করলেন।
এতক্ষণে ইশার আজান হয়ে গেছে। এখনও প্রিন্ট করা বাকি। জাবির ভাইকে নিয়ে উলফত কার্যালয়ে পৌঁছি। একদিকে প্রিন্ট চলছে। অপরদিকে কাগজ ভাজ করে পিন লাগানো হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা নয়টা ছুঁই ছুঁই।
মাত্র পাঁচ কপি ছাপা হয়েছে। তাই নিয়েই চলে আসি বইমেলা সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন ও চা-আড্ডায়। নির্ধারিত সময়ে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো।দানিশ ভাই, মনজুর ভাই, হুসাইন ভাই, মুস্তাফা ভাই ও মুফিজ ভাই প্রমুখের উপস্থিতে আব্দুল্লাহ ভাইয়ের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সফল হয় জমজমাট মোড়ক উন্মোচন ও চা-আড্ডা পর্ব। মাঝে মাঝে বইপ্রেমীদের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করছেন আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইউছুফ সাহেব। বৃহ.বার রাত এগারোটায় বইমেলা স্থগিত হওয়ার কথা থাকলেও রাত বারোটায়ও বইমেলা থেকে বইপোকাদের সাদরে সরানো সম্ভব হয়নি। তারপর আর কাজ কি! নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

৬/১২/১৯ (শুক্রবার)
শুক্রবার ফজর পড়ে আবার টানা ঘুম দেই। একঘুমে সূর্য মাথা বরাবর হয়ে বেলা দশটা! তড়িঘড়ি করে গোসল করেই সোজা কার্যালয়ে। গতকাল তিনশত রুপির ক্রেতাদের কাউকেই বইমেলা সংখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বইমেলার শেষদিনেও যদি তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া না যায়, তাহলে.....।

কয়েক পৃষ্ঠা প্রিন্ট হতেই কালির সমস্যা দেখা দিল। ইলেক্ট্রিকের যুগে এই যা ঝামেলা, মেশিনের সমস্যায় মানুষকেও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। স্বর্ণযুগের 'কেতাবত'ই ভালো ছিল। একটু দেরি হলেও স্বস্তি সহকারে কাজ করা যেত। বর্তমানের 'পিতলযুগে' দ্রুত কাজ হলেও স্বস্তির দেখা মেলাই বড় দায়! উল্লেখ্য যে, 'আহকরের' পরিভাষায় যে যুগের সিকি-পয়সা স্বর্ণের, তাকে স্বর্ণযুগ এবং যে যুগের সিকি-পয়সা পিতলের, তাকে পিতলযুগ বলা হয়। উপরোক্ত কায়দার ভিত্তিতে 'মুস্তাম্বাত' হয় [ফল দাঁড়ায়] যে, সম্প্রতি কয়েক দেশে 'রৌপ্যযুগ' ও অন্য কয়েক দেশে 'স্টিলযুগ' অতিবাহিত হচ্ছে।

ওদিকে দুজন সন্দেহভাজন গোয়েন্দাকে উপেক্ষা করে উলফত "মিডিয়া কর্ণার" বিভাগ **দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গে** প্রকাশিত প্রথম দিনের বইপ্রেয়সীদের ছবিসহ বইমেলার সংবাদ ঝুলিয়ে দেয় একাডেমির দেয়ালে। [বললাম সন্দেহভাজন দুজন গোয়েন্দা মশাইয়ের কথা, একই ড্রেসে এলেন। যাকে পাচ্ছেন জিজ্ঞেস করছেন, তোমার বাড়ি? বইমেলার সাথে তোমার সম্পর্ক? এই হাবিজাবি, হা হা হা]

মুজাদ্দেদি ছেড়ে আসল কথায় ফিরি। জুম'আ পর্যন্ত অনুমান করে মিস্ত্রিগিরি করেও ঠিক করতে না পেরে বাদ-জুম'আ পেশাদার মিস্ত্রির কাছে প্রিন্টার নিয়ে হাজির হই। ঠিক করে ফিরতে ফিরতে আসরের আজান হয়ে গেছে। কার্যালয়ে পৌঁছেই প্রিন্টারকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যাই। গড়গড়ের মাঝে মাঝে জাবির ভাই স্ট্যাপলার নিয়ে চটচট করছেন। ওদিকে শেষদিনের বইমেলা নতুন আঙ্গিকে আরম্ভ হয়ে গেছে। বারবার ক্রেতাদের পক্ষ থেকে পাক্ষিক উলফতের বইমেলা সংখ্যার তাকাদা আসছে। উলফত কর্মকর্তারাও বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছেন। এরই মাঝে সম্পাদক সাহেব একবার কার্যালয়ে আসেন; একটু খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। আসার পথে ডালমুট নিয়ে এলেন। দুচারটে করে মুখে দিচ্ছি। পেটে ক্ষুধা থাকলেও অনুভব হচ্ছে না। সেই যে সকাল দশটায় বেরিয়েছি, বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলেও দুপুরের খাবারটা আর....। নাস্তার সময়টুকুও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবুও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, তিনি অযোগ্য থেকে কাজ নিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

মাগরিবের পরপরই চল্লিশ কপি ছেপে গেছে। পঞ্চাশ কপির অর্ডার থাকলেও 'আবহাওয়া অধিদপ্তর' জানিয়েছে, এগুলো দিয়েই দিব্যি কাজ সেরে যাবে। চল্লিশ কপি নিয়ে বইমেলায় চলে আসি। অমনিতে পাঠকেরা পত্রিকার উপর হামলে পড়ে। এই শেষ বেলায়ও আশা অপেক্ষায় তুলনামূলক অধিক দর্শকের আনাগোনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ওদিকে দুজন সন্দেহভাজন গোয়েন্দাকে উপেক্ষা করে উলফত "মিডিয়া কর্ণার" বিভাগ **দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গে** প্রকাশিত প্রথম দিনের বইপ্রেয়সীদের ছবিসহ বইমেলার সংবাদ ঝুলিয়ে দেয় একাডেমির দেয়ালে। [বললাম সন্দেহভাজন দুজন গোয়েন্দা মশাইয়ের কথা, একই ড্রেসে এলেন। যাকে পাচ্ছেন জিজ্ঞেস করছেন, তোমার বাড়ি? বইমেলার সাথে তোমার সম্পর্ক? এই হাবিজাবি, হা হা হা] তারপর আবার কিছু সময় অতিবাহিত হয় দৈনিক অনলাইন ও অফলাইন পত্রিকায় সংবাদ পৌঁছানোর তাগিদে খবর প্রস্তুতকরণে। আসামের দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গের প্রতিনিধি জনাব মাও. রশিদ আহমদ সাহেব বারবার তাগাদা দিচ্ছিলেন ডুকুন্টারি পাঠানোর জন্য।

দেখতে দেখতে শেষ মুহূর্ত এসে উপস্থিত। যবনিকার পালা। সেরা ক্রেতাকে "আনোয়ার পুরস্কার" নামে সমমননা পদক প্রদানের মাধ্যমে যবনিকা টানা হয় 'উলফত ইসলামি বইমেলা ২০১৯'-এর। বাইরে থাকা পুস্তকাদি গুছিয়ে দানিশ ভাইকে বিদায় দিয়ে আমরা 'বাড়ির' পথ ধরি।

সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় অনুষ্ঠিত এই বইমেলা দুদিনের মাথায় শেষ হয়ে হারিয়ে যায়নি। এর প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আজও বইমেলার প্রেরণাতেই লিখে যাচ্ছি। হোক না আমার লেখা সস্তা ও মন্দা, তাতে কী! আশা করি, প্রতিজন সাহিত্যসেবী বইমেলাকে স্মৃতির ফ্রেমে বেঁধে রাখবে। আরবি, ফারসি ও উর্দুর পর এবার বাংলাতেও ইসলামের জাগরণ ঘটাতে বইমেলা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। তাই যেন হয়!

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

...দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আজ কাফির-মুশরিক ইহুদি-নাসারা সবাই একই মিশনে নেমেছে; যেমনটা আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ। কিন্তু মর্মান্তিক বিষয় এই যে, আমরা সবাই মুসলিম। একই ধর্ম আর এক নবীরই অনুসারী এবং এক কাবার অভিমুখী, তবুও আমরা একতাবদ্ধ হতে পারি না। ফলে পৃথিবীতে আজ পানির মতো আমাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এক অপদস্থ জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা। মুসলিম জাতির এই বিভক্তির কারণেই কাফের-মুশরিকরা আজ মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। প্রিয় পাঠক, এই অনৈক্য আর বিভক্তি আমরা কেন জিইয়ে রাখব, যদি আমরা মুমিন হই?

...সেখানে গিয়ে দেখলাম, সবুজের সমারোহ! অনেক শাক-সবজি; আলু, গাজর, টমেটো আরো কতো কী! চারদিক সবুজ আর সবুজ। এ যেন এক সবুজের জগৎ! আমার কৌতূহল জাগল যে, এই যে সবুজের চাকচিক্য সমারোহ, এর জন্য চাষীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত কষ্ট করে থাকে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। আজ যদি চাষীরা চাষ বন্ধ করে দেয়, তাহলে ধনী লোকরাও খেতে পাবে না। ক্ষুধায় প্রাণ হারাবে। চাষীদের কষ্টের কথা ভেবে আমার অন্তরে তাদের জন্য ভালোবাসা জেগে ওঠল।

...দারুল উলূম চৌক থেকে মসজিদে রশীদ হয়ে ঈদগাহ গানে চলে যাওয়া রোডটা এখন জনাকীর্ণ। স্বাভাবিক চলার কোনো সুযোগ নেই, ছোটো-বড়ো পর্দানশীন মা-বোন আর সাধারণ মানুষ, সাথে তালাবাদের উপচেপড়া ভীড়ে সাধারণ গাড়ি-ঘোড়া চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যতই সামনে যাচ্ছি, আজাদির আওয়াজ ততই ভারী থেকে ভারী হচ্ছে। আমাদের অনুভূতিও এখন অন্যরকম। অজান্তেই যেন তাল মিলাচ্ছি 'আজাদি, আজাদি'। যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন তাদের কর্মসূচি সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে।

- প্রকৃতির রোজনামচা
- রোজনামচায় বিপ্লবগাথা
- স্মৃতিভাস্বর রোজনামচা
- রোজনামচায় নিন্দা-প্রতিবাদ

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

আবু হুরায়রার তিনটি ভ্রমণ: সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে

প্রকৃতির রোজনামচা
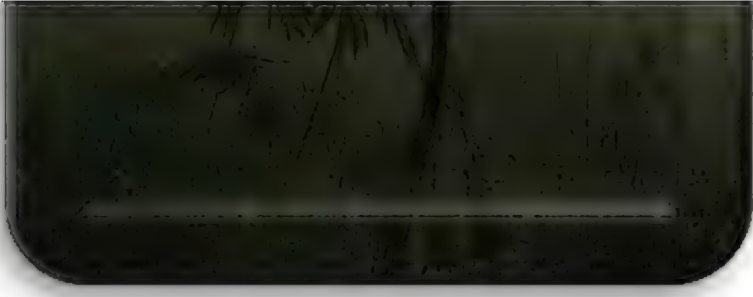
জুমাবারের পবিত্র প্রভাত

পবিত্র জুবাবার; শুক্রবার। সকাল ৬.২০ মি. জাগ্রত হলাম। শোয়া থেকে উঠে বসলাম আর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দোয়া পড়ে নিলাম। সুস্থ সবল দেহে ঘুম থেকে উঠতে পেরে বিশ্বপ্রতিপালকের শুকরিয়া আদায় করলাম। তারপর ফজর নামাজের জন্য অজু করলাম। হৃদয় প্রশান্ত হয়ে গেল। হাদীসে পাকের পবিত্র ঘোষণাটি একটু অনুভব করার চেষ্টা করলাম; এ যেন অজুর অঙ্গগুলোকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলাম। বাকি আল্লাহ যা চান তাই হবে। নামাজ পড়লাম এবং সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করলাম। হাদীসে পাকের ভাষ্য অনুযায়ী আমি দশ খতম কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়ার আশা রাখলাম। জুমাবার হিসেবে সূরা কাহাফও তিলাওয়াত করলাম। মানে নিজেকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত করার আয়োজন করলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গেলাম কাসিমি কবরস্থানে। দুনিয়ার সাময়িক অবস্থান শেষে কবরে এসেই স্থায়ী নিবাস গড়তে হবে। তাই আগ থেকে একটু জায়গাটার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। হয়তো এ করণেই নবীজি স. কবর জিআরত করতে বলেছেন যে, এতে তোমাদের আখিরাতের কথা স্মরণ হবে। সাথে কাসিমি কারণ এখানে যারা শুয়ে আছেন, তাঁরা সবাই আমাদের রুহানি অভিভাবক। তাঁদের মেহনত আর ইখলাসে আজ দারুল উলূম দেওবন্দ। যেখানে ইলম আর প্রজ্ঞা নিতে আমি সুদূর বাংলা থেকে ছুটে এসেছি। এসেছে আমার মতো হাজারো শিক্ষার্থী। সেখানে গিয়ে দেখলাম কিছু লোক একাগ্রচিত্তে মহান মনীষীদের কবর জিআরত করছে। দৃশ্যটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, "তারা এমন জীবন করেছে গঠন, হাসিতেছে তারা কাঁদিতেছে ভুবন"। আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম যে, "এমন জীবন করিব গঠন, একদিন হাসিব আমি, কাঁদিবে ভুবন।"

সাথে নিজে নিজেই লজ্জিত হলাম এই ভেবে যে, আমি এত বুঝবান হয়েও এখনও কীভাবে অবহেলায় করছি 'দিন গুজরান?'

ফেরার পথে পাখিদের কিচিরমিচির কলরব শুনলাম। আমি ভাবতে লাগলাম যে, পাখিগুলো কি শুধুই কিচিরমিচির করছে? নাকি অন্য কিছু, যা আমি বুঝি না?

বরেণ্যরা বলেন যে, পাখিরা আল্লাহর জিকির করে। আজ তাই অনুভব করলাম যে, এত মধুর তানে তারা কি শুধু কিচিরমিচিরই করছে!

-না, এটি প্রতিপালকের শানে জিকিরিই হবে।

বিকেল ভ্রমণ

এক পড়ন্ত বিকেলে দুই বন্ধু মিলে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। সূর্য তখন ভালোই উজ্জ্বল ছিল। রাস্তার পাশে ধান-ক্ষেত। ধানের গোছে পাক ধরেছে। তাই ধানগাছগুলো কিছু সবুজ আর কিছুতে হলদে আভা । ক্ষেতের মাঝ দিয়ে সারিবদ্ধ খেজুর গাছ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো আমগাছ । দৃশ্যটি আমাদের বাংলা থেকে একটু ভিন্ন। কারণ এখানে জনবসতি আর ক্ষেত-খামার আলাদা আলাদা প্রান্তে হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলায় সবুজ-শ্যামলও ফসলি জমির মাঝে দূর থেকে দেখা যায় আমাদের ছোটো ছোটো গ্রামগুলো। পাশ দিয়ে বয়ে যায় ছোটো নদী। নদীতে মাঝি ডিঙ্গি বায়...। তবে সবমিলিয়ে এখানের পরিবেশটি সুন্দর লাগছিল। একটু দূর হেঁটে গিয়ে একটি খেলার মাঠ পেলাম। গুটিকয়েক ছেলে সেখানে ক্রিকেট খেলছিল। আমাদের দেখে সেখানে বসে থাকা একটি ছোট্টো ছেলে (দর্শক হিসেবে থাকা বাচ্চা) দৌঁড়ে এল এবং সালাম দিয়ে আমাদের সাথে বসে গেল। সালামের উত্তর দিয়ে তাকে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করলাম। বুঝলাম ছেলেটা ভিন্নভাষী। সে তেলুগু ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা বলতে পারে না। যেহেতু আমার সাথে থাকা বন্ধু তেলুগু ভাষাতে বেশ বলতে পারে, তাই চিন্তা তার করলাম তার সাথে একটু দুষ্টুমি করা যাক। কারণ ভিনভাষার প্রতি সবার একটু টান থাকেই। বন্ধু সম্বোধনে শুরু করলাম দুষ্টুমি। আমার বন্ধু ছিল দোভাষী। বললাম, বলো তো বন্ধু, পূর্ব দিক কোনটি? সে ইশারা করে বলল, এইটি। উত্তর সঠিক জেনেও আমি বললাম, না ওটি। তখন সে রাগতস্বরে বলল, বইয়ে আছে, "সকালে সোনার রবি পূর্ব দিকে ওঠে।" আর প্রতিদিন সূর্য এই দিকেই ওঠে। সুতরাং আপনি মিথ্যা বলছেন। ছোট্টো ছেলেটির বুদ্ধিমত্তায় আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম।

গ্রীষ্মের এক দুপুরে...

একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এক জায়গায় দেখতে পাই একটি আমলকি গাছ, পাশে ছিল আরেকটি কুমির গাছ। দুই গাছে থেকে দুটি ফল কুড়িয়ে নিলাম। প্রথমে কুমির ফলটি খেয়ে দেখলাম। কারণ দেখতে বেশ বড়ো, কিন্তু কোনো মজা পেলাম না। সঙ্গে সঙ্গে পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর আমলকি খেলাম। খাওয়ার সময় এত ভালো লাগল না বটে, কিন্তু খাওয়ার পর যখন পানি পান করতে গেলাম, তখন মনে হলো পানিতে চিনি গুলে রাখা হয়েছে। তখন অনুভব করতে লাগলাম যে , বড়ো হলে যে ভালো এবং মিষ্টি হবে; ধারণাটি সঠিক নয়। তদ্রূপ আমল বেশি হলেই যে জান্নাতে যাবে তাও নিশ্চিত নয়। কিন্তু অল্প আমলেও সহজে জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; যদি আমলটি গুণ-সম্পন্ন হয়। যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে "আহসানু আমালা" বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা, পশ্চিমবঙ্গ
দাওরা হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

নবীন লিখিয়েদের তিনটি আদর্শ রোজনামচা

প্রকৃতির রোজনামচা

প্রকৃতি-মাঝে বিকেল ভ্রমণ

আজ আমি বিকেলে মাঠে গিয়েছিলাম। (দারুল উলূম দেওবন্দ-এর ক্যাম্পাস;) দারুল কুরআনের পাশ কেটে জি.টি. রোড পাড়ি দিলে অদূরেই মাঠটি অবস্থিত। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সবুজের সমারোহ! অনেক শাক-সবজি; আলু, গাজর, টমেটো আরো কতো কী! চারদিক সবুজ আর সবুজ। এ যেন এক সবুজের জগৎ! আমার কৌতূহল জাগল যে, এই যে সবুজের চাকচিক্য সমারোহ, এর জন্য চাষীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত কষ্ট করে থাকে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। আজ যদি চাষীরা চাষ বন্ধ করে দেয়, তাহলে ধনী লোকেরাও খেতে পাবে না। ক্ষুধায় প্রাণ হারাবে।

চাষীদের কষ্টের কথা ভেবে আমার অন্তরে ভালোবাসা জেগে ওঠল। আরেকটু সামনে গিয়ে দেখলাম, সারি সারি আমগাছ, জামগাছ, কাঁঠালগাছ আরো নাম না জানা কত গাছ! আল্লাহ তাআলা মাটি থেকে গাছ এবং তা থেকে ফল-ফলাদি সৃষ্টি করে, আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেন। কোথাও মাটি খুব উর্বর হয়, আবার কোথাও মাটি হয় লোনাযুক্ত। মাটি উর্বর হলে সেখানে উৎপাদন খুব ভালো হয়, আর অনুর্বর হলে গাছপালা তেমন একটা গজায় না। যেমন, আরবের মরুভূমি। সেখানে গাছপালা চোখে পড়ে না; কারণ, সেখানকার মাটি; বালু ও পাথরযুক্ত। দূর আরবের কথা ভাবতে ভাবতে মাগরিবের আজান হয়ে গেল। ফুরফুরে শরীর নিয়ে আমি হাঁটতে হাঁটতে দারুল উলূমের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলাম।

-মু. সাহারুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ
আরবি সপ্তম বর্ষ, দারুল উলূম দেওবন্দ

আমার আজকের "দিনের" রোজনামচা

আমার নাম মু. জাকির আহমদ আল হানাফী। আমি খ্যাতনামা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় "দারুল উলুম দেওবন্দ"-এর দাওরায়ে হাদীসে অধ্যয়ন করছি। এই সময়ে আমি বড্ড ভাবুকে হয়ে ওঠেছি; কেবল স্বপ্নই দেখছি। স্বপ্ন তো অনেক, কিন্তু সময় অনেক কম। প্রতিদিন কত ভাবনা নিয়ে প্রভাত করি। কিন্তু এর মাঝে কতগুলো ভাবনা কেবল ভাবনার জগতেই আবদ্ধ থেকে যায়, বাস্তবায়ন করতে পারি না। যাই হোক, আজ কিন্তু একটু অদম্য স্পৃহা নিয়ে প্রভাত করলাম যে, দিন শেষ হওয়ার আগেই দিনের রুটিন-এর যাবতীয় কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করব এবং এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করে যাব, ইনশাআল্লাহ। আমার সারাদিনের রুটিনটা প্রায় এমন যে, প্রতিদিন ভোর ৫ টায় ঘুম থেকে জাগ্রত হব। এর পর ফজর নামাজ আদায় করব। তারপর নাস্তা করে ক্লাসে যাব। ছুটি হবে দুপুর ১২টায়। এর পরে খাওয়া-দাওয়া করে কিছুক্ষণ আরাম করব। ২.১৫ মিনিটে অবশ্যই ঘুম থেকে উঠে যাব এবং বৈকালের ক্লাসে যাব। আসর নামাজের আজান হলে ছুটি হবে। বাদ আসর বন্ধু-বান্ধবের সাথে কিছুক্ষণের জন্য বৈকাল-ভ্রমণে যাব। সেখানে রব্বুল আলামীনের সৃষ্টির নৈপুন্য মনভরে অবলোকন করব। তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করব। মাগরিবের আজান হলে নামাজ পড়ে পুনরায় পড়তে চলে যাব।

মুহাম্মাদ জাকির আহমদ আল হানাফী, আসাম
শিক্ষার্থী: দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

রোজনামচায় একটি ক্যাম্পাস-দৃশ্য

গত শুক্রবার, "উলফত সাহিত্যাসর, দারুল উলূম দেওবন্দ"-এর পাঠশালায় গিয়েছিলাম। পাঠশালার গুরুজন [হুসাইন আলহুদা] বলেছিলেন, রোজনামচা লেখার প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে আশ-পাশে ঘটে যাওয়া ছোটো ছোটো দৃশ্যগুলো কাগজের বুকে তোলে ধরার চেষ্টা করা। আমাদরে ক্যাম্পাসের এমনি একটি সাধারণ দৃশ্য তোলে ধরছি:

রোজ বৃহস্পতিবার, বিকালের ঘণ্টা শেষ হলো। হোস্টেলের তৃতীয় তলায় চলে এলাম। হঠাৎ শুনতে পাই আমাদের মাদ্রাসায় এস.ডি.এম. সাহেব আসবেন। তাই নির্দেশ এসেছে যে, সবাই যেন মাদ্রাসার মসজিদে চলে যাই। এইদিকে আসরের নামাজের জামাতের সময়ও ঘনিয়ে এল। তাই অজু করে মসজিদে চলে গেলাম। জামাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। তারপরও নামাজ শুরু হচ্ছে না। এমন সময় দেখি, মুহতামিম সাহেব এস.ডি. এম. সাহেব এবং তার সহকর্মীরা মসজিদে প্রবেশ করছেন। মুহতামিম সাহেব ছাত্রদের সামনে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এস.ডি.এম. সাহেব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে (সংসদে পাশ হওয়া "সিএএ"–ইস্যু করে দানা বাঁধা) বিক্ষোভ-মিছিলে যোগ না দেওয়ার অনুরোধ করলেন। এবং জি. টি. রোড অবরোধ না করার জন্যও কিছু সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। তারপর মুহতামিম সাহেব দা. বা. ও এ বিষয়ে কিছু কথা বললেন। অতঃপর তারা চলে গেলেন। আর আমরা আসরের নামাজ আদায় করে নিলাম।

মুহাম্মাদ সাইফুল আলম
সপ্তম বর্ষ, জামিয়াতুশ শাইখ হুসাইন আহমদ আল-মাদানী
দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, ভারত

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

প্রকৃতির রোজনামচা

এক গোলাপের আত্মকথা

ফজর পড়ে চোখ খোলা রাখা এই বান্দার পক্ষে এভারেস্ট বিজয়। সালাম ফেরাতেই ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে। কখনো তো নামজের মধ্যেই ঘুমে কাত! আজ ফজরের কিছুক্ষণ পর ঘুম তাড়াতে মসজিদে রশীদের পূর্বদিকে হাঁটছিলাম। পুবাকাশে তখন সূর্য ওঠছিল। সূর্যের একফালি কিরণ পড়ল বাগানের এক গোলাপ-পরিবারের উপর। কিরণ অনুসরণ করে বাগানের দিকে চোখ ফেলতেই বড়ো গোলাপটা আমায় কোমল অভ্যর্থনা জানাল। আমিও অভিনন্দন গ্রহণ করে গিয়ে ওঠলাম গোলাপের বাড়িতে। সাক্ষাৎপর্বে ছোট্টো একখানা চুমু খেলাম। দীর্ঘদিন পর এমন আদর পেয়ে গোলাপের নয়নে কয়েক ফোঁটা (শিশির) অশ্রু সূর্যের কিরণে চিক করে ওঠল। যেন গোলাপটি নিঃশব্দে কাঁদছে। কারণ সুধালে কিচ্ছু বলে না। মুখ ফিরিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর নাকের পানি 'গিলে' নিয়ে শুধু বলল, আমায় একটু শুঁকে দেখো!

গোলাপের ঘ্রাণটা আগের মতো অসাধারণ লাগলেও, সাথে কেমন যেন একটা দুঃখের আভাও অনুভূত হচ্ছিল। ঘ্রাণ শুঁকতেই দেখি, সে ঘ্রাণের তালে আমাকে কিছু বলছে। আমি একনাগাড়ে শুনে যাচ্ছি, সেও নিঃশব্দে বলে যাচ্ছে:

"বাগানের মালি ওয়াকিল মিঁয়া আমাকে রোপন করেছে এই তো তিন মাস আগে। আমাকে আনা হয়েছে রেললাইনের পাশের একটি বাগান থেকে। জানো, মাকে ছেড়ে আসতে আমার একটুও মন চায়নি। তবুও মানবের কাছে আমরা অনুগত হতে বাধ্য। এখানে আসার পরও আমাকে একটা নীরব জায়গায় রোপন করা হয়েছে। আশেপাশে অন্য কোনো ফুলের বাড়ি নেই। এই সুনসান বাড়িতে আমি নীরবে বসে কাঁদতাম। আগমনকারীদের সুবাস বিলাতাম; কিন্তু তোমার মতো আর কেউ আমাকে শুঁকে দেখেনি। সেকালে রোদের কিরণটাই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী। কোনো দিন সূর্য উদিত না হলে পুরো দিন একদম মনমরা হয়ে থাকতাম। এখন মনে হয় সূর্যি মামার কক্ষপথ পাল্টে অন্য জায়গায় চাকরি হয়েছে। তাই আজকাল সকালের দিকে বাড়িতে একটু কিরণ ছড়ালেও পুরো দিন আর দেখা মেলাও ভার হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য আমি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি। এখন তো আমার বয়স হয়েছে। একে একে আমার চারটে সন্তান হয়েছে। পাশে মখমখলরা বাসা বেঁধেছে। সবাইকে নিয়ে দিনকাল ভালোই কেটে যাচ্ছে। তবুও মাঝে মাঝে কেমন জানি আশঙ্কা হয়। মনে হয়, সময় ঘনিয়ে এসেছে! হায়াত-মউতের বিশ্বাস নেই। মরার আগে অন্তত তাদের বিয়ে করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। সন্তানদের জীবনে একটা গতি করে দিয়ে যেতে পারলেই আমার জীবনে আর কোনো দুঃখ থাকবে না। সব দুঃখ মাটি হয়ে যাবে।

তোমাকে একটা সুসংবাদ শোনাই, আজ দুপুরে পাশের বাড়ির মখমলের মেজো ছেলের সাথে আমার বড়ো মেয়ে 'লাগোপে'র বিয়ে। তুমি অবশ্যই আসবে। এই শেষ কথা!

-কিন্তু..!

-কোনও কিন্তু-টিন্তু নেই।

-আমি যে রোজা রেখেছি। তুমি আগে বললে হয়তো...

-আরে পাগল, গোলাপদের বিয়েতে খাবার আয়োজন হয় না। ভিন্নরকম আয়োজন হয়।

-তাহলে তো দেখা দরকার! ঠিক আছে, আমি নিশ্চয়ই আসব।

ইফতিখারুল হক খাইর
২০/০১/২০২০ ইং

এখানে আসার পরও আমাকে একটা নীরব জায়গায় রোপন করা হয়েছে। আশেপাশে অন্য কোনো ফুলের বাড়ি নেই। এই সুনসান বাড়িতে আমি নীরবে বসে কাঁদতাম। আগমনকারীদের সুবাস বিলাতাম; কিন্তু তোমার মতো আর কেউ আমাকে শুঁকে দেখেনি। সেকালে রোদের কিরণটাই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী। কোনো দিন সূর্য উদিত না হলে পুরো দিন একদম মনমরা হয়ে থাকতাম। এখন মনে হয় সূর্যি মামার কক্ষপথ পাল্টে অন্য জায়গায় চাকরি হয়েছে। তাই আজকাল সকালের দিকে বাড়িতে একটু কিরণ ছড়ালেও পুরো দিন আর দেখা মেলাও ভার হয়ে দাঁড়ায়।

ফিরতি মেইল:

গোলাপটি হয়তো এতদিনে বেঁচে নেই। তার জীবনই বা কয়দিনের! কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সে অমর হয়ে থাকবে। তার দুঃখগাথা ভাবুকদের জন্য উত্তম খোরাক জোগাবে। আর ইফতিখার সাহেবকে কি বলব, এই বয়সে এত উঁচুতে কীভাবে চড়লেন! গোলাপ পরিবারকে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন যে, উলফতে তাদের আত্মকথা ছেপেছে! আচ্ছা, সূরুজমুখীদের কোনো দুঃখ-বেদনা আছে না কি, একটু জানাবেন তো?

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

আজকের প্রাতঃভ্রমণ

ফজর নামাজের পূর্বে মনে মনে একটা পরিকল্পনা এঁকেছিলাম যে, আজ অবশ্যই প্রাকৃতিক [ন্যাচারাল] কোনো গাঁয়ে গিয়ে ঘুরে আসব ।

আল্লাহর রহমতে ফজর নামাজ মনমুগ্ধকর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আদায় করলাম। সূরা রহমানের তিলাওয়াত ছিল । নাসরুল্লাহ তার জাদু মাখা তিলাওয়াতে মুসল্লিদের একটুও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করতে দেয়নি। সে জানে, কীভাবে তিলাওয়াত করলে মুসল্লিরা জমে থাকে। সূরের মূর্ছনা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, কোনো কিছুর কমতি ছিল না।

আফসোস, এখনও কুরআন কারীমটা হৃদয় উজাড় কররে, মধুর সুরে, বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারি না।

আল্লাহ তুমি তো মালিক। তুমি সবকিছু দিতে পারো। আমাকেও তোমার পবিত্র কালামের বাণী তোমার শান অনুযায়ী তিলাওয়াত করার তাওফীক দাও।

নামাজ শেষে প্রতিদিনের ন্যায় দোয়ায়ে মাসুরাগুলো পাঠ করলাম।
করোনা ভাইরাসের এমন পরিস্থিতিতে অবশ্যই এ দোয়াটি পড়তে হয়।
সকলের পড়া উচিত:

اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام.

অতঃপর সূরা ইয়াসিনের আমল হলো । আলহামদুলিল্লাহ !!
এর পর বেরিয়ে পড়লাম আমরা তিন মুফতী সাহেব । আমি সিরাজি, মুফতী উবাইদুল্লাহ বিন মুজীব। মুফতী ফরহাদ বিন আযাদ সালমান।

আমি অবশ্য তেমন মুফতী নই, তবে এক বছরের ইফতা বিভাগের ছাত্র হিসেবে আছি, কম কিসের! বর্তমানে মুফতী হওয়ার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না মনে হয় (?)

সকালের হিমেল হাওয়া ও সূর্যিমামার মিষ্টি কিরণ উপভোগ করতে করতে সামনের দিকে পথ চলা... । গল্পে গল্পে ছুটে চলছে তিন বন্ধু, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে, শরীর চর্চার মনোনিবেশে...।

গ্রামের আঁকাবাঁকা সরু পথ। সকালে বের হলে দেখা যায় পঞ্চাশোর্ধ অনেকেই রাস্তায় পায়চারি করছে; সুস্থ থাকার জন্য ।

গল্পের ছলে কখন যে চলে এলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে; খোলামেলা আকাশের নিচে প্রকৃতির সৌন্দর্যমাখা এক টুকরো জমিন! বাহ্, এত সুন্দর দৃশ্য! যে কারও মন কেড়ে নেবে!

প্রতিটি সৌন্দর্যের মাঝে লুকিয়ে আছে মহান আল্লাহ তাআলার অসংখ্য-অগণিত কুদরতি নিদর্শন ।
থাকে স্রষ্টাকে চেনার নানান উপকরণ।
আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন তো তাই বলে দিয়েছেন, স্বীয় পবিত্র কালামে:
নিশ্চয়ই বিশ্বভুবনে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা।

মু. আশরাফ সিরাজি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম

মুহতারাম সিরাজি ভাই,
উলফতে আপনার মৌলিক প্রবন্ধ কামনা করছি। শুনেছি, আপনি অনেক ভালো লেখেন, আমরাও তো আপনার পাঠক হতে চাই। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে কিছু বড়ো প্রবন্ধ সংক্ষেপ করুন, শব্দচয়নে সাহস বাড়বে। লেখার উপর আত্মস্থতা আসবে।

প্রকৃতির রোজনামচা

ফিরে দেখা
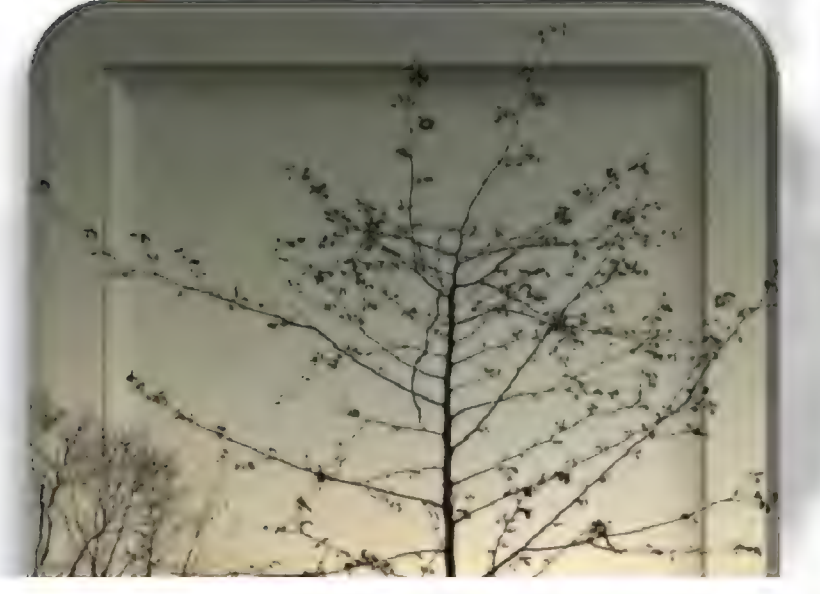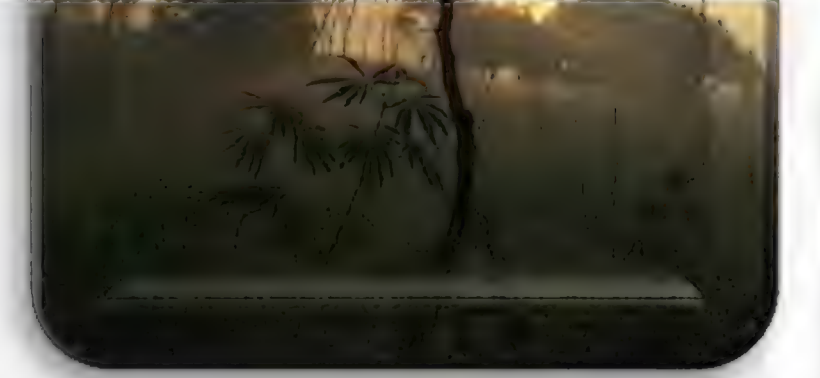
প্রিয় আবু হুরায়রা
তোমার ভ্রমণগুলোর চেয়ে তোমার লেখাই বেশ মজার হয়েছে।কারণ তোমার চেয়ে বড়ো আরও অনেক ভবঘুরে রয়েছেন, অনেক রোমাঞ্চকর ভ্রমণও তারা করে থাকেন, কিন্তু তাদের ভ্রমণগুলো কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে হারিয়ে যায়। কিন্তু রোজনামচার বদৌলতে তোমার এই অ-ভ্রমণও বেঁচে থাকবে, কাল-কালান্তর। ধন্যবাদ, ভাবনায় আমাদেরও অংশ দেওয়ার জন্য। বাকি, লেখায় যে পরিবর্তন হয়েছে, তা তো তোমার জানাই আছে। হয়তো এজন্যই তুমি উলফতে লিখে থাকো যে, উলফত তোমার লেখায় অলংকার পরিয়ে দিক। হ্যাঁ, তুমিও যে উলফতের একটি অলংকার! তোমার লেখা দিয়ে উলফত সাজে!

প্রিয় সাহারুল
প্রকৃতি মাঝে বিকেল ভ্রমণ; বেশ অসাধরণ লিখেছ। এটি তোমার উলফতের প্রথম লেখা। প্রথম সাক্ষাতেই তুমি উলফতের চমৎকার বাহবা কুড়ে নিচ্ছ, নিয়মিত লিখে যাও, পুরো জাতি তোমাকে বাহবা দিতে দেওয়ানা হবে। তাছাড়া তুমি যে প্রকৃতি নিয়ে ভাবছ, জানো, প্রকৃতির স্রষ্টাও তোমাকে নিয়ে ভাবছে!

জাকির আল হানাফী সাহেব
আপনার রুটিন বাস্তবায়ন না হলেও অসুবিধে নেই, কারণ রোজনামচা তো লিখা হয়ে গেল! এতটুকু সফলতা কম কিসের! ছুটির দিনগুলোতে ভালো কিছু বাংলা গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনার লেখাও হয়ে ওঠবে, হানাফিদের মতো পাক্কা লেখা। লেখায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে, একটু মিলিয়ে নিন, বেশ ফায়মন্দ কিন্তু।

সুহৃদ সাইফুল ইসলাম
এক সেমিনারে আপনার বক্তব্য শুনে আপনার ভক্ত হয়ে পড়ি। লেখার হাত কাঁচা হলেও জানি আপনার প্রতিভা বেশ পাকা। বেশি বেশি লিখে যান। আপনার কাছে বড়ো কিছু কামনা করি। আগেই বলা হয়েছে যে, ভালো লেখক হতে হলে বড়ো পাঠক হতে হয়। আশা করি এই দিকটায় আপনার ভালো নজর আছে।

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

স্মৃতিভাস্বর রোজনামচা

আমার স্বপ্নের "হেরার জ্যোতি"

ত্রিপুরার তিন বরেণ্য মহোদয়ের স্মৃতিগদ্য: ১

মো. জুবাইর আহমদ কাসিমি

দারুল উলুম-এ গত বছর দাওরা হাদীস সম্পন্ন করলাম। তাকমীলে ইফতায় দাখিলাও হলো। সব সুখের খবর হলেও একটি চাপা বেদনাও আছে। তা হলো দারুল উলূমে আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। ২৩ শাওয়াল, ১৪৪১ হি, প্রায় দুপুর বারোটা। প্রিয় হানিফ ভাই ও মনির ভাইদের রুমে কিতাব মুতাআলা করছিলাম। মোবাইল বেজে ওঠল। হাতে নিয়ে দেখি সহপাঠী শাহিদুর রহমান ভাইয়ের নম্বর। রিসিভ করলে শুনতে পাই রুহেল আহমদ ভাইয়ের কণ্ঠ; "ভাই, আমার দাখিলা হয়েছে।" তড়িঘড়ি করে দাওরা হাদীসের নবনির্বাচিত ছাত্রদের নাম দেখতে গেলাম। দেখি ত্রিপুরা রাজ্যের ৮ জনের নাম এসেছে। অর্থাৎ পুরাতন ও নতুন মিলে দাওরা হাদীসে এবার ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩ জন ছাত্র রয়েছেন। যা ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথম। আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম।

কিছুদিন পর নবীন-প্রবীণ সবাইকে নিয়ে গঠিত হলো আমাদের ত্রিপুরার প্রধান আঞ্জুমান "আঞ্জুমানে মাহমুদিয়া" ও তার শাখা "আঞ্জুমানে মাআরিফে হক"-এর নতুন কমিটি। মাহমুদিয়ার সভাপতির দায়িত্বে পুনরায় নির্বাচিত হন প্রিয় মফিজুল হক ভাই ও মাআরিফে হকের দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রিয় বদরুল ভাইয়ের উপর। মনে হল আমার দুই হাতে লাড্ডু। ত্রিপুরা সাথিদের নিয়ে সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন দেখলাম। পরিকল্পনাও নিলাম অনেক। এর একটি ছিল ত্রিপুরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি স্বারক প্রকাশ করা। কারণ আসাম রাজ্য-ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় "আল-ইমদাদ" ও পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় "আল কাসিম।" এগুলোর মাধ্যমে তারা জাতির গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। ত্রিপুরা শিক্ষার্থীরা এখনও এথেকে বঞ্চিত। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। ত্রিপুরার বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পরামর্শ চাইলাম। তাদের লেখা, ও আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার আশ্বাস পেলাম।

মাঝে-মধ্যে মফিজুল ভাই সহ ত্রিপুরার সকল ছাত্রদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করতে থাকলাম। এক রাতে মাআরিফে হকের সভাপতি ও সম্পাদককে ফোন করে কামরায় আসার অনুরোধ করলাম। তারা এলে তাদের সাথেও আলোচনা করলাম। ম্যাগাজিন ছাপানোর প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনা তোলে ধরলাম। মাঝে-মধ্যে সাহিত্যপ্রেমী আবুল হাসান ভাইয়ের সঙ্গেও আলোচনা করতাম। ম্যাগাজিন ছাপানোর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ নিতে উলফত সম্পাদক মাওলানা হুসাইন আলহুদা ভাইয়ের সঙ্গে কখনো তাঁর কামরায়, কখনো উলফতের অফিসে, কখনো ফোন যুগে, কখনো সরাসরি ক্লাসের আশপাশে আলোচনা করতে থাকলাম। একদিন মফিজুল ভাই, বদরুল ভাই, সাহিব ভাই ও রুহেল ভাইদের সঙ্গে আলোচনা করে ত্রিপুরার ছাত্রদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করলাম। তারিখ ছিল ০৫/১২/২০১৭ ইং। এশার নামাজান্তে। সভাস্থল মসজিদে রশিদের ভেতরে।

সভায় স্মারক প্রকাশ করা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। আমি এর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও পরিকল্পনা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, সবার ঐক্যমতে স্মারক প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলো। সাথে সাহিত্য পরিষদও গঠন হলো। দায়িত্ব অর্পিত হলো মফিজুল, রাসেল, সাহিব খান ও রুহেল ভাইদের উপর। স্মারকের নাম 'হেরার জ্যোতি' নির্ধারণ হলো। আলহামদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ করুণায় অনেক অভিজ্ঞতার পর উলফত সম্পাদকসহ অনেকের একান্ত সহযোগিতায় "হেরার জ্যোতি" এখন প্রেসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

শিক্ষার্থী: তাকমীলে ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ। অভিভাবক, ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র সংগঠন, দারুল উলূম দেওবন্দ

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

স্মৃতিভাস্বর রোজনামচা

ত্রিপুরার তিন বরেণ্য মহোদয়ের স্মৃতিগদ্য: ২

জ্ঞান অন্বেষণে মাতৃভূমি থেকে দারুল উলুম দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দ: আমার স্বপ্ন পূরণ হলো

রুহেল আহমদ
দাওরা হাদিস, ধর্মনগর, ত্রিপুরা

আমার মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষিকা ছিলেন আমার মা। মুসলিম জনবহুল না হওয়ার দরুন আমাদের গ্রামে ওই সময় কোনো মক্তব ছিল না। মায়ের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর যখন শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিলাম, তখন মা-বাবার যৌথ উদ্যোগে মাদ্রাসা শিক্ষা লাভের জন্য প্রথম যাত্রা শুরু হয় আমাদের জেলার কুর্তি এলাকার একটি ছোটো মাদ্রাসায়। ডায়েরির তথ্যানুযায়ী দিনটি ছিল ০৮/০১/২০০৭ ইং সোমবার।
মাদ্রাসার উস্তাদের কাছে প্রায়ই দারুল উলুম দেওবন্দের নাম শুনতাম। তখন থেকেই দারুল উলুম-এর প্রতি সৃষ্টি হয় গভীর ভালোবাসা। কৌতূহল জাগে সেখানে যাওয়ার ও পড়াশোনা করার।
এই ব্যকুলতায় আমি অস্থির থাকতাম। প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে থাকতাম। এক সময়ে তা হারিয়ে যেতে থাকে। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ক্রমাগত আসামের করিমগঞ্জ জেলার কাঠালতলী এলাকার একটি মাদ্রাসায় ০৬/০৯/১১-তারিখে ভর্তি হলাম। সেখান থেকে ১৩/০১/২০১৪-এ ভর্তি হলাম ওসি মিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায়। এখানে আমার সম্পর্ক হয় কৈলাশহরের বদরুল ইসলাম খাদিম, আফজাল হাসান খান, সমিমুল ইসলাম এবং সোনামুড়ার মফিজুল ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে। তাদের গল্পগুজবেও প্রায়ই শুনতাম দারুল উলুমের প্রশংসা ও কৃর্তির কথা। আরও শুনলাম যে, আগামী বছর তারা নাকি দেওবন্দ যাবে পড়াশোনার জন্য। তখন ছিল ২০১৫ইং। একথা শুনার সাথে আমার পুরানো সেই স্বপ্ন আবার জাগ্রত হলো। তাদের বললাম আমিও তোমাদের সাথে যাব। আমার আগ্রহ দেখে তারা আমাকে আরও উৎসাহিত করে বলল, আরে এই তো খুশির ব্যাপার। আমরা সবাই একসাথে দেওবন্দ যাব। দেওবন্দে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি আমার মা-বাবাকে জানালে তারা সহজেই সম্মতি জানালেন। এবং জানিয়ে দিলেন যে, শিক্ষা অর্জনের জন্য পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় যেতে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি নেই মা-বাবার পক্ষ থেকে। সবধরণের সাড়া পেয়ে সফরের প্ল্যান বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।
ডায়েরির তথ্য অনুযায়ী ০২/০৬/২০১৬ ইং, রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল চারটায়, আমরা স্বপ্নের দারুল-উলুম-দেওবন্দ-এর উদ্দেশ্যে আসিমগঞ্জ এলাকার প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন মাওলানা আব্দুস শহীদ সাহেবের দুই পুত্রের সাথে যাত্রা শুরু করি। একদিন ০৫/০৬/২০১৬ইং রবিবার বিকাল ৩.৪৫ মিন আজহারুল হিন্দ, আমাদের প্রিয় দারুল উলুম দেওবন্দ এসে উপস্থিত হই। প্রথম দেখায় যে অনুভূতি হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ভাগ্যের পরিহাস তিন-তিনবার দাখিলা পরীক্ষা দিলাম, প্রতিবার মওকুফ আলাই-পর্বে নাম এলেও চূড়ান্ত বাছাই পর্বে নাম না আসায় আমাকে প্রথমে দারুল উলূম জাকারিয়া, তারপর জামিয়াতুশ শাইখ হুসাইন আহমদ মাদানীতে পড়তে হয়। চতুর্থবার শেষবারের মতো আবারও দাখিলা দিই। যেহেতু এই বছর আমার শেষ বছর, ব্যাথা বেশি অনুভূত হচ্ছিল। হায়, যার জন্য হাজার মাইল পাড়ি দিলাম, তাকে কাছে পেয়েও নাগালের বাইরে...। চিন্তায় এত বিভোর ছিলাম যে খাওয়া-দাওয়ার দিকে কোনো মনোযোগ ছিল না । তাই শরীর আস্তে আস্তে কমজোর হতে লাগল। এই দেখে আমার সাথীরা আমাকে সান্ত্বনা দিত। তারা বলত এবার ইনশাআল্লাহ তোমার দাখিলা হবে। তাদের কথা শুনে কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম। এভাবে দিন কাটতে থাকল এবং ফলাফল প্রকাশের সময়ও ঘনিয়ে এল।
শুক্রবার। মোবাইলে খবর পেলাম যে, আজ ফলাফল বের হবে। হৃদয়স্পন্দন আরও বেড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে দেখি যে, বোর্ডে আমার নাম দেখা যাচ্ছে। এত খুশি হলাম যে, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। মায়ের কাছে ফোন দিলাম, কাঁদতে কাঁদতে খুশির সংবাদটি দিলাম। মা সংবাদ শুনে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করলেন এবং আমাকে বললেন আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বীনের স্বপ্ন আজ পূরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করো। আমরাও অনেক খুশি হয়েছি...

তাই শরীর আস্তে আস্তে কমজোর হতে লাগল। এই দেখে আমার সাথীরা আমাকে সান্ত্বনা দিত। তারা বলত এবার ইনশাআল্লাহ তোমার দাখিলা হবে। তাদের কথা শুনে কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম। এভাবে দিন কাটতে থাকল এবং ফলাফল প্রকাশের সময়ও ঘনিয়ে এল।

শিক্ষার্থী, দাওরা হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ,
নাজিম, উনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সংগঠন, দারুল উলূম দেওবন্দ

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

স্মৃতিভাস্বর রোজনামচা

ত্রিপুরার তিন বরেণ্য মহোদয়ের স্মৃতিগদ্য: ৩

আমার কলজে টুকরো "আঞ্জুমানে মাআরিফে হক"

মু. বদরুল ইসলাম খাদিম
কৈলাশহর, ত্রিপুরা

"মাআরিফে হক।" নামটি শুনলে স্মৃতির জানালায় দৃষ্টি চলে যায় আজ থেকে তিন বছর আগের দিনগুলোতে। আমি জামিয়াতুশ শাইখ হুসাইন আহমদ মাদানিতে আরবি পঞ্চম বর্ষে পড়তাম। ২০১৭ সালের কথা। একদিন আমার শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই মাহবুব মহিউজ্জামান ও আলী হোসেন ভাই ফোন করে বললেন, শুনেছো, ত্রিপুরার ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার ছাত্ররা নতুন একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে?

বাক্যটি যদিও ছোটো ছিল। কিন্তু আমার কাছে হীরার মানিক উপহার পাওয়ার চেয়েও বড়ো মনে হয়েছিল। তাই আমিই আগ বাড়িয়ে বললাম, ভাইয়া, আমি উদ্যোগটিকে কীভাবে স্বাগত জানাতে পারি? বললেন, তুমি রাতে এশার পর চলে এসো, এই বিষয়ে আলোচনা হবে। ফোন কেটে দিলেন। আমার হৃদয়ে খুশির বান বইতে লাগল। মনে হচ্ছিল, এশার পূর্বের এই ৩-৪ ঘণ্টা কাটানো সম্ভব হবে না।

যাই হোক, ঠিক সময়ে চলে এলাম মসজিদে রশিদের বারান্দায়। শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাইদেরকে বসা পেলাম। আমিও পাশে বসে পড়লাম। পরামর্শ শুরু হয়, ভাই মহিউজ্জামান-এর সঞ্চালনায়। তার মুখে আঞ্জুমানের নাম শুনা গেলো "মাআরিফে হক।" সবাই এক বাক্যে বললেন, এই নামটিই চমৎকার। আজ হৃদয় গভীর থেকে ভালোবাসা নিবেদন করছি সেসব বড় ভাইদের প্রতি যাদের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের ফসল আমাদের প্রাণপ্রিয় "মাআরিফে হক।"

মাআরিফে হক আমার স্বপ্ন:

মনে পড়ে সেই ছোটোবেলার ভাবনারাশির কথা। নিরবে বসে আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতাম যে, আমিও কি পারবো অনলবর্ষী বক্তাদের মতো জাদুকরি বাগ্মীতার অধিকারী হতে? পারব কি তাদের মতো মাতৃভাষায় তাওহীদের বাণী মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে।

হয়তো আমার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত; যদি মাআরিফে হকের পৃষ্ঠপোষকতা না পেতাম।আল্লাহ তাআলা আঞ্জুমানে মাআরিফে হক-এর মাধ্যমে মাতৃভাষাচর্চার বিশেষ সুযোগ দান করলেন। তাইতো মাআরিফে হকের জন্য জীবনকে বিসর্জন দিতেও খুব একটা কঠিন মনে হচ্ছে না। কারণ মাআরিফে হক আমার আমার কলজে টুকরো, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

সদর, আঞ্জুমানে মাআরিফে হক,
উনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সংগঠন, দারুল উলূম দেওবন্দ

২০১৯ স্মৃতির পাতার এক অবিস্মৃত অধ্যায়

প্রতিটি বছর যেভাবে কিছু স্মৃতি দ্বারা ইতিহাসের কয়েকটি পাতা কালো করে রেখে যায় ২০১৯ সালটিও ও এর ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু এ বছরটি ভারতবাসীর জন্য এক দুঃখঘেরা এবং বেদনাভরা বছর ছিল। জনতার সুখ-শান্তি আর নিরাপত্তার হার বিবেচনা করলে হয়তো শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। ভারতবর্ষের বিশেষত মুসলমানদের হৃদয়ে প্রবল রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। যার বিস্মৃতি অসম্ভব মনে হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হলো বাবরি মসজিদের অন্যায় ফায়সালা। সুস্পষ্ট প্রমাণ পত্র থাকা সত্ত্বেও ৫০০ বছরের পুরনো এই পবিত্র মসজিদকে সুপ্রিম কোর্ট রাম-মন্দিরের নামে হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়েছে। অথচ তারাই মেনে নিয়েছে যে, বাবরি মসজিদ কোনো মন্দির ভেঙে নির্মিত হয়নি এবং এই-ও প্রমাণিত হয়নি যে ওটা রাম-মাশাইয়ের জন্মভূমি ছিল। হয়তো এর বদলা নেওয়ার কোনো শুভদিন মুসলমানদের আসতেও পারে।

২০১৯ ঈ.এর মে মাসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বিজেপি সরকার আসার পর সর্বপ্রথম মুসলামানদের নিশানা বানিয়ে তিন তালাক বিল ছাপিয়ে দেয়। মুসলিম মহিলাদের অধিকার দেওয়ার ভান করে তারা মুসলমানদের শরীআতে হস্তক্ষেপ করার পাঁয়তারা করতে দ্বিধা করেনি। এই অভিশপ্ত বিজেপি সরকারের নতুন করে মসনদে আসার পর থেকেই অমানবিক জঘন্যতম mob launching -এর দুর্গন্ধময় বাতাস এক বছরে শুধু ঝাড়খন্ডে ২২-এর অধিক প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, অন্যান্য রাজ্যও তেমনি ঘটেছে। এই ১৯-সালেই সংবিধানের আর্টিক্যাল ৩৭০- বিলুপ্ত করে ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে তিন টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে ২০১৯ ঈ.-এর বিদায়ী উপহার ছিল "সি এ এ" "এন আর সি" এবং "এন পি আর"-এর নামে অগ্নি প্রজ্বলক কতগুলো বিল। যেগুলো হাজার বছরের হিন্দিস্তানী অধিবাসীদের ঘর ছাড়া করার কালো বার্তা নিয়ে এসেছে। মোটকথা ২০১৯-এর দিকে তাকালে শুধু বেদনাদায়ক স্মৃতিই নজরে আসে। তবে একটি কথা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে যে, ২০১৯-এর এতগুলো দুঃখের মাঝে দেওবন্দের বঙ্গভাষী ছাত্রদের জন্য একটি সুখের বার্তাও নিয়ে এসেছে। তা ছিল উলফত সাহিত্যাসর- নামের একটি স্বপ্ন ফোটা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। যা বঙ্গ সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে বেঁচে থাকবে চির উজ্জ্বল ও চিরভাস্বর এক অধ্যায় হিসেবে।

-আমিনুল ইসলাম
করিমগঞ্জ, আসাম
আরবি ষষ্ঠ বর্ষ, দারুল উলূম দেওবন্দ

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

স্মৃতিভাস্বর রোজনামচা

আনন্দ-বেদনায় দোদুল্যমান ২০১৯

২০১৯ সালের সমাপ্তি ঘটল। এ বছরটি আমার জন্য যেমন ছিল আনন্দের। তেমনি দুঃখের সাগরেও পাড়ি দিতে হলো অনেক। আমি ইলমের মারকাজ দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ব; সেই ছোট্টোবেলা থেকে লালিত স্বপ্নটি এই বছর বাস্তবাতার মুখ দেখল। তাই বছরটা আমার কাছে খুবই স্মরণীয় এবং মধুরও বটে। খুবই আনন্দের সাথে কাটছিল দারুল উলূমের সোনালি দিনগুলো। পাঠ-পঠনের স্বাচ্ছন্দ্যেই দিন গুজরান করছিলাম। হঠাৎ একদিন শোক সংবাদ ভেসে এলো; দারুল উলূম-এর একটি নক্ষত্র খসে পড়ল! অর্থাৎ মুহতারাম উস্তাদ আল্লামা জামাল সাহেব আমাদের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে আল্লাহর প্রিয় হয়ে গিয়েছেন। আহ্, কী মজার উস্তাদ ছিলেন। কত বুজুর্গ মনীষী ছিলেন। কয়েক মাস ব্যবধানে আবার সংবাদ এল দারুল উলুম-এর আরও একটি শিক্ষক, যিনি প্রাথমিক শ্রেণিগুলোতে পড়ান আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেলেন। আমাদের কাছ থেকে একে একে সকলেই বিদায় নিচ্ছেন। এ বছরটায় কেন এমন হচ্ছে! মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে সবাইকেই একদিন এই ধারা ছাড়তে হবে। অধ্যয়নে মন দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেশের সরকার শান্তি-সুখের দেশটাকে ধীরে ধীরে অশান্ত করে তুলেছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে বিশেষ টার্গেট বানিয়ে একে একে নিত্যনতুন হেতু তোলে মুসলমানদের কাছ থেকে বাবরি মসজিদ ছিনিয়ে নিয়ে মন্দির বানানোর দুঃসাহস করছে। সংসদে পাস করল এনআরসি, সিএএ, এনপিআর-সহ নামে-বেনামে অশান্তি ছড়ানো কতগুলো কালো আইন। সেগুলো যের ধরে আজ পুরো দেশে আগুন জ্বলছে। যারা এর প্রতিবাদ করার জন্য মিছিল করেছে তাদের উপর নাহকভাবে লাঠি চার্চ করছে। তাই বছরটি আমার জন্য বেশ দুঃখেরও ছিল।

আব্দুল কাইয়ুম, পশ্চিমবঙ্গ
আরবি ষষ্ঠ বর্ষ, দারুল উলূম দেওবন্দ।

বিপ্লবগাথা রোজনামচা
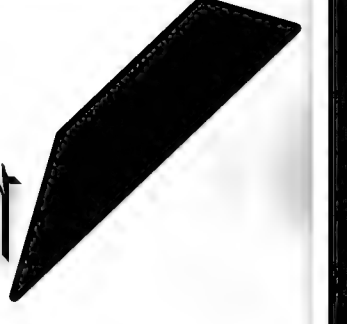
মুসলিম উম্মার পরস্পর বিচ্ছিন্নতাই আজকের দুর্যোগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ মুসলমানদের উপর যত জুলুম-নির্যাতন আর নিপিড়ন চলছে এবং কাফির-মুশরিকদের হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছে মুসলমানদের ইজ্জত আবরু; তার প্রধান কারণ হলো মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য ও পরস্পর বিচ্ছিন্নতা। আমরা এখন এক সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি। জাতিগত সংঘাত ও সংঘর্ষের পাশাপাশি আদর্শের সংঘাতও চরমে উপনীত হয়েছে। এ মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর অতি জরুরি ছিল যে, উম্মাহ নিজেদের বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব কমিয়ে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবেলায় এগিয়ে আসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বারবার শত্রুকে আমরা বিপদের বন্ধু ভেবে বসেছি, অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিনদের সতর্ক করে বলেছেন,
" যারা ঈমান এনেছ, তারা ইহুদ ও নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, বরং তারা একে অন্যের বন্ধু... ।"
দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আজ কাফির-মুশরিক, ইহুদি-নাছারা সবাই একই মিশনে নেমেছে; যেমনটা আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ। কিন্তু মর্মান্তিক বিষয় এই যে, আমরা সবাই মুসলিম। একই ধর্ম আর এক নবীরই অনুসারী। এবং এক কাবার অভিমুখী, তবুও আমরা একতাবদ্ধ হতে পারি না। তাইতো পৃথিবীতে আজ পানির মতো আমাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এক অপদস্থ জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা। প্রিয় পাঠক, এই অনৈক্য আর বিভক্তি আমরা কেন জিইয়ে রাখব, যদি আমরা মুমিন হই?
আল্লাহর রসূল স. হাদীসে পাকে ইরশাদ করেছেন,
"মুসলমানরা এক দেহের মতো। দেহের একটি অঙ্গ ব্যাথা হলে যেমন, পুরো দেহে ব্যাথা ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি একজন মুসলমান আক্রান্ত হলে বিশ্ব মুসলিম সমব্যাথী হতে হবে।"
সাথে আরেকটি কারণ হচ্ছে, কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া। আমাদের পূর্বসূরিরা কুরআনি জ্ঞানে আলোকিত ছিলেন, কুরআনের শাসনে পারিচালিত হতেন, তাই তো তারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের মানডণ্ডে উপনীত হয়েছিলেন। পৃথিবীতে তারা মর্যাদাবান জাতি হিসেবে বাস করে গেছেন। আমরা যদি আবরও সেই হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে চাই, তাহলে আমরা আল্লাহর রজ্জুকেই আঁকড়ে ধরতে হবে অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনকে একমাত্র আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মু.মনিরুল হক
করিমগঞ্জ, আসাম
শিক্ষার্থী, তাকমীলে ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

বিপ্লবগাথা
রোজনামচা

"উলফত সাহিত্যাসর"- যেহেতু লেখিয়ে শিক্ষার্থীদের মুখপত্র। তাই আপাতত রাজনৈতিক গ্যাদারিং নিয়ে উলফত ঘাম ঝরাতে চাচ্ছে না। দারুল উলূম দেওবন্দের মতোই উলফত সাংগঠনিকভাবে অরাজনৈতিক। তবে উলফত বন্ধুদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে উলফতের মাথাব্যাথা নেই। কোনো এক সময়ে উলফত বন্ধুরা হয়তো সমাজের কর্ণধার হবে। তখন হয়তো শান্তি রক্ষায় শান্তিকামী জনতার উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে বিপ্লবী চিঠি লিখতে হবে। নিচের রচনাটি 'বিপ্লবগাথা' হিসেবে বেশ আদর্শ। তাই নমুনা স্বরূপ প্রতিবাদি পত্র হিসেবে উলফত লেখিয়েদের জন্য পত্রস্থ হল। তবে কারও নাম-টাম নেই কিন্তু... । স্রেফ বিপ্লবি পত্রের নমুনা দেওয়া হল।

-সম্পাদক

বিপ্লবী পয়গাম

দেশে শান্তি, একতা, এবং ভ্রাতৃত্ববোধ যখন ....দ্বারা বিপন্ন। মানবতা যখন গভীর সমুদ্র তলে। কল্যাণ ও পবিত্রতা সংকটাপন্ন, সকল প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন যখন শীর্ষে।.......... মতবাদে আচ্ছন্ন বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী। গণতন্ত্রের (?) বটে মাটিতে গজিয়ে উঠছে বর্বরতা। রাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠনগুলো যখন নিষ্ক্রিয়, নিস্তেজ ও নিষ্প্রভা। তখন নির্যাতিতদের আওয়াজ হয়ে, ন্যায়ের ঝান্ডা হাতে নিয়ে, একতার পতাকা উড্ডীন করতে, দেশের তাবত অপশক্তির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ক'জন জনতা দেশস্বার্থে বিলীন হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ও পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা মানবতার মঙ্গলে মৃত্যুকে সালাম জানায়, স্বাগত জানায়, আলিঙ্গন করে। তাদের বিশ্বাস, মৃত্যু ব্যতীত বাঁচে না দেশ। শেষ হয় না দালালি। শক্ত হয় না মাটির পাত। জোয়ার আসে না বিপ্লবের সাগরে। ফ্যাসিবাদী অপশক্তির মজবুত প্রাচীর ধ্বংস করার স্বপ্ন আঁকে তারা। বুকে লালন করে প্রত্যাশা। শুধু স্বপ্ন আর প্রত্যাশাই নয়, তা বাস্তবায়ন করতে উদ্যমচিত্তে লড়াই করছেন, রক্ত ঝরাচ্ছেন, জেলে যাচ্ছেন, কৃতার্থ চিত্তে কষ্ট সহ্য করছেন। তাদের পথ কাঁটাযুক্ত, কন্টকপূর্ণ। বাধার পাহাড় ও প্রতিঘাতের পর্বতশ্রেণীতে ঘেরা। আগুনের স্ফুলিঙ্গ একাধারে ধেয়ে আসছে। কখনও সামনে থেকে, কখনও পিছন থেকে, তবুও পিছপা হয় না তারা।। ঘাত-প্রতিঘাতের দোলাচলে দোদুল্যমান না হয়ে দুর্বার ও দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়তে অভ্যস্ত তারা। তাদের দেখলে একটা কথার সত্যতা নিরূপণ হয় হৃদয়মূলে:

"সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানী যারা,
বাতিলের আক্রমণের লক্ষ্য যে তারা"।

নামটা অনেকের জানা, আবার অনেকের কাছে হয়ত অজানা। সংগঠনটি ভারতের .....টি রাজ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে সুনাম কুড়েছে। সুনাম কুড়েছে তাদের, যারা সত্য চিনে, ন্যায় বুঝে। নির্যাতিতদের তরে খাটনি খাটে, অত্যাচারীদের ঘৃণা করে। সংগঠনটি তাদের জন্য, যারা একতায় বিশ্বাসী, জুলুমে হয় গাত্রদাহ। কিন্তু ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারীদের কুদৃষ্টি ও অশুভশক্তির নজরে থাকে তারা সর্বত্র। তাই "ক্যা" বিরোধী আন্দোলনে পুরো দেশ যখন উত্তাল, প্রতিবাদের ঊর্মিমালায় সরকার ও কুচক্রকারীরা নিদ্রাবিহীন গগনতলে।..................... ও তার চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণ আন্দোলন ও প্রতিবাদী কর্মসূচি হাতে নিয়ে সফল অভিযান চালায়। নিজ গতিতে। আপন সম্ভ্রমে। আজও তারা চালিয়ে যাচ্ছে। যা জ্বালাতন করে মস্তিষ্ক বিকৃত নেতাদের। রাতের ঘুম গুম করে জালিম ও জুলুমের নায়কদের। অনিষ্টের কারিগর নেতা-মন্ত্রীরা এতে ভীত হয়ে ওঠে। তাদের ভিত বুঝি নড়ে যায়। এজন্য তারা অপবাদের আশ্রয় নিয়ে ....ব্যান করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। অপচেষ্টার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে। এমনকি ইউপি-র লক্ষ্ণৌতে লক্ষাধিক জনসমুদ্রের ভীড়ে সংগঠনটির দুজন কেডারদেরকে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করে। পুরো দেশজুড়ে বিক্রিত মিডিয়া উঠেপড়ে লেগে যায়। আলকায়দার সাথে লিংকও খুঁজে পেয়েছে তারা। হাস্যরস নাকি পাগলের প্রলাপ! কে জানে! রাতদিন সংগঠনটির বদনাম করতে আদাজল খেয়ে অপপ্রচার করছে।

ইউপিতে সংগঠনটির ব্যানারে একটাও প্রতিবাদ হয়নি। তথাপিও চাড্ডি হাড্ডির দল পুলিশ লক্ষ্ণৌতে দুজন কর্মকর্তা গ্রেফতার করে মুখ বেঁধে মিডিয়ার সামনে হাজির করেছে, যেন বিশাল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা। অথচ তাদের একমাত্র ভুল(তাদের নজরে) প্রতিবাদে শামিল হওয়া এবং অন্যদের শামিল হতে আবেদন জানানো। ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট সন্ত্রাসী ও আতঙ্কবাদী বলার জন্য। রাতারাতি প্রতিটি অফিসে তল্লাশি শুরু। কিছু লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও দু চারটে বই! এগুলোই যথেষ্ট পুরো সংগঠন ব্যান করতে! .... এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কারও অজানা নয়! কিন্তু..........

ইতিহাস আমাদের বারবার জানান দেয় জুলুমের শেষ সীমানার ব্যাপ্তি ও জালিমের হাতের দৈর্ঘতা। আল্লাহর অদৃশ্য শক্তির উপর আমাদের সামান্যতম সন্দেহ নেই। এই জুলুমের একদিন পরিসমাপ্তি হবেই। হয়ত রাত একটু লম্বা, একটু প্রশস্ত। তবে পূর্ব দিগন্তে সূর্যের আলো একদিন উদিত হবেই। শুকতারা যে দেখতে পাচ্ছি।

-বিপ্লবী শার্দুল, ইসলাম উদ্দিন

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

রোজনামচার ডায়েরি থেকে

আ ব্দু ল্লা হ আ ল মা মু ন

জীবনের প্রথম রোজনামচা

কী লিখব, কীভাবে লিখব, কোথা থেকে লিখব, এসব ভাবতে ভাবতে আর লেখা হয় না। অথচ কোন কাজ শুরু করে দিলে বাকিও থাকে না। তাই আজ রোজনামচা লিখা শুরু করে দিলাম।

আজ ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার একটি গল্প নিয়ে জীবনের প্রথম রোজনামচাটি লিখার ইচ্ছা করলাম।

...গতকাল রাতে প্রায় বারোটার পরে ঘুমালাম। গভীর ঘুমে রাতটি কেটে গেল। মুআজ্জিন ফজরের নামাজের জন্য ডাক দিলেন, কিন্তু আমি টেরই পাইনি। আজানের পর এক সাথির ডাকে জেগে ওঠলাম। চোখ খুলে দেখি, আমার পাশের অন্য এক সাথি দৌড়ে পালাচ্ছে। আমি তো অবাক, কী হলো আজ, সে তো কোনোদিন আমার আগে বিছানা ত্যাগ করতে পারে না!

এরপর আমি যখন বিছানা ত্যাগ করতে যাব, হঠাৎ বাহির থেকে বড়ো ধরনের একটি আওয়াজ ভেসে এল। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, এই মশাইয়ের ভোঁ-দৌড়ের মূল হেতু। আসল কাহিনি হলো আমাদের ক্যাম্পাসের দায়িত্বশীল উস্তাদ, মাও. জাকির হুসাইন সাহেব এসেছেন ছাত্রদের জাগাতে। কাউকে বিছানায় পেলে তবেই যা ঘাটবে আর কি? তাই ওনি দৌড়ে অজু খানার দিকে ভাগলেন। এরপর আমি অজু করে ফজরের নামাজ পড়লাম। নামাজের পর বাহিরের একটি কাজ সেরে কামরার দিকে রওয়ানা দিলাম যে, আজ রোজনামচা লিখব। পথে একটি বিষয়বস্তু এবং কিছু শব্দও জোগাড়ও করলাম। কিন্তু কামরায় এসে লেখতে গিয়ে সব ভুলে গেলাম, তো মাশাই [হুসাইন আলহুদা ভাই] আপনিই বলুন, কিভাবে লিখব আমার রোজনামচা?

৩.৩.২০২০ ঈ.

প্রতিজ্ঞা

দৈনন্দিন রুটিন থেকে জুমার দিনের রুটিনটা একটু ভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ জুমার দিন সবক থাকে না। বরং লেখাপড়া থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেই একটু বেশি খেয়াল করা হয়। পুরো সপ্তাহের কাপড়-চোপড় এই দিনে পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু এই দিন যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে পুরো সপ্তাহের পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজের রুটিনে ব্যাঘাত ঘটে যায়। এমনি হলো এই জুমাবারেও। পুরো দিন রিমঝিম বৃষ্টি হলো। সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কাজগুলো আদায় করা গেল না। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে নতুন সপ্তাহের নতুন রুটিন। এখন আমাকে নতুন সপ্তাহরে কাজেও ব্যাঘাত করা যাবে না; আবার পুরাতন কাজগুলোও সেরে নিতে হবে। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠলাম। কিন্তু কথায় আছে না, হিম্মতের কাছে সবকিছুই সহজ। আমিও হিম্মত করতে পারি যে; না, গত সপ্তাহের কাজগুলোও বাকি রাখব, এই সপ্তাহের রুটিনেও ব্যাঘাত ঘটতে দেব না। আল্লাহ চাহে তো সব সহজ হয়ে যাবে এবং আমি তা পূরণেও সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

৪.৩.২০২০ ঈ.

বাহরুল উলূম তাকেই বলে

প্রত্যহ ফজরের সালাত আদায় করার সাথে সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে যেতে হয়। সবগুলো নিয়মিত আদায় করতে না পারলেও একটি তো আবশ্যই পালন করতে হবে। সেটি হলো বড়ো মাওলানার বাসায় [আল্লামা বাহরুল উলূম নেআমাতুল্লাহ আজমি দা. বা.-এর বাসায়] পত্রিকা দিয়ে আসা। দায়িত্বটি আমি খুব গুরুত্ব সহকারে আদায় করে থাকি। কারণ এতে আমার দুটি ফায়দা, **এক.** আমি নিজেও একটু দেশ-বিদেশের সংবাদ পেয়ে যাই, হজরতে বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাস্তায় পড়ে নেই। **দুই.** হযরতের জিয়ারত। এ বৃদ্ধ বয়সেও ভোরে হজরতকে কিতাব মুতাআলাতেই পাই। যা আমাদের মত সুস্বাস্থ্যের-যুবাদের জন্যও খুব কঠিন। ভাবতে হয় যে, যৌবনকালে তাহলে কী করতেন? কারণ কখনো কখনো তো তাঁকেই বলতে শুনি, "এখন মুতাআলা সম্ভব হয় না !"

আসলে কি "বাহরুল উলূমে"-র মতো এই মহান উপাধটি সবার ভাগ্যে জোটে! আমি মনে করি উপাধি যথাযথ জায়গায় স্থান পেয়েছে।, আজ অবধি কেউ এর উপর আপত্তি বা ইশকাল করার কল্পনাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা হজরত থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। দোয়া করি যে, হে আল্লাহ, নেআমত উল্লাহ নামের এই নেআমত আমাদের উপর দীর্ঘ করুন। আমিন।

৮.৩.২০২০ ঈ.

শিক্ষার্থী:

তাখাসসুস ফিল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

রোজনামচার ডায়েরি থেকে

মা ও. মু. আ তা উ ল্লা হ

প্রথম রোজনামচা

আজব মানুষ! অধিকাংশ মানুষ জানে না যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? কি জন্য সৃষ্টি করেছেন? স্রষ্টার মূল উদ্দেশ্য কি? অজস্র নেআমাত আর নিদর্শন তাদের সামনে ঢেলে দিয়েছেন। কেন? তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন? প্রথমত সৃষ্টিকর্তাকে অবশ্যই চেনা দরকার। দ্বিতীয়ত সৃষ্টিকর্তার উপসনা করতে হয়। তাবৎ দুনিয়ার এই রেওআজ। তো আমরা যখন মুসলমান। আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আমাদের অবশ্যই আল্লাহর তাআলার হুকুম আহকাম মেনে চলা দরকার। নতুবা ঈমানের অর্থ কী দাঁড়াবে?

কিন্তু আমরা তা ভুলে গিয়েছি, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষেরই দাসত্ব শুরু করে দিয়েছি, যেদিন থেকে আমাদের অবস্থা এমন ততে লাগল।সেদিন থেকেই পৃথীবিতে মুসলিমদের অবস্থা সর্বাদিক করুণ হতে শুরু করল। আজ মুসলমানরা হতাশ। কি করবে? কোথায় যাবে? কিন্তু তারা যদি সৃষ্টিকর্তার নিকট এখনও আত্মসমার্পণ করে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের উপর উপর রহম করুন। অবশ্যই তিনি সাড়া দেবেন।

৩.৩.২০ ২০ ঈ.

আমি কেন উদাস হলাম

পূর্বের ন্যায় আজ সকালেও শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই জনাব মাওলানা হুসাইন আহমদ ফেনবি সাহেবের কাছে বাংলা ভাষা শিখতে গেলাম। মনোযোগ সহকারে বসলাম পাঠশালায়। কিন্তু কেন যেন হঠাৎ করে মনটা উদাস হয়ে গেল। অনেক চেষ্টার করেও মনোযোগী হতে পারলাম না। কিন্তু কেন হলো, বলতে পারলাম না। হে আল্লাহ এই পাপী বান্দার উপর রহম করুন। পাঠশালার পাঠ চুকে গন্তব্য চলে এলাম। দীর্ঘ সময় বিশ্রাম নিলাম। কিন্তু না মন-মস্তিষ্ক ঠিক হলো না আর। কি করার, আত্মজিজ্ঞাসা করে কৃতকর্মের কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কি জন্য এলাম, কি করলাম, কি করতেছি।

৪.৩.২০২০ ঈ.

একদিনের বিকেল ভাবনা

দিন শেষ হবার পথে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল আকাশে অন্ধকার চেয়ে যাবে। আমি বৈকাল ভ্রমণে বের হলাম। রাস্তায় হাটছি আর প্রকৃতি নিয়ে ভাবছি। এক জায়গায় রাস্তায় কল্লোল শোনা গেল; নিষ্পাপ শিশুরা খেলছে। কি সুন্দর, নিখুঁত দৃশ্য, আহ্, হয়তো আমাদের শৈশবটাও এমনই ছিল। তখন কী করেছি তার কিছুই তো মনে নেই। আজ আমাদের বয়স হয়েছে, শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে এখন রীতিমতো দায়িত্ববান হতে চলেছি। কিন্তু কী দায়িত্ব আমাদের, কীভাবে সামাল দেব নিজেদের কর্তব্য? সবই আজ অজানা ও অচেনা মনে হচ্ছে। দিনশেষে যেমন আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসে, আমারও আবস্থা যেন তেমনই। দিন শেষে রাতে যেমন মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে যায়, বাইর থেকে কিছু আশা করে না। তেমনি আমি যেন জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার দরজা বন্ধ করে বসে পড়লাম। কেন? কেন এত নৈরাশ হতে চললাম। জানিনে। আল্লাহ যদি আমার সহায় হোন, তবেই জীবন চলার পথ সহজ হবে, অন্যথায়...।

৫.৩.২০২০ঈ.

এতটুকুন কম কিসে?

উত্তাল পুরো বাংলাদেশ, ১৭ই মার্চ মুজিববর্ষ নিয়ে দু'পক্ষই পাল্টাপাল্টি মিটিং, মিছিল ও সমাবেশ করে যাচ্ছে। প্রথম দল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের। দ্বিতীয় দল, ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার।

সরকার চাচ্ছে, ১৭ই মার্চ ২০ ঈ. থেকে আগামী ১৭ ই মার্চ ২১ ঈ. পর্যন্ত এক বছরকে শেখ মজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে মুজিববর্ষ ঘোষণা দেবে। আর এই মুজিববর্ষ উদ্ভোধন করবে নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশ ভ্রমণ করিয়ে।

আর ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা চাচ্ছেন তাকে যেন না আনা হয়। কেননা ভারত স্বাধীন হওয়ার পেছনে মুসলমানদের ভূমিকা অতুলনীয় হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার মুসলমানদের উপর এমন অত্যাচার শুরু করেছে যে, যেন মুসলমানদের কোনোও অধিকারই নেই এই দেশে।কখনও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে আবার কখনো তিন তালাকের বিল পাশের মাধ্যমে, আর এখন তো নাগরিত্ব বিল সংশোধনের কথা বলে মুসলমানদের হেনস্থা করে যাচ্ছে। এ নিয়ে পুরো বিশ্ব মুসলমান ব্যথিত। কেননা হাদীস শরিফে এসেছে, সমস্ত মুসলমান একটি শরীরের মতো। তাইতো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কোনো মুসলমান কোনো ধরনের পেরেশানিতে আক্রান্ত হলে পুরো মুসলিম জাতি ব্যথা অনুভব করে। এজন্য যখন ভারতের বর্তমান সরকার ভারতীয় মুসলামনদের উপর নির্যাতন করছে, তাই বাংলাদেশের জনগণ বলছে, কমাসেকম এই অত্যচারী যেন আমাদের দেশে অতিথি হিসেবেও না আসতে পারে। আমরা এতটুকু করে আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর চালানো হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ করতে চাই। কেনানা বাংলাদেশের ৯২ভাগ জনগণ মুসলমান।

৮.৩.২০২০ঈ.

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

রোজনামচার ডায়েরি থেকে

মু. আ ব্দু ল হা লি ম

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাপকগুলো কেমন যেন অদ্ভুত! সংসদ ভবন থেকে নিয়ে সমাজের কোর্ট কাঁচারি পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী থেকে নিয়ে গ্রামের দারোগা পর্যন্ত, সবাই যেন একই। বলা হয় যে, যেখানে ইনসাফ নেই, সেখানে গাধা-ঘোড়া এক বরাবর। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র সম্পর্কে, এমপি-মন্ত্রীরা থানা জেলা নিয়ে, মেয়ররা তার সিটি সম্পর্কে, ইউ. পি চেয়ারম্যানগণ নিজেদের ইউনিয়ন সম্পর্কে এমনটি ওয়ার্ড মেম্বাররা ছোট্ট গ্রামটির খবর রাখতে পারে না। তারা কেবল একটি ধান্ধাই করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; কিভাবে নিজেদের ধন সম্পদ বাড়াবে। এর জন্য একেবারে উম্মাদ হয়ে পড়েছে। যখন নির্বাচনে দাঁড়ায় তখন সাধারণ মানুষকে যত্তসব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকৃষ্ট করতে পারে। অসহায় দরিদ্র মানুষগুলো তাদের পথ চেয়ে থাকে, কিন্তু তারা জানে না যে ধর্মহীন এই সরকারের কোনো লোকই তাদের কোনো কাজে আসবে না। হ্যাঁ, যদি ইসলামি সরকার হতো তাহলে ইসলামই নিশ্চিত করত জনতার অধিকার। কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন হত না। আজকাল নির্বাচনের আগে নেতারা জনগণের পা ধরে, আর নির্বাচনের পর জনগণ তাদের পা ধরতে হয়, এমন কেন হলো??

৯.৩. ২০২০ঈ.
চৌমুহানি, নোয়াখালি

প্রথম রোজনামচা

টিক টিক করে ঘড়ি চলছে অবিরাম। পুরো রাত সে একটুও ঘুমোয়নি! পাখিরা কিচিমিচির কলবরে পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলছে। অন্যদিকে শীত তার হিমেল হাওয়ায় পৃথিবীকে জড়িয়ে রেখেছে। তাই নীরবতা ধারণ করেছে গভীর নিস্তব্ধতায়। এমন সময় আমার কানে ভেসে এল এক ঐশী ধ্বনি, মুক্তির আওয়াজ। তাই মুক্তির কাফেলায় যোগ দিতে উলের গরম বিছানা ত্যাগ করে অজু খানায় উপস্থিত হলাম। ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে ফজরের নামাজ আদায় করলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

৩.৩.২০২০ ঈ.

আমি চাই হৃদয় উজাড় করে মায়ের ভাষায় বলতে

মানুষ কত রঙ-বে -রঙের স্বপ্ন দেখে। জীবনের এক বৃহৎ অংশ স্বপ্নরাজ্যেই কেটে যায়। হ্যাঁ, সফল মানুষ হতে হলে একজন সফল স্বাপ্নিকও হতে হয়। তাই আমিও স্বপ্ন দেখি। আমারও একটি স্বপ্নরাজ্য আছে। আছে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা। কিছু উদ্যমতা। তাই আমি তামান্না করি এমন এক চারণভূমির, যেখানে স্বপ্নগুলোর যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটানো যাবে। আমার স্বপ্ন-রাজ্যের একটি অধ্যায় কেবল মাতৃভাষাকে নিয়ে । আমি চাই, আমার মায়ের ভাষায় প্রাণ উজাড় করে পৃথিবীর সামনে মনের কথা তোলে ধরতে। জাতির সাথে তাদের দুঃখ-কষ্ট ও হাসি-খুশির ভাগাভাগি করতে। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, আমার রূপবতী স্বপ্নটির আজ সফল বাস্তবয়ন হতে চলেছে উলফত সাহিত্যাসরের কল্যাণে। তাই উলফত পরিবারের শোকরিয়া আদায় করছি।

৪.৩.২০২০ ইং

এই আবার দোষের কিসে?

বৃহস্পতিবার এক প্রচার মাধ্যম থেকে জানা গেল যে, এক ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক অল্প বয়সের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে, লোকটির বয়স ছিল ৭২ আর মেয়েটির বয়স ছিল ১৯ বছর। সংবাদটি শোনার পর প্রাথমিকভাবে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু যখন ভাবতে গেলাম, তখন মনে হলো এটা তেমন কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ বিয়ে শাদিতে দুটি জিনিস লক্ষ করা হয়। স্বামীর সামর্থ্য। তা আছে বিধায় তো তিনি বিয়ে করছেন। দ্বিতীয়ত উভয়ের সম্মতি। তো মিডিয়ায় তাদের যে ভাবমূর্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে একথা নিশ্চিত বালা যায় যে, উভয়ই প্রবল আগ্রহের সাথে একে অপরকে গ্রহণ করেছেন। আরে কথায় আছে না; "মিয়াঁ বিবি রাজি, কিয়া করেগা কাজি!"

৫.৩.২০২০ইং

শিক্ষার্থী,
তাখাসসুস ফিল হাদীস,
দারুল উলূম দেওবন্দ

রোজনামচার পাতা

যেথায় গাঁথবে তোমাদের স্বপ্ন, চেতনা, উদ্যোগ ও সাফল্যের আখ্যান

ছোটো গল্প

টাকা দিয়ে সুখ পাওয়া যায় না

-কাজী শাকীল আহমদ

আব্দুল্লাহ ও অশোক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। দুইজনের খুবই বন্ধুত্ব। একই বেঞ্চে ক্লাসে বসে। এক সঙ্গে খেলাধুলা করে। আব্দুল্লাহ জমিদার বংশের ছেলে। মর্ডান ঘরের ছেলে। অন্যদিকে অশোক এক গরীব ঘরের ছেলে কিন্তু তার মধ্যে বেশ আভিজাত্য রয়েছে, খুব উদার ও নম্র-ভদ্র। গরীব হলেও দেখলে উঁচু বংশের বলে মনে হয়। একদিন অশোক তার বন্ধু আব্দুল্লাহকে চিন্তিত দেখল। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না। ক্রমাগত কয়েকদিন একই অবস্থা দেখে বলল, কিরে তোকে কয়েকদিন ধরে বড়ো চিন্তিত দেখছি? আরে চিন্তা তো আমার বা আমাদের মতো গরীবের ছেলেদের হওয়ার দরকার, এই দূর মূল্যে বাজারে টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। টাকা থাকলে তো সুখও কিনতে পাওয়া যায়। ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ করা যায়। তোদের কিসের-বা কমতি রয়েছে রে? আব্দুল্লাহ বাধা দিয়ে বলল এই রোগেই ঘোড়া মরছে।টাকা দিয়ে যদি সুখ পাওয়া যেত ধনী লোকদের আত্মহত্যা করতে দেখা যেত না। যাই হোক অশোক আমার দুঃখ কষ্টের জন্য তোকে ব্যস্ত হতে হবে না।

অশোক বলল তা কখনো হয়? তুই মনভরা কষ্ট নিয়ে বসে থাকবি, আর আমি ফুর্তি করে বেড়াব?

আব্দুল্লাহ কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলল, অশোক আমার কষ্টের কথা না শুনে বরং তুই তোদের ফ্যামিলির সুখ-শান্তির কিছু কারণ আমাকে বর্ণনা দে, যে এত দারিদ্র্যতার মধ্যে কীভাবে আনন্দ-ফুর্তিতে দিন কাটাস তোরা? তোকে কোনোদিন চিন্তিত দেখি না, আচ্ছা তোদের কি বিপদ-আপদ রোগ-বালাই ছোঁয় না ?

অশোক মৃদু হেসে বলল: বারে, মানব জীবনে দুঃখ-কষ্ট রোগ-শেফা আসবে না, দুনিয়াটাকে কি স্বর্গ ভেবেছিস? তবে হ্যাঁ, মানুষের দুঃখ-কষ্টের সময় যদি একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখায়, একের বিপদে দু'জন সান্ত্বনা দেয় ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে দুঃখের মাঝেও সুখের ভাত খাওয়া যায়। আর আমাদের গরিব ঘরের সুখ-শান্তির এবং আমার সুখের হাসির মূলমন্ত্র কিন্তু ওই সহানুভূতি, সহযোগিতা আর সহমর্মিতাই। যেমন আমার মা নিজের সাধ্য অনুপাতে ঘরের কাজ করতে থাকেন, সাথে সাথে আমাদেরকে বারবার বুঝাতে থাকেন যে, বাছা, তোমরা পড়াশোনায় মনোযোগ দাও। কিন্তু আমি, বাবা ও বোনেরা সকলেই সুযোগ পেলেই মায়ের কাজে হাত লাগাই। হয়তো আমরা তার কাজকে উদ্ধার করতে পারি না, তবুও মায়ের মন বড্ড খুশি হয়...। আবেগে অশোকের চোখে পানি এসে যায়, সে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল: কিন্তু মা আমাদের সংসারের অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, বেটা, তোদেরকে মন ভরে যত্ন করতে পারি না, রংবেরঙের খাবার মুখে দিতে পারি না, এমনিভাবে আমার বাবা সকলকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। তার আয় অনেক সীমিত। কিন্তু তার ব্যবহারে বুঝা যায়, তার কাছে কাছে যদি অর্থ-ভাণ্ডার থাকত, তাহলে পরিবারের বা প্রতিবেশীদের প্রয়োজনে তা ব্যয় করত সামান্যতম দ্বিধা করতেন না। আমাদের কারও পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনোদিনই কোনো ব্যাপারে তিনি পিছপা হননি। আমাদের কারও রোগব্যাধি হলে তার ব্যকুলতা দেখেই আমাদের রোগ -ব্যাধি কমে যেতে থাকে, বাবা আমাদেরকে সান্ত্বনা দেন যে, "বাবা তোমরা চিন্তা করো না, রোগব্যাধি ভগবানের দান, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করি, অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত করার জিনিস নয়, আজ গেলে কাল ফিরে পাবো। কিন্তু তোমরা গেলে আর ফিরে পাবো না।"

বাবার এই ব্যাকুলতা ও সান্তনাতেই আমরা অর্ধসুস্থ হয়ে ওঠি। আমারাও লক্ষ্য রাখি যে, কিভাবে বাবার বোঝা হালকা করা যায়। এমনই অবস্থা আমাদের ভাই বোনদের সবার। আর আমার বাবা বলেন মানুষ সহানুভূতি ছাড়া কখনো সুখ পেতে পারে না...।

এতক্ষণ আব্দুল্লাহ চাতক পাখির ন্যায় কথাগুলো শুনছিল। তার গোণ্ডযোগল বেয়ে অশ্রু বেয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ বলে ওঠলো, ভাই অশোক সত্যি তোরা কতইনা সুখের দিন কাটাস। টাকা দিয়ে সুখ খুঁজে পাওয়া যায় না। আব্দুল্লাহ এবার কাঁদতে লাগল। অশোক তার হাত ধরে বলল, কিরে কিসের কান্না জুড়লি! বল কি হয়েছে?

-আব্দুল্লাহ বলল, জানিস আমাদের অর্থের কোনো অভাব নেই ঠিক, কিন্তু এই সহমর্মিতা ও সহানুভূতির অভাবে পরিবারের প্রত্যেকে সুখের অভাব বোধ করে। অশান্তিতে ভোগে। বাবা-মায়ের কাজে ভাই বোনদের কেউ সাহায্য করে না, কাজের কৃতজ্ঞতাও দেখায় না। মা-বাবার কাজের মূল্য বোধ করে না। আমাদের রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে টাকা খরচ হয় বটে, কিন্তু বাবা আর বড় ভাই যখন রোগীর সামনে অর্থব্যয়ের জন্য আফসোস করতে থাকে, তখন রোগীর মন কঠিন আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমরা ভাই-বোনেরাও নিজেদের খায়েশ পূরণে ব্যস্ত থাকি, মা-বাবার কষ্টের মূল্য বুঝতে চাই না। একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকি। কিন্তু অশোক তোরা এই সুখের সন্ধান পেলি কোথা থেকে রে?

অশোক কিছুক্ষণ মাথা নত রেখে বলল আসলে আমার দাদার এক মুসলমান বন্ধু ছিলেন, বড় পণ্ডিত মানুষ। দাদা বলতেন, এই বন্ধুটি আমাকে এই সুখের পথ দেখিয়েছিলেন!

সরফশাস্ত্রের বহুল কাঙ্ক্ষিত রচনা

নুজুমুস সরফ (আরবি)

লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গনী আল-হওড়াবি
উস্তাদ, তাফসীর ও উসূলে ফিকহ,
দারুল উলূম দেওবন্দ, ইউ. পি., ভারত
বিষয়বস্তু: ইলমে সরফ বা আরবি শব্দ-প্রকরণ শাস্ত্র।
প্রকাশক: "মাকতাবাতুত তুরাস আল-ইলমী দেওবন্দ ।"
অক্ষরবিন্যাস: আব্দুল হাদী আলকাসিমী কবীরনগরি।
পৃষ্ঠা: ২০৭
চতুর্থ প্রকাশ: ১৪৩৮ হিজরি, মুতাবিক২০১৬ ঈসায়ি.

কিতাব পরিচিতি

আরববিশ্বে সরফশাস্ত্রে রচিত পর্যাপ্ত তামরীন [অনুশীলন] সম্বলিত সরফশাস্ত্রের (তথা আরবিভাষা শব্দপ্রকরণ শাস্ত্রের) ছোটো-বড়ো অনেক রচনা পাওয়া যায় । হিন্দুস্তানেও সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত ছোটো-বড়ো উর্দু-ফার্সি ভাষায় রচিত নাহব ও সরফ-শাস্ত্রের কিতাবের অভাব নেই। এগুলোতে সহজ-কঠিন উভয় প্রকারের রচনাই বিদ্যমান। তবে ইবতেদায়ী মারহালাতে (প্রাথমিক স্তরের) সিলেবাসভুক্ত করার জন্য সরফের যথোপযুক্ত কিতাব পাওয়া গেলেও মাধ্যমিক স্তরের সরফের ছাত্রদের জন্য কিতাব নেই বললেই চলে।

কিন্তু এক্ষেত্রে সরফশাস্ত্রে রচিত বক্ষমান কিতাবটি সাবলীল বিন্যাস, চমৎকার রচনাশৈলী ও নিখুঁত বাগধারায় সাজানো এবং যুগোপযোগী বৈশিষ্টমণ্ডিত হওয়াতে মুতাওয়াসসিতাহ মারহালা বা মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য সিলেবাসভুক্ত করার কেবল উপযুক্তই নয়, বরং সময়ের দাবি। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর ইলম (প্রজ্ঞা) অর্জন করতে হলে আরবিভাষার দ্বারস্থ হতে হবে। এর জন্য আরবিভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। আর যে কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো, ভাষার প্রথম কিতাবটি শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় ও পরবর্তী কিতাবগুলো মূল ভাষায় পড়ানো উচিত। তো বাঙালি শিক্ষার্থীদেরও আরবিভাষায় বাস্তবিক অর্থে দক্ষ করে গড়ে তোলতে হলে একই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সরফ শাস্ত্রের প্রথম কিতাবটি বাংলা পড়ানোর পর দ্বিতীয়স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল আরবি ভাষায় পড়ানো অতীব প্রয়োজন। সম্মানিত লেখক এই প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত শ্রম, সময় ও মেধা ব্যয় করে পাঠ্যক্রমের উপযোগী করে আরবিভাষায় কিতাবটি সংকলন করেছেন । লেখক এই কিতাবে ইলমে সরফ বা সরফশাস্ত্র সংশ্লিষ্ট ছোটো-বড়ো সকল নিয়ম-নীতি ও গঠন প্রণালি আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন । পাঠক কিংবা শিক্ষার্থীরা সরফের প্রতিটি পরিচ্ছেদ বা নিয়ম একত্রে এই এক কিতাবেই সহজে পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ ।

বৈশিষ্টসমূহ

লেখক কিতাবটির নাম দিয়েছেন "নজুমুস সরফ" বা ইলমে সারফের নক্ষত্রসমূহ। বাস্তবেও এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা এই কিতাবের প্রতিটি আলোচনা ও অধ্যায় এতই চমৎকার যেন নক্ষত্রের মতো আলোকোজ্জ্বল ও দীপ্তিমান । লেখক "সারফী-আবওয়াব" (শব্দ-প্রাকরণিক অধ্যায়) এবং প্রতিটি বাবের আভিধানিক অর্থ ও অধ্যায়ের স্বাতন্ত্রতা উল্লেখ করেছেন।

সরফের কাওয়াইদ বা নিয়মগুলোর চমৎকার বিন্যাস এবং কুরআন-হাদীস থেকে উদাহরণ প্রদান, কাওয়াইদগুলোর মাঝে বিদ্যমান মুশকিলাত/সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের নিরসন, তালীলাত বা সন্ধি-এর গঠন প্রণালী , তাসরিফাত তথা ক্রিয়াপদ গঠনসহ সরফ শাস্ত্রের সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় অত্যন্ত সুবিন্যস্ত রূপে সহজ আরবীতে লিপিবদ্ধ করেছেন । এক কথায় কিতাবটিকে ইলমে সরফের বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে । যার মাধ্যমে সরফ-এর যেকোনো ছাত্র তার কাঙ্ক্ষিত পাঠ স্বল্প সময়ে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে । সম্মানিত লেখক কায়দার বিবরণ শেষে "মুলাহাজা বা লক্ষণীয়"-এই শিরোনামে বিশেষ দ্রষ্টব্যমূলক যে আলোচনা পেশ করেছেন, তা কায়দাগুলোকে আরও গভীরভাবে বুঝতে সহায়তা করে । লেখক তার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় দাবি করেছেন যে , তিনি এই কিতাবকে নতুন মোড়কে সাজিয়েছেন। রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছাত্রদের বোধশক্তি ও রুচির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন । যাতে ছাত্ররা খুব সহজে সরফের কায়দাগুলো আত্মস্থ করে বিশুদ্ধ আরবি বলতে ও লিখতে সক্ষম হয়।

কিতাবটি অধ্যায়ন করে দেখা গেছে, লেখকের দাবি সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত । "সিলাতুল আফআল" শিরোনামে তিনি প্রত্যয়বাচক বর্ণ যোগে ফেয়েল বা ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্যময় অর্থের যে বিবরণ দিয়েছেন এটি তার একটি জ্বলন্তপ্রমাণ ।

সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অধিকাংশ সারফি-কায়দার (ব্যাকরণিক নিয়ম) উদাহরণ বা মিসাল দিয়ে উল্লেখ করেছেন পবিত্র কুরআন অথবা হাদীস শরীফ থেকে, যা মূলত একটি ছাত্রের মাঝে প্রথম থেকেই সরফের কাওয়াইদগুলো কুরআন আর হাদীসের মাঝে সমন্বয় করার যোগ্যতা তৈরি করবে । এই উদ্যোগটি সাধারণত অন্যান্য কিতাবে কম দেখা যায়। বলা যায় আমাদের পাঠদান পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীস থেকে উদাহরণ টেনে অনুশীলন করার চর্চাটি জরুরি হলেও চরম অবহেলিত । যদ্দরুণ ছাত্ররা কায়দাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাহ্যিক অনেক উদাহরণ পেশ করতে পারলেও কুরআন-হাদীসে গিয়ে ওই কায়দাগুলোর সমন্বয় ঘটাতে পারে না । এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে কিতাবটির মর্যাদা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে । কিতাবটিতে আরবিভাষার আধুনিক রসমুল খতের (লেখ্যরীতির) যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে।আমাদের সিলেবাসভুক্ত কিতাবগুলো সাধারণত অবিন্যস্ত রূপে রয়েছে, আলামতে তারকীম বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার না থাকার কারণে ছাত্ররা আলামতে তারকীম সম্পর্কে অবগত থাকে না ।

আবার এই চিহ্নের অনুপস্থিতির কারণে ক্ষেত্রবিশেষ কিতাবের ইবারত পড়াও কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় । কিন্তু কিতাবটি উপরোক্ত ত্রুটিগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ।

যেভাবে সাজানো হলো:

মুসান্নিফ দা. বা. কিতাবটিকে একটি সুদীর্ঘ মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা) এবং তিনটি বাব (অধ্যায়) এবং একটি খাতিমাহ (পরিশিষ্ট) দিয়ে সাজিয়েছেন । মুকাদ্দিমাতে তিনি মাবাদিয়াতুস সরফ বা সরফশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় প্রথমিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন । আর প্রথম অধ্যায়ে আবনিয়াতুল আফআল বা ক্রিয়ার গঠনপ্রণালি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবনিয়াতুল ইসম বা শব্দ-প্রকৃতির গঠন প্রণালি ও শ্রেণীবিন্যাস এবং তৃতীয় অধ্যায়ে কাওয়াইদুল ইবদাল, তা'লীল, ইদগাম তথা সন্ধি যোগে গঠিত শব্দসমূহের গঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং খাতিমাহ বা (পরিশিষ্টে) আত্তাসরিফাতুল মুবাদালাহ- শিরোনামে লম্বা আলোচনা করেছেন। প্রতিটি আলোচনার জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় শিরোনাম দিয়েছেন।এরপর অভ্যন্তরীণ আলোচনাগুলোকে হুরূফে আবজাদ বা আক্ষরিক ক্রম দিয়ে বিন্যাস করেছেন ।যা কিতাবের অধ্যায়নকে সহজ ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে ।

বড়োদের মূল্যায়ন

কিতাবটিতে দারুল উলূম দেওবন্দের দুজন বিখ্যাত মনীষীর অভিমত রয়েছে:

বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক শায়খ নূর আলম খলিল আলআমীনি হাফিজাহুল্লাহ।

তিনি তাঁর প্রশংসাবাণীতে বলেন : "এই কিতাবের কিছু অংশ অধ্যায়ন করে দেখেছি যে, এটি সরফশাস্ত্রের ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য বেশ উপকারী । সাধারণত ইলমে নাহবের (আরবি বাক্যপ্রকরণের) তুলনায় ইলমে সরফ কঠিন ।তাই ছাত্ররা ইলমে সরফ স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি সহকারে পড়তে পারে না ।এর মূল কারণ হলো, নাহব শাস্ত্রের ছোটো-বড়ো যে পরিমাণ কিতার পাওয়া যায় সারফ -এর ক্ষেত্রে সে পরিমাণ পাওয়া যায় না এবং নাহবকে সহজ করণের জন্য যে পরিমাণ কাজ হয়েছে, সরফশাস্ত্রকে সহজ করণের জন্য সে পরিমাণ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । তবে খুশির বিষয় হলো আমাদের মুফতি ওসমান গনি সাহেব একজন সরফ শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে তার সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সরফের জটিল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন । যদ্দরুণ একজন ছাত্রের আগ্রহ আরও বেগবান হয়ে ওঠবে হিন্দুস্তানে উর্দু রচনার আধিক্যের ফলে ছাত্রদের মাঝে আরবিচর্চার ঘাটতি দেখা দেওয়া ও যোগ্যতা নষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা রয়েছে এই কিতাবটি সংকলনের মাধ্যমে তাও দূরিভূত হয়ে গেছে " ।

মুফতি জামিল আহমদ রহ. তার অভিমতে এই কিতাবকে সরফশাস্ত্রের বিশ্বকোষ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন:

তারকারাজি উদিত হলে যেমন অন্য সব আলোক রশ্মির প্রয়োজন পড়ে না, তেমনি নজুমুস সরফ কিতাবটি এতগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও লেখকের এই কথা তার বিনয় ও ঐকান্তিকতার পরিচয় বহন করে যে,

তিনি তার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় বলেছেন "কোনো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, একজন মুজতাহিদেরও ভুল হতে পারে ।তাই আমার এই কাজটিও ত্রুটিমুক্ত বলে দাবি করছি না । আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করি, যেন আল্লাহ আমার এই আমলকে ইখলাসের চাদর দিয়ে আবৃত করে দেন । এবং কবুলিয়্যতের অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত করে দেন।"

দুয়েকটি প্রস্তাব:

প্রস্তাব এক.

কিতাবটিকে নেসাবভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হোক। কেননা আমাদের দরসে নেজামিতে সিলেবাসভুক্ত সরফের তিনটি কিতাবই ফারসি ভাষায় রচিত।আর এগুলোর পাঠদান করা হয় উর্দু মিডিয়ামে। মানে আরবিভাষার কায়দা শিখার জন্য আরও দুটি বিদেশি ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কচি-কাঁচা শিক্ষার্থীদের অন্তরে একাধিকভাষার প্রচণ্ড চাপ পড়ে যায়, যা মৌলিক কায়দাগুলো আত্মস্থ করণে ব্যাঘাত ঘটায় । কাজেই এ ব্যাপারে বিজ্ঞজনদের সচেতনতা কামনা করি ।

প্রস্তাব দুই.

"সম্মানিত লেখক" -এর প্রতি অনুরোধ থাকবে যে, কিতাবের শুরুতে "মানহাজুল কিতাব" বা বিন্যাস ধরণা সংযোজন করলে ভালো হবে।মানহাজ পড়ার মাধ্যমে কিতাব থেকে ইস্তিফাদা বা উপকৃত হওয়া সহজতর হবে । মানহাজ পড়লে পূর্ণাঙ্গ কিতাবের সংক্ষিপ্ত চিত্র মনে রাখতে সুবিধা হয় । মানহাজ সংযোজনের মাধ্যমে কিতাবটি আরও মানসম্মত হয়ে ওঠবে, ইনশাআল্লাহ। (অবশ্য কিতাবের নতুন সংস্করণ প্রস্তুত হয়ে গেছে, হয়ত তাতে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়েছে।

প্রস্তাব তিন.

উদাহরণে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের নম্বর ও সূরার নাম এবং হাদীসের হাওয়ালা বা রেফারেন্স উল্লেখ করা হোক । এটি টীকা সংযোজনের মাধ্যমেও করা যেতে পারে ।

সর্বোপরি একজন বাঙালির হাতে আরবিভাষার এই অনবদ্য রচনা জাতির এক গৌরবোজ্জ্বল অবদান ।

-আব্দুল্লাহ মু. ইউসুফ
তাকমীলে ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
[সম্পাদক কর্তৃক বিশেষ সংযোজিত ও সম্পাদিত]

এর মূল কারণ হলো, নাহবশাস্ত্রের ছোটো-বড়ো যে পরিমাণ কিতার পাওয়া যায় সারফ -এর ক্ষেত্রে সে পরিমাণ পাওয়া যায় না। এবং নাহবকে সহজ করণের জন্য যে পরিমাণ কাজ হয়েছে, সরফশাস্ত্রকে সহজ করণের জন্য সে পরিমাণ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ।তবে খুশির বিষয় হলো আমাদের মুফতি ওসমান গনি সাহেব একজন সরফ শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে তার সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সরফের জটিল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ।

আধুনিক আরবি সাহিত্য প্রেয়সীদের জন্য অমূল্য এক উপহার

“দুরূসুন ফিল আরবিয়্যাতিল মুআসারাহ”

লেখক :
মাওলানা মুফতি আসাদুল্লাহ আসামি দা. বা.
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
পৃষ্ঠা : ২০৬
প্রকাশনা: মাকতাবাতুস সুফফা, দেওবন্দ , ইন্ডিয়া

প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৯
তৃতীয় প্রকাশনা: ২০২০

কিতাব পরিচিতি

বর্তমান উপমহাদেশীয় শিক্ষার্থীদের মাঝে আধুনিক আরবির প্রতি প্রবল আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে এক দিকে যেমন অসংখ্য আরবিভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, একই সাথে আরবিভাষার তামরীন [অনুশীলন], ইনশা [লেখ্য অনুশীলন]-এর জন্য অনেক কিতাবও বাজারে এসে গেছে । এগুলোর মাঝে পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত এবং অ্যাকাডেমিক পর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা কিতাবগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো “আল কিরাতুল ওয়াজিহা”, “মুয়াল্লিমুল ইনশা”, “মিনহাজুল আরবিয়া” এবং এগুলোরও ১৫-২০ বছর পূর্বে লিখা হয়েছে “মিফতাহুল আরবিয়া” । কিন্তু ইদানিং (কয়েক বছরের) মধ্যে আরও কিছু কিতাব অনেক ভালো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে, যেমন “তাইসিরুল ইনশা” “মইনুল মুতারজিম” ইত্যাদি। আমাদের আজকের আলোচ্য কিতাবটি; “দরূসুন ফিল আরবিয়্যাতিল মুআসারাহ”-ও উপরের কীর্তিমান কিতাবগুলোর সাথে সংযোজন হওয়া এক অনবদ্য রচনা। তবে এটি অনন্য কিছু বৈশিষ্ট নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে।

বৈশিষ্ট সমূহ

সম্মানিত লেখক “বাইনা ইদায়িল কিতাব” -এর শিরোনামে সুদীর্ঘ ভূমিকায় কিতাবটির যে প্রেক্ষাপট ও রচনাশৈলীর বর্ণনা দিয়েছেন, তা পড়ার পর ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা আরবি সাহিত্যিক মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবি রহ.-এর কথা স্মরণ হয়ে যায়। যিনি আরবিভাষা পাঠ-পঠনের ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে সফল শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের মাঝে আরবিভাষার দক্ষতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যে পাঠদানপদ্ধতি গ্রহণ করতেন, সম্মানিত লেখককেও আল্লাহ তাআলা তেমন ব্যুৎপত্তি, প্রজ্ঞা ও মেধা দান করেছেন।

আরবি-ইবারত (বিশুদ্ধ আঙ্গিকে আরবি পাঠ) বিশেষত আরবি পত্র-পত্রিকা এবং আধুনিক ধাঁচে রচিত যেকোনো প্রবন্ধ-নিবন্ধ বুঝা, উর্দু থেকে আরবিতে অনুবাদ করতে পারা ইত্যাদির যোগ্যতা তৈরি করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজ হলো ছাত্রদের জাদিদ তা'বির (আধুনিক সাহিত্য) ও আরবি-বাগধারাতে পরিপক্ক ও পারদর্শী করে গড়ে তোলা। এবং বাক্যের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা দেওয়া। লেখক কিতাবটিতে মৌলিকভাবে এই কাজটিই দেখিয়েছেন।

এই কিতাবটি পড়ে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো উপলব্ধি করার সৌভাগ্য হলো, তা নিচে তোলে ধরা হলো:

এক.
এই কিতাবে ব্যবহৃত “তাবিরাতগুলো” আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত। যা একজন শিক্ষার্থীর জন্য অমূল্য এক পাথেয় বলে মনে হয়েছে।

দুই.
যেহেতু তাবিরাতগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন করা হয়েছে, এজন্য তাতে ভাষার অভিনবত্ব ও শব্দ প্রয়োগের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার ও অভিনবত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

তিন.
কিতাবটি ওই সকল ছাত্রের জন্য রচনা করা হয়েছে, যারা আরবিভাষার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে এসেছে।তাই তারা যদি এই কিতাবের মানহাজ বা বিন্যাস অনুযায়ী আরবিভাষা শিক্ষায় গভীর মনোনিবেশ ও নিয়মতান্ত্রিক মেহনতের মাধ্যমে অনুশীলন করে যায়, তো জোরদার আশা করা যায়, তাদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও সফলতা অর্জন হবে, ইনশাআল্লাহ

চার.
কিতাবে আধুনিক আরবি শব্দের বিশাল এক ভাণ্ডার সন্নিবেশ করা হয়েছে। যা সংকলনের জন্য মুহতারাম লেখক কঠোর পরিশ্রম করেছেন বলে মনে হয়েছে।

পাঁচ.
কিতাবটিতে কাওয়াইদ বা ব্যাকরণের তুলনায় তামরীন বা অনুশীলনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। যা ছিল একটি অত্যাধিক জরুরি বিষয়।

মুহতারাম লেখকের প্রতি এক পলক:

কিতাবটির লেখক মুহতারাম মাওলানা মুফতি আসাদুল্লাহ সাহেব দা. বা. একজন বাঙালি প্রাজ্ঞ আলেমেদ্বীন, দারুল উলূম দেওবন্দের “দারুল ইফতার” সহকারী মুফতি হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সহিত কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি ফারিগ হওয়ার পরপরই ইফতা বিভাগের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন যা তার ইলমী যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় বহন করে। বর্তমান তার কর্মব্যস্ততা হলো, ধারাবাহিক ফতওয়া লিখনের সাথে আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠদানের এক বিশেষ যোগ্যতা ও উদ্যমতা দান করেছেন যা তাঁর ছাত্রজীবন থেকে পরিলক্ষিত

ছাত্রাবস্থায় তিনি অনেক ছাত্রদের পড়াতেন, আজও ক্লাসের ভেতরে-বাইরে বিপুল পরিমাণ অন্বেষী শিক্ষার্থী তাঁর ঝুলি থেকে উপকৃত হয়ে যাচ্ছে। তিনিও শত ব্যস্ততার মাঝে একাই নানান প্রতিভার শিক্ষার্থীদের নানান জ্ঞান-উপকরণ জুগিয়ে যাচ্ছেন। তার পাঠদানে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়েছেন।

বড়োদের মূল্যায়ন:
কিতাবটিকে দারুল উলূম দেওবন্দ ও হিন্দুস্তানের অন্যন্য বিখ্যাত মনীষীরা বিপুল মূল্যায়ন করে নিজেদের অভিমত প্রদান করেছেন। যথা: দারুল উলূল দেওবন্দের মুহতারাম মুহতামিম মুফতী আবুল কাসেম নুমানি , বিখ্যাত আরবি সাহিত্যেক ও দায়ী শায়খ ওয়াজেহ হাসান আলহাসানী নদবি, আলীগড় ইউনিভার্সিটির আরবি প্রভাষক ডক্টর ফাইজান এবং দারুল উলূম দেওবন্দের-এর আরবি সাহিত্য বিভাগের সিনিয়র উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ সাজিদ কাসিমি হারদূয়ি ও মাওলানা আরিফ জামিল মুবারকপুরি প্রমূখ।
মুহতামিম মুফতী আবুল কাসিম নুমানি সাহেব দা. বা. তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, “লেখক দীর্ঘ সময় ব্যয় করে এমন একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব রচনা করার প্রয়াস চালিয়েছেন, যাতে আরবিভাষার প্রাথমিক ছাত্ররা বিশুদ্ধ আরবিভাষা শেখার ক্ষেত্রে যে সকল জটিলতার সম্মুখীন হয়, তা সহজে কাটিয়ে তোলতে পারে। আরব্য বিশুদ্ধ ভঙ্গিতে কথোপকথন ও লেখালেখি করতে পারে।
“মাসিক দারুল উলুম”-এর সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ সালমান বিজনূরি সাহেব দা. বা. কিতাবটির কিছু বৈশিষ্ট উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখেছেন। তা পড়লে কিতাবের গুরুত্ব অনুধাবনে সহজ হবে। অবশ্য সম্মাতি লেখকও কিতাবের “পরিচয় ও সূচিপত্র” শিরোনামে কিতাবের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি ও চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্যাবলির দিকে নির্দেশ করেছেন। যা পড়ার পর কিতাবের অধ্যায়নের প্রতি প্রবল আগ্রহ জেগে ওঠে ।
পরিশেষে একজন বাঙালির হাতে আরবিভাষার তবে এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক এই প্রত্যাশায় ।

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইউসুফ
তাকমিলে ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ

[সম্পাদককর্তৃক বিশেষ সংযোজিত ও আমূল সম্পাদিত]

“আল ওয়াজিয ফী কাওয়াইদুল ফিকহ”

লেখক: ফকীহুল আসর, মুফতী ওবাইদুল্লাহ আসআদী সাহেব দা.বা.
শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী, জামিয়া আরাবিয়া বান্ধা, ইউ. পি., ভারত।
সেক্রেটারি, ফিক্বহ অ্যাকাডেমি, ইন্ডিয়া।

পরিমার্জনা:
মুফতী মারুফ মজিব কাসিমি ফেনবি।
[গবেষক;] উচ্চতর হাদীস বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ।
প্রকাশক: মাকতাবাতুল ঈমান, ঢাকা
মূল্য: ২০০টাকা
প্রকাশকাল:
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪৪১ হিজরি, ২০২০ ঈ.
প্রথম সংস্করণ : ১৪৩৯ হি. ২০১৮ ঈ.

কিতাব পরিচিতি:

ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই অবগতি রয়েছে যে, ফিকহ শাস্ত্রে সাধারণত দুইটি বিষয়ে অধ্যাপনা হয়ে থাকে। একটি হলো ফিকহের মূলনীতি; যাকে পরিভাষায় “উসূলে ফিকহ” বলা হয়। দ্বিতীয়ত: মূলনীতিগুলোর আলোকে প্রণীত শাখাগত মাসাইল। যেগুলো “ফিকহি মাসাইল” হিসেবে পরিচিত। উপমহাদেশের মাদ্রাসা সিলেবাসে ফিকহি মাসায়েলের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ‘বেহেশতি জেওর’ থেকে শুরু করে ‘মালাবুদ্দা মিনহু’, ‘নুরুল ঈযাহ’, ‘কুদূরি’, ‘কানযুদ দাকায়েক’, ‘শরহে বিকায়া’, শেষে ‘হিদায়া’ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভূক্ত। আর ফিকহি মূলনীতি বা উসূলে ফিকহের পাঠ্যপুস্ত হিসেবে ‘উসূলুশ শাশী’, ‘নূরুল আনওয়ার’, ‘মুন্তাখাবুল হুসামি’ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভূক্ত। এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয় হলো, ফিকহি মূলনীতিগুলো দুভাগে বিভক্ত: ‘উসূলুল ফিকহ’, ‘কাওয়াইদুল ফিকহ।’

উসূলুল ফিকহ এবং কাওয়াইদুল ফিকহের মাঝে পার্থাক্য:

প্রথম কথা হলো ‘ফিকহি মূলনীতি’; এই শাস্ত্রটি প্রণয়নের মূল মাকসাদ হলো, নতুন উদ্ভাবিত সমস্যাগুলোর সমাধান বের করা; যেগুলোর সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখ হয়নি। কিন্তু এ কথাও স্বতসিদ্ধ যে, কুরআন-সুন্নাহয় পৃথিবীর তাবৎ সমস্যার সমাধান রয়েছে। এর বাস্তবতা হলো, কুরআন-সুন্নাহয় এমন কিছু মূলনীতি-প্রেক্ষিতে নতুন সৃষ্ট সমস্যার সমাধন প্রদান করা হয়েছে, যেগুলোর আলোকে একই মূলনীতির অধিনে হাজারো সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব। আর এই লক্ষ্যে মুজতাহিদীনে কিরাম ‘ফিকহি মূলনীতি’ নামক একটি শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এই শাস্ত্রটি দুই ভাগে বিভক্ত: ‘উসূলুল ফিহক’, ‘কাওয়াইদুল ফিকহ’।

এক.
উসূলুল ফিকহ-শাস্ত্রে মূলত কুরআন-সুন্নাহর ‘নসূস’ বা ‘লিখিত বক্তব্য’-গুলোর উপর গবেষণা করা হয় যে, এই ‘বক্তব্য’ থেকে কোন ধরণের বিধান সাব্যস্ত হচ্ছে; ফরজ, ওয়াজিব না সুন্নত-মুস্তাহাব। এই শাস্ত্রের বড়ো একটা অংশ দখল করে আছে অরবিভাষা ও সেটির ব্যাকরণ ইত্যাদি। কেননা কুরআন-হাদীস উভয়টি আরবিভাষায় অবতীর্ণ। তাই সেগুলো থেকে বিধান প্রণয়ন করতে হলে আরবিভাষার দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য আবশ্যক।

দুই.
কাওয়াইদুল ফিকহ-শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হলো শরিআতের দৃষ্টিভঙ্গি বা শরিআতের মূল প্রয়াস নির্ণয় করা। আরবিতে যাকে বলা হয় ‘মিজাযে শারীআত, মাসালিহে শরীআত এবং হিকমাতে শারীআত।’ তাই এই শাস্ত্রটি অপেক্ষাকৃতভাবে উপরের উসূলুল ফিকহ শাস্ত্র থেকে একটু বাড়তি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংবিধানের মূলধারা দিয়েই বিচারকার্য পরিচালনা করা যায় না। বিধান আরোপের প্রেক্ষাপটও সামনে রাখতে হয়; ব্যাপারটা প্রায় এধরণের। এই শাস্ত্রটি সরাসরি কুরআন এবং সুন্নাহ থেকেই উদ্ভাবন করা হয়েছে। আমাদের আলোচিত কিতাবটি এই শাস্ত্রে রচিত একটি অনবদ্য রচনা।

রচনার প্রেক্ষাপট:

উপমহাদেশের মাদ্রাসা সিলেবাসে এই শাস্ত্রটি মূলত "তাখাসসুসাত" বা উচ্চতর গবেষণাধর্মী বিভাগগুলোতে পড়ানো হয়ে থাকে। যে বিভাগগুলোতে দাওরা হাদীস পর্যন্ত মূল সিলেবাসে ভালো নম্বর অর্জন করার পর ভর্তি হওয়া যায়। তো "ফিকহ গবেষণা বিভাগ বা ইফতা বিভাগে" উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. কৃত 'আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির' কিতাবটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আর কাওয়াইদুল ফিকহ শাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে আল্লামা আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদি রহ. কৃত 'কাওয়াইদুল ফিকহ' নামক গ্রন্থটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কিন্তু আল্লামা মুজাদ্দেদি রহ. কৃত 'কাওয়াইদুল ফিকহ' কিতাবটি মূলত শাস্ত্রীয় মুখপত্র হিসেবে লিখা হয়নি। বরং এই শাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞান-সংকলন হিসেবে রচিত অর্থাৎ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলো এতে সংকলন করা হয়েছে। তাই এই শাস্ত্রে এমন একটি কিতাব সংকলনের আবশ্যকতা রয়ে গেল, যাতে শাস্ত্রের পরিচিতি, সংজ্ঞা, শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, বিষয়বস্তু ও এতে পাণ্ডিত্য অর্জনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হবে। সাথে শিক্ষার্থীদের বোধশক্তি অনুযায়ী পাঠ বিন্যাস করা হবে। এই প্রয়োজনপূরণে ফকীহুল আসর মুফতী উবাইদুল্লাহ আসআদি সাহেব দা.বা. 'আল ওয়াজিয ফী কাওয়াইদুল ফিকহ' কিতাবটি সংকলন করেন।

লেখক পরিচিতি:

আল্লামা উবাইদুল্লাহ আসআদি সাহেব দা. বা. ইলমি অঙ্গনের এক বিরল মহীরুহ এবং সর্বজন বিধিত একজন প্রতিথযশা আলিমেদ্বীন। যার পরিচয় এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়; এবং প্রয়োজনও নেই। যার ব্যাপারে বাহরুল উলূম আল্লামা নেআমাতুল্লাহ আ'জমি দা. বা. বলেন যে, "[আল্লামা উবাইদুল্লাহ আসআদি] যার পরিচিতির প্রয়োজন নেই। এককথায় যিনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ ওলামাদের শীর্ষস্থানীয় একজন, ফিকহ অ্যাকাডেমির মহিয়ান [সেমিনার বিষয়ক] সেক্রেটারি।"
আল্লামা আসআদি সাহেব দা.বা. এর রয়েছে উলূমে শরইয়্যাহ বা ফিকহ শাস্ত্রে দীর্ঘ দিনের বাস্তব অনুশীলনের প্রজ্ঞাময় অভিজ্ঞতা। তাই 'কাওয়াইদুল ফিকহ' শাস্ত্রে মৌলিক রচনা সংকলনের অধিকার তাঁরই রয়েছে।

ইতিপূর্বে তাঁর 'আল মু-জায ফী উসূলুল ফিকহ' নামক গ্রন্থটি আরবের উল্লেখযোগ্য ইউনিভার্সিটিগুলোর উচ্চতর বিভাগে সিলেবাসভূক্ত হয়েছে।

নতুন সংস্করণ:

কিতাবটির প্রথম সংস্করণ দেওবন্দের 'মাকতাবায়ে দারুল ইলম' থেকে [১৪৩৮ হি.-২০১৮ঈ.] প্রকাশিত হয়। তবে তা বিন্যসগতভাবে যেমন অনুন্নত ছিল, তেমনি তাতে গুরুত্বপুর্ণ কিছু ভুলও থেকে গিয়েছিল। তাই প্রয়োজন ছিল নতুন কম্পোজিংয়ের মাধ্যমে যুগপোযোগী করে পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করার। খোদ লেখকের নির্দেশে এই কাজ সম্পন্ন করেছেন, লেখকের একান্ত আস্থাভাজন প্রিয় শিষ্য মুফতী মারুফ মজিব কাসিমি ফেনবি। তিনি কিতাবটিকে পরিমার্জন করে নতুন অঙ্গসজ্জায় ঢেলে সাজিয়েছে। এতে যেমন আগের ভুলগুলো শুধরে এসছে, সাথে কিতাবটি অধ্যায়নেরও চমৎকার উপযোগী হয়ে ওঠেছে। সম্প্রতি মুফতী উবাইদুল্লাহ আসআদি সাহেবের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে ঢাকার 'মাকতাবাতুল ঈমান' কিতাবটি খুবই উৎকৃষ্ট মানডণ্ডে প্রকাশ করেছে। মাকাতাবাতুল ঈমান কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় যে, তাঁরা যেন কিতাবের বিষয়বস্তুর সাথে খাব খাইয়ে কিতাবটিকে সাজাতে কার্পন্য করেনি। সাধারণত উপমহাদেশীয় ছাপাখানাগুলোকে এক্ষেত্রে আন্তরিক বলে মনে হয় না। বৈরুত-মিসর ও আরবের প্রকাশনাগুলো যতটুকু করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু মাতাবাতুল ঈমান এক্ষেত্রে খুবই সাহসী ভূমিকা প্রদর্শন করেছে। জানা গেছে যে, কয়েকজন রুচিশীল নবীন আলিম আকাবির-আসলাফগণের রচনাগুলোকে বিশ্বায়নের উপযোগী করে উপস্থাপন করার সুদূর লক্ষ্য নিয়ে পথচলা শুরু করেছে। 'আল ওয়াজিয' তাদের প্রথম উপহার। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এবং আশাতীত সাফল্য কামনা করছি।

-হুসাইন আলহুদা
২০.৪.২০২০
বেলা ১১.১৪.
তাখাসসুস ফিল হাদীস,
দারুল উলূম দেওবন্দ

কিন্তু আল্লামা মুজাদ্দেদি রহ. কৃত 'কাওয়াইদুল ফিকহ' কিতাবটি মূলত শাস্ত্রীয় মুখপত্র হিসেবে লিখা হয়নি। বরং এই শাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞান-সংকলন হিসেবে রচিত অর্থাৎ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলো এতে সংকলন করা হয়েছে। তাই এই শাস্ত্রে এমন একটি কিতাব সংকলনের আবশ্যকতা রয়ে গেল, যাতে শাস্ত্রের পরিচিতি, সংজ্ঞা, শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, বিষয়বস্তু ও এতে পাণ্ডিত্য অর্জনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হবে। সাথে শিক্ষার্থীদের বোধশক্তি অনুযায়ী পাঠ-বিন্যাস করা হবে। এই প্রয়োজনপূরণে ফকীহুল আসর মুফতী উবাইদুল্লাহ আসআদি সাহেব দা.বা. 'আল ওয়াজিয ফী কাওয়াইদুল ফিকহ' কিতাবটি সংকলন করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল হাদীস ভবন:

বাঙালিদের আকাশচুম্বি অবদান!

বিশ্বব্যাপী অঘোষিতভাবে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতীক হিসেবে সমাদৃত হয়ে যাওয়া উপরের আলীশান ভাবনটির নাম দারুল হাদীস ভবন। এটির নির্মাণকে দারুল উলূমের অন্যতম বৈশিষ্ট ও কৃর্তি বলে গণনা করা হয়। কেননা ইতিপূর্বে এই নামে উপমহাদেশে আর কোথাও কোনো ভবন নির্মিত হয়নি। যেটিকে কেবল হাদীসে পাকের পাঠ-পঠনের জন্য উৎসর্গ করা হবে। দারুল উলূমই প্রথম উদ্যোগ নেয়। ভবনটির নামের মতো বাস্তবিকই দেখতে আলীশান। এটির নির্মাণ ব্যায় ছিল ওই যুগে দারুল উলূমের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। একদিকে এটি নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া যেমন ছিল অনেক সাহসের তেমনির ছিল একটু অনিশ্চিত পথে হাঁটার মতো। কিন্তু এই মুহূর্তে দারুল উলূমের পাশে দাঁড়ায় চির প্রতিভূ বাঙালিরাই। নিচে দারুল উলূমের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ, বিখ্যাত ইতিহাস বেত্তা মাহবুব রেজবি কৃত "তারীখে দেওবন্দ" থেকে সংক্ষিপ্ত চিত্র তোলে ধরা হলো:

নবাব সলিমুল্লাহ খানের আহ্বানে

ঢাকায় দেওবন্দের প্রতিনিধি দল

তারীখে দেওবন্দ থেকে
[১৩৩২হিজরীর কয়েকটি খণ্ডচিত্র]:

"ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ খান সাহেব রহ. জাতী-ধর্মের সেবায় প্রবল সাগ্রহী ছিলেন। দারুল উলূমের আর্থিক সহযোগিতায় সব সময় বড়ো ধরনের অনুদান পেশ করতেন । ১৩৩২ হিজরিতে 'দারুল হাদীস ভবন' প্রকল্পের বাস্তায়নের জন্য যখন চাঁদা আবেদন করা হয়, নবাব মহোদয় একে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং এ কর্মসূচি বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে দারুল উলূমের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করার আমন্ত্রণ জানান। দারুল উলূমের ৫০বছরের ইতিহাসে এটি প্রথম যে, দেশের একজন প্রভাবশালী নবাবের পক্ষ থেকে এমন অভ্যর্থনামূলক আমন্ত্রণ আসে।

এই যাবত দারুল উলূমের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল প্রেরণের তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না। বিশেষত আমীর-ওমারাদের দরবার থেকে পুরোপুরি দূরত্ব বজায় রাখা হত। কিন্তু নবাব সাহেবের একনিষ্ঠ দ্বীনপ্রেম, জাতিপ্রেম ও ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর হামদর্দি ইত্যাদি বৈশিষ্টের কারণে তার অনুরোধকে সম্মান জানিয়ে প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৭জমাদিউল উলা দারুল উলূমের আসাতিযায়ে কেরাম ও মজলিসে শূরার কয়েকজন সদস্যের সমন্বয়ে প্রতিনিধি দল গঠন করা হয় এবং মুহতামিম সাহেবের নেতৃত্বে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে প্রতিনিধি দল। নবাব সাহেব তার মন্ত্রীপরিষদ এবং দেশের জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে স্টেশনে আভ্যর্থনা জানান। প্রতিনিধি দলের শান-মানের সর্বোচ্চ লক্ষ্য রাখা হয়।

কয়েক দিন ধরে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় সম্মিলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে । হযরত শাহ সাহেব (আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.),
হযরত মাদানি (সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), আল্লামা উসমানি (হযরত শিব্বির আহমদ উসমানি (রহ.) এবং মাওলানা মুরতাযা হাসান রহ. প্রমূখ ভাষণ দান করেন। উদ্বোধনি ভাষণে নবাব সাহেব বলেন:

"আমি দীর্ঘদিন থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের একজন আন্তরিক সেবক। সব সময় ভাবি, কীভাবে এর উন্নয়ন সাধন করতে পারি এবং মনে চায় দারুল উলূমের স্বচ্ছলতার কোনো উৎস তৈরি কওে দেই। আজ আমার আপনাদের স্বাগত জানানোর সুযোগ হয়েছে। তামান্না করেছি, কিঞ্চিত হাদিয়া পেশ করার। নিবেদন থাকল, দারুল উলূমের তরে অধমের হাদিয়াটুকু কবুল করবেন। সব মিলিয়ে অধম এই মহিমান্বিত কাজের কোনো ধরনের জিম্মাদারি তোলার মোটেই যোগ্য নই, যা আপনারা গ্রহণ করেছেন। তবে আশা-ব্যাক্ত করছি যে, এই সামান্য অনুদানটুকু গ্রহণ করে ধন্য করবেন।"

নবাব সাহেব নিজের এবং নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে তেরো হাজার রুপির এক বিশাল অনুদান 'দারুল হাদীস ভবনের' জন্য পেশ করেন এবং আরও কিছু অনুদান কয়েক কিস্তিতে পাঠানোর ওয়াদা করেন। সাথে সাথে দারুল হাদীস ভবন প্রকল্পের বাস্তাবায়ানের জন্য লাখ রুপির যে বাজেট অনুমান করা হয়েছে, এর জন্য নবাব সাহেব একটি কমিটি গঠন করেন। আর প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন যে, আপনারা কাজ শুরু করে দেন। কমিটি প্রয়োজন মতো খরচ পাঠাতে থাকবে।

[তারীখে দেওবন্দ, সাইয়্যেদ মহবূব রেজবি কৃত:২৭৮-২৩৯]

ঢাকায় নির্মিত হচ্ছে বাবরী মসজিদ!

মুঘল সম্রাট বাবরের আদেশে ১৫২৮-২৯ মোতাবেক ৯৩৫ হিজরীবর্ষে ভারতের উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরে নির্মিত হয় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ । মসজিদ নির্মাণের কয়েক শত বছর পর উগ্রবাদী হিন্দুরা তাদের ধর্মের কল্পিত অবতার রামচন্দ্রের জন্মভূমির ভুয়া দাবি তুলে বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় পাঁচশত বছরের প্রাচীন মসজিদটিকে শহীদ করে দেয় । বাবরী মসজিদের শাহাদাত বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় চেতনার বহ্নীশিখা। বাংলাদেশেও ঘটে তার সর্ববৃহৎ বিস্ফোরণ। শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বে বাবরী মসজিদ লংমার্চের মাধ্যমে পরিচালিত হয় স্মরণকালের বৃহত্তর আন্দোলন। সে আন্দোলন বাবরী মসজিদ রক্ষায় বিশ্বজনমত গঠনে রাখে বিশাল ভূমিকা। কিন্তু বিশ্বজনমত, ন্যায়-নীতিবোধ এমন কি ন্যূনতম যুক্তিরও কোনো তোয়াক্কা না করে ভারতের সুপ্রীমকোর্ট বাবরী মসজিদকে তার যথাস্থানে হতে বিলুপ্তির নির্দেশ দেয় । ইতিহাসের কলংকজনক এ রায় শান্তিকামী বিশ্ববাসীর মনে ঘৃণার জন্ম দেয়। আর মুসলমানদের হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় ক্ষোভের আগুন। তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি এমন নির্লজ্জ প্রহসন। সহ্য করতে পারেনি আল্লাহর ঘর পবিত্র মসজিদের এমন নির্মম শাহাদাত। মুসলিম হৃদয়ে হৃদয়ে উচ্চারিত হয় শপথের বাণী-

হাজার বছর পর হলেও আমরা বাবরী মসজিদ পুন:উদ্ধার করব !

মুক্ত করব আমাদের পাঁচশত বছরের পবিত্র সিজদাহগাহ!

বাবরী মসজিদের গম্বুজ থেকে আবার ধ্বনিত হবে আযানের সুমধুর সুর !

বাবরী মসজিদের রক্তস্নাত ইতিহাস ও বাবরী মসজিদ রক্ষায় শায়খুল হাদীস রহিমাহুল্লাহর ঈমানী আন্দোলনের চেতনাকে জাগরুক রাখতে জামিয়াতুত তারবিয়াহ-কলাতিয়া ক্যাম্পাসে "বাবরী মসজিদ„ নামে একটি সুবৃহৎ মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। আধুনিক নান্দনিকতার সাথে বাবরী মসজিদের আদলে প্রাচীন গম্বুজের মিশেলে তৈরি করা হয়েছে মসজিদটির স্থাপত্য নকশা, যা দর্শককে মনে করিয়ে দিবে বাবরী মসজিদের ইতিহাস আর আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলবে চেতনার মশাল!

তিন বিঘা জমির উপর নির্মিতব্য ইতিহাসের স্মারক এ মসজিদটির জমি ক্রয় ও নির্মাণব্যয় নির্বাহে ৩১৩ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১ লক্ষ টাকা প্রদান স্বাপেক্ষে আপনিও পারেন বরকত পরশিত ৩১৩-এর একজন সৌভাগ্যবান সদস্য হতে।

মামুনুল হক সাহেবের টাইমলাইন থেকে

উলফত বইমেলা - ২০১৯

সাময়িক প্রসঙ্গ
৭ ডিসেম্বর, শনিবার। রশীদ আহমদ, পাটনা

দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ
৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার। সংবাদদাতা, দেওবন্দ

তাক্বওয়া২৪.কম
www.taqwa24.com
৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার। ইফতিখারুল হক, দেওবন্দ

গত ৫-৬ডিসেম্বরে উলফত সাহিত্যাসর আয়োজন করে দেওবন্দে সর্বপ্রথম বাংলা বইমেলা।যা দারুল উলূম দেওবন্দের বাঙালি শিক্ষার্থীদের মাঝে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, আলহাদুলিল্লাহ। সরাসরি মিডিয়া রিপোর্ট থেকে:

দেওবন্দে প্রথমবারের মতো বাংলা ইসলামি বইমেলা

বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের পাশে কাসিমি গেস্ট হাউজে বাংলা ইসলামিক একাডেমি প্রাঙ্গণে এই প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল দুই দিনব্যাপী (৫-৬ ডিসেম্বর ১৯, বৃহস্পতি ও শুক্রবার) উলফত ইসলামি বইমেলা। যা দেওবন্দের পুণ্যভূমিতে এই প্রথম বাংলা বইমেলা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলা ইসলামিক একাডেমি দেওবন্দের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বইমেলার আয়োজন করেছে পাক্ষিক উলফত পত্রিকা। গতকাল মেলায় ঘুরে দেখা গেছে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হওয়া এই বইমেলাতে বইপ্রেমীদের ব্যাপক সাড়া মিলেছে । উদীয়মান কবি, লেখক-সাহিত্যিকদের ব্যাপক সমাগম ঘটেছে মেলায় । মেলার প্রচারণা দেখে সাহারানপুর ও মুজাফফরনগরে পাঠরত বাংলাভাষী ছাত্ররাও দেওবন্দ এসে মেলায় যোগ দিয়েছে। বাংলাভাষী বই প্রেমীদের জন্য বইমেলার আকর্ষণীয় বেশ কিছু আয়োজন রয়েছে। এখানে রয়েছে দুবাংলার ইসলামি লেখকদের দুই শতাধিক পদের বইয়ের বিপুল সমাহার । দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠরত পশ্চিমবঙ্গ- কলকাতা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রদের বাংলা সাহিত্য চর্চার সবচেয়ে বড়ো প্ল্যাটফর্ম উলফত সাহিত্য আসরের সদস্যদের প্রেরণার উৎস ছিল মেলাটি। মেলায় পাঠকদের বই কেনার দৃশ্য দেখে বুঝা যাচ্ছে বইমেলা নিয়ে তাদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। তাদের অনেকেই বলছেন, ছোট্টো পরিসরে হলেও এই বইমেলা বইপ্রেমী ও পাঠকদের মনে বেশ প্রভাব ফেলেছে। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এই বইমেলা নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করবে। রাত দশটায় মেলার প্রথম অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও রাত ১২ টায়ও দেখা গেছে পাঠকের ভীড়। তাই মেলা কমিটি পাঠকদের উপস্থিতি থাকা পর্যন্ত মেলা চালিয়ে গেছে। পরদিন শুক্রবার সারাদিন মেলা হওয়ার কথা। (রিপোর্ট তৈরি কালেও জমজমাট মেলা চলছে)। বাংলা ইসলামিক একাডেমির পরিচালক দানিশ খানের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, 'এবারের শুরু হওয়া বইমেলা দিনদিন উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আমরা এবারের বইমেলায় আশার চেয়ে অনেক বেশি সাড়া পেয়েছি । যা আমাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছে।'

কাল (বৃহ.বার) রাত ৯টায় অনুষ্ঠিত হয় চা-আড্ডা। তাতেও মেলা প্রাঙ্গণ কানায় কানায় ভরে ওঠে। সেখানে উলফত বইমেলা সংখ্যার মোড়ক উম্মোচন হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরা আঞ্জুমানের দায়িত্বশীলগণ। উলফত প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইউসুফ একটি গণ-সাক্ষাৎকার নেন। তাতে আগত দর্শনার্থীরা নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগী হয়ে ওঠে। তারা বইমেলাকে আরও বিস্তার করতে জোর আবেদন জানায়। তারা বলেন, আমাদের স্বপ্নের বাস্তবতা ঘটছে যেন। উলফতের সম্মানিত সম্পাদক জনাব হুসাইন আলহুদা নিজস্ব সাক্ষাৎকারে বলেন, এই মেলা থেকে আমরা কল্পনাতীত সাড়া পেয়েছি। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা আছে আমাদের। পশ্চিমবঙ্গের উদীয়মান লেখক কাজী মঞ্জুর আলম বলেন, এটি একটি সৃজনশীল আয়োজন। আমাদের বহুদিনের প্রত্যাশিত। আমি আশা করি, প্রতি মাস-দুমাস পরপর যেন এ ধরনের উপলক্ষ্য তৈরি করে বাংলা সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করা হয়।

বই মেলাকে সফল করতে উলফত সদস্যরা কয়েকদিন ধরে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। পাঁচটি উপ-কমিটি ভাগ করে কাজকে সুবিন্যস্তভাবে আঞ্জাম দিয়েছে তারা। বইমেলার অভিনব বিন্যাস দেখে আগত পাঠকরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে। সবচেয়ে আনন্দের খবর হলো, বইমেলা উপলক্ষ্যে পাক্ষিক উলফত প্রকাশ করেছে "উলফত বইমেলা সংখ্যা"। প্রতি ৩০০ রুপির ক্রেতাকে উপহার দেওয়া হয়েছে উলফতের সৌজন্য কপি। যায়েদ হোসাইন ও ইবনে লুৎফের অঙ্গসজ্জায় মেলার চতুর্দিকে নানান মনীষীদের উক্তি সম্বলিত রঙ-বেরঙের পেস্টুন প্রদর্শন করা হয়। উলফত প্রকাশনা ও অনলাইন সেন্টারের উপ-কমিটি ইফতিখারুল হক খাইরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উলফত 'বইমেলা সংখ্যা' সেজেছে সময়ের সেরা আয়োজন নিয়ে। এছাড়াও আয়োজনে ছিলেন তরিকুল ইসলাম, আবুল বাশার মুহাম্মাদ সালাউদ্দিন প্রমুখ। বইমেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকাগুলোর প্রচ্ছদ প্রদর্শনী। এছাড়াও মেলা শেষে এবারের সেরা ক্রেতাকে প্রদান করা হয়েছে "আনোয়ার পুরস্কার" নামে সমমাননা পদক।

প্রস্তুত ছিলেন আছাময়া জেলা সম্পাদক ফখরুল ইসলাম। ... করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, নাগরিকত্বের স্পষ্ট

ঘটছে বাংলার প্রচার, প্রথমবারের মতো দেওবন্দে বইমেলায় উৎসব মুখর পরিবেশ

সংবাদদাতা, দেওবন্দ, ৫ ডিসেম্বর : বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের পাশে কাসেমি গেস্ট হাউসের বাংলা ইসলামিক অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে এই প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল দুই দিনব্যাপী উলফত ইসলামি বই মেলা। যা দেওবন্দের পুণ্যভূমিতে এই প্রথম বাংলা বইমেলা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলা ইসলামিক অ্যাকাডেমি দেওবন্দের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বইমেলার আয়োজন করেছে পাক্ষিক উলফত। মেলায় ঘুরে দেখা গেছে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হওয়া এই বইমেলাতে বইপ্রেমীদের ব্যাপক সাড়া মিলেছে। উদীয়মান কবি লেখক-সাহিত্যিকদের ব্যাপক সমাগম ঘটেছে মেলায়। বাংলাভাষী বই প্রেমীদের জন্য এই বইমেলার আকর্ষণীয় বেশ কিছু আয়োজন রয়েছে।

এখানে রয়েছে দু'বাংলার জাতীয় ইসলামি লেখকদের দুই শতাধিক পদের বইয়ের বিপুল সমাহার। দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠরত পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, অসম, ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রদের বাংলা সাহিত্য চর্চার সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম উলফত সাহিত্য আসরের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় পাঠকদের বই কেনার দৃশ্য দেখে বোঝা যাচ্ছে বইমেলা নিয়ে তাদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। তাদের অনেকেই বলছেন ছোট্ট পরিসরে হলেও এই বইমেলা বইপ্রেমী ও পাঠকদের মনে বেশ প্রভাব ফেলবে। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এই বইমেলা নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করবে। বাংলা ইসলামিক অ্যাকাডেমির পরিচালক দানিশ খানের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, এবারের শুরু হওয়া বইমেলা দিনদিন উন্নতির পথে এগিয়ে যাক। আমরা এবারের বইমেলায় আশার চেয়ে অনেক বেশি সাড়া পেয়েছি, যা আমাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছে। বই মেলাকে সফল করতে কুদ্দুস সদস্যরা কয়েকদিন ধরে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে।

বইমেলার সুবিন্যাস্ত বিন্যাস দেখে আগত পাঠকরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। বইমেলা উপলক্ষ্যে উলফাত বের করেছে উল্ফত বইমেলা সংখ্যা, প্রতি ৩০০ টাকায় ক্রেতাকে উলফাতের কপি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও চতুষ্পার্শে নানান মনীষীদের উক্তি সম্বলিত রংবেরঙের ফেস্টুন প্রদর্শন লাগানো হয়েছে। বইমেলায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলার প্রকাশিত বিশ্ব বিখ্যাত পত্রিকাগুলোর প্রচ্ছদ প্রদর্শনী। বইমেলা চলবে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ঈ., রোজ বৃহস্পতিবার উলফত সাহিত্যাসরের বার্ষিক লিখিয়ে মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয় ।সরাসরি মিডিয়া রিপোর্ট থেকে:

দেওবন্দে বাঙালিদের বিশাল মিলনমেলা

দারুল উলূম দেওবন্দের সর্ববৃহৎ সাহিত্য সংসদ, উলফত সাহিত্যাসর এবার আয়োজন করল শতাধিক লিখক নিয়ে বিশাল "লিখিয়ে মিলনমেলা„। চলতি শিক্ষাবর্ষে দারুল উলুম দেওবন্দে প্রকাশিত প্রায় দশটি বাংলা পত্রিকা/দেয়লিকা লেখকদের দেওয়া হলো "লেখক সংবর্ধনা„। সংবর্ধনায় উপস্থিত হন প্রায় ১২০জন নবীন-প্রবীন লেখক ও সাহিত্যকর্মী ।এ ছাড়াও সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য রাখা হয় "সাহিত্য আড্ডা„। তাই মিলনমেলা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও আশপাশের বঙ্গবাসী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট অডিটরিয়মে জায়গা দিতে কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয়। লিখিয়ে মিলনমেলাকে উপলক্ষ্য করে উলফত কর্তৃপক্ষ নবীন লেখকদের জন্য একটি "পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতা„ ঘোষণা করে। পাঁচটি বিষয়ে ৩০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বলা হয় ।এতেও ব্যাপক সাড়া মিলে। ১৩টি পাণ্ডুলিপি জমা হয়। প্রথমস্থান অধিকারী পাণ্ডুলিপির লেখক উলফত সদস্য ইফতিখারুল হক খাইর, ফেনী । তাকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ২০০০রুপির বাংলা সাহিত্যপুস্তক। দ্বিতীয়স্থান অধিকারী ওয়ায়েস করুণী, মুর্শিদাবাদ ।তাকে দেওয়া ১৭০০রুপির বাংলা সাহিত্যপুস্তক। তৃতীয়স্থান অধিকারী ইসলামুদ্দিন, হাইলাকন্দি, আসাম ।তাকে দেওয়া হয় ১৬০০রুপির বাংলা সাহিত্যপুস্তক। এছাড়াও বাকি দশজনকেও সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় আকরর্ষণী সাহিত্য পুস্তক। অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ হলো এতে দারুল উলূম দেওবন্দের তিনজন বাঙালি উস্তাদ সবাই আমন্ত্রিত হন এবং উপস্থিত থাকেন শেষ পর্যন্ত ।উলফতের অভিভাবক, দারুল উলূম দেওবন্দের স্বনামধন্য অধ্যাপক মুফতী উসমান গনী সাহেবের হাতে প্রদান করা হয় বর্ষব্যাপী বাংলা সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অবাদান রাখার জন্য ১২জন সাহিত্যাকর্মীকে "উলফত সাহিত্য পদক"। এ ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল কওমী মাদরাসা সিলেবাসে বাংলাচর্চার আবশ্যকতা নিয়ে "উলফত ছায়া সংসদ"। এতে অংশগ্রহণ করেন বড়ো বড়ো সাহিত্য সংসদের পরিচালকবৃন্দ। দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ১. কওমী মাদরাসার প্রাথমিক সিলেবাস বাংলা মাধ্যমিক করা হোক। ২. কওমী মাদরাসা সিলেবাসকে জাগতিক শিক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধ করা হোক। উভয় প্রস্তাবের উপর পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা পেশ করা হয়। তারপর রায় ঘোষিত হয়। শেষে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা প্রতিনিধির পক্ষ থেকে উলফত পরিচালক হুসাইন আলহুদাকে "সোনার মেডেল„ ও উলফতের নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রদান করা হয় "কৃতজ্ঞতা পদক„।

দেওবন্দে বাঙালিদের মিলনমেলায় উপস্থিত উলামারা।

দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ

দেওবন্দে বাঙালিদের বিশাল মিলনমেলা, লেখক সংবর্ধনা

জসিম উদ্দিন

চরগোলা, ৮ ফেব্রুয়ারি : দারুল উলুম দেওবন্দের সর্ববৃহৎ সাহিত্য সংসদ 'উলফত সাহিত্যাসর' এবার আয়োজন করল শতাধিক লেখক নিয়ে বিশাল 'লিখিয়ে মিলনমেলা'। চলতি শিক্ষাবর্ষে দারুল উলুম দেওবন্দে প্রকাশিত প্রায় দশটি বাংলা পত্রিকা। দেয়লিকা লেখকদের দেওয়া হল 'লেখক সংবর্ধনা'। সংবর্ধনায় উপস্থিত হন প্রায় ১২০ জন নবীন-প্রবীণ লেখক ও সাহিত্যকর্মী। এ ছাড়াও সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য রাখা হয় 'সাহিত্য আড্ডা'। তাই মিলনমেলা পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও আশপাশের বঙ্গবাসী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট অডিটোরিয়ামে জায়গা দিতে কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয়। লিখিয়ে মিলনমেলাকে উপলক্ষ করে উলফত কর্তৃপক্ষ নবীন লেখকদের জন্য একটি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করে। পাঁচটি বিষয়ে ৩০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বলা হয়। এতেও ব্যাপক সাড়া মিলে। ১৩টি পাণ্ডুলিপি জমা হয়। প্রথমস্থান অধিকারী পাণ্ডুলিপি লেখক উলফত সদস্য ইফতিখারুল হক খাইর। তাকে পুরস্কার হিসেবে দেওা হয় দু'হাজার টাকার বাংলা সাহিত্যপুস্তক। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ওয়ায়েস করণী, মুর্শিদাবাদ। তাকে দেওয়া হয় ১৭০০ টাকা বাংলা সাহিত্যপুস্তক। তৃতীয় স্থান অধিকারী হাইলাকান্দি ইসলামুদ্দিন বড়ভুইয়া। তাকে দেওয়া হয় ১৬০০ টাকার বাংলা সাহিত্যপুস্তক। এ ছাড়াও বাকি দশজনকেও সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় আকর্ষণীয় সাহিত্য পুস্তক। অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ ছিল দারুল উলুম দেওবন্দের তিনজন বাঙালি অধ্যাপকের উপস্থিতি। সবশেষে পশ্চিবঙ্গে, অসম ও ত্রিপুরা প্রতিনিধির পক্ষ থেকে উলফত পরিচালক হুসাইন আলহুদাকে স্বর্ণপদক ও উলফতের নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রদান করা হয় কৃতজ্ঞতা পদক।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকা

দৈনিক প্রান্তজ্যোতি

১০ বাংলা পত্রিকা লেখকদের সংবর্ধনা

প্রান্তজ্যোতি প্রতিবেদন, করিমগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : দারুল উলুম দেওবন্দের সর্ববৃহৎ সাহিত্য সংসদ, 'উলফত সাহিত্যাসর' এবার আয়োজন করল শতাধিক লিখক নিয়ে বিশাল 'লিখিয়ে মিলনমেলা'। চলতি শিক্ষাবর্ষে দারুল উলুম দেওবন্দে প্রকাশিত প্রায় দশটি বাংলা পত্রিকা দেয়লিকা লেখকদের দেওয়া হল 'লেখক সংবর্ধনা'। সংবর্ধনায় উপস্থিত হন প্রায় ১২০জন নবীন-প্রবীন লেখক ও সাহিত্যকর্মী। এ ছাড়াও সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য রাখা হয় 'সাহিত্য আড্ডা'। তাই মিলনমেলা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও আশপাশের বঙ্গবাসী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট অডিটোরিয়ামে জায়গা দিতে কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয়। লিখিয়ে মিলনমেলাকে উপলক্ষ্য করে উলফত কর্তৃপক্ষ নবীন লেখকদের জন্য একটি 'পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতা' ঘোষণা করে। পাঁচটি বিষয়ে ৩০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বলা হয়। এতেও ব্যাপক সাড়া মিলে। ১৩টি পাণ্ডুলিপি জমা হয়। প্রথমস্থান অধিকারী পাণ্ডুলিপির লেখক উলফত সদস্য ইফতিখারুল হক খাইর। তাকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ২০০০ টাকার বাংলা সাহিত্যপুস্তক। দ্বিতীয়স্থান অধিকারী ওয়ায়েস করণী মুর্শিদাবাদ। তাকে দেওয়া ১৭০০ টাকার বাংলা সাহিত্যপুস্তক। তৃতীয়স্থান অধিকারী ইসলামুদ্দিন বড়ভূইয়া, হাইলাকান্দি, আসাম। তাকে দেওয়া হয় ১৬০০ টাকার বাংলা সাহিত্যপুস্তক। এছাড়াও বাকি দশজনকেও সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় আকর্ষণীয় সাহিত্য পুস্তক। অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ ছিল দারুল উলুম দেওবন্দের তিনজন বাঙালি অধ্যাপকের উপস্থিতি। উলফতের অভিভাবক, দারুল উলুম দেওবন্দের স্বনামধন্য অধ্যাপক মুফতী উসমান গনী সাহেবের হাতে প্রদান করা হয় বর্ষব্যাপী বাংলা সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অবাদান রাখার জন্য বহুজন সাহিত্যকর্মীকে 'উলফত সাহিত্য পদক'। এ ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল কওমী মাদরাসা সিলেবাসে বাংলাচর্চার আবশ্যকতা নিয়ে 'উলফত ছায়া সংসদ'। এতে অংশগ্রহণ করেন বড় বড় সাহিত্য সংসদের পরিচালকবৃন্দ। দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ১. কওমী মাদ্রাসার প্রাথমিক সিলেবাস বাংলা মাধ্যমিক করা হোক। ২. কওমী মাদ্রাসা সিলেবাসকে জাগতিক শিক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধ করা হোক। উভয় প্রস্তাবের উপর পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা পেশ করা হয়। তারপর রায় ঘোষিত হয়। পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা প্রতিনিধির পক্ষ থেকে উলফত পরিচালক হুসাইন আলহুদাকে 'স্বর্ণপদক' ও উলফতের নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রদান করা হয় 'কৃতজ্ঞতা পদক'। এক প্রেসবার্তায় এখবর জানানো হয়েছে।

উলফত একুশে লেখক আড্ডা

উলফত ডেস্ক

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার বাদ এশা, উলফত মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় "একুশে লেখক আড্ডা।" মাতৃভাষার তরে বাঙালিদের অমর কৃর্তি স্মরণ করে ভাষাচর্চায় উদ্বুদ্ধ হতে উলফতের এ আয়োজন। এতে অংশ গ্রহণ করে নবীন-প্রবীণ ৩০জন উদীয়মান লেখক ও ভাষাপ্রেমী। কাজী শাকিল আহমদের কুরআন তিলাওয়াত, মাও. তরিকুল ইসলামের প্রারম্ভিক উপস্থাপনা ও আব্দুল্লাহ মু. ইউসুফের বাংলার গান [আমি বাংলার গান গাই..., আমি বাংলায় কথা কই...গানটির] পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় মূল আয়োজন। "ভাষা: স্বপ্ন, উদ্যোগ, চেতনা" এই শিরোনামে আগত মেহমানদের সবার অত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন 'আল কাসিম' সম্পাদক, কাজী মনজুর আলম ও 'উলফত' পরিচালক হুসাইন আলহুদা। আব্দুল্লাহ মু. ইউসুফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও সাক্ষাৎকার প্রদান করেন মুফতি মো. জুবাইর আহমদ, ত্রিপুরা, মাও. আবুল কাসিম মু. খালিদ, আসাম, মুফতি শরীফুল ইসলাম, ২৪ পরগণা, মুফতি মুনিরুল হক, করিমগঞ্জ, মুস্তাফা ইউসুফ জামীল,আসাম, ইফতিখারুল হক খাইর, ফেনী, ইসলামুদ্দিন, হাইলাকন্দি, কাওছার আমীন, আসাম, জুলহাজ উদ্দিন, আসাম প্রমূখ। ইবনু লুৎফ বগুড়াবি ও যায়েদ হুসাইনের আয়োজন ও অঙ্গসজ্জায় সল্প পরিসরের এই অনুষ্ঠানটি দর্শকদের হৃদয়ে ভাষার মহত্ব ও চেতনা জাগ্রত করে রাত ১২ বারোটায় বাঙালি মুড়ি-চানাচুরে ঝাঁঝালো ভোজনের মধ্য দিয়ে যবনিকা টানে।

স্মৃতির অ্যালবাম: ১, ২ : আল্লামা আব্দুল হলীম বুখারি দা. বা. পাক্ষিক উলফতের জন্য শুভেচ্ছা বণী লিখছেন।
৩ : উলফতের ঘরের কোণে প্রথম আয়োজনে হিমায়ত নেতৃবৃন্দ